REGD. No. C 262.

স্বর্গীয় দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন প্রতিষ্ঠিত

ভক্তি

ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা।

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপাচ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্ ॥"

২০শ বর্ষ

১৩২৮ ভাদ্র হইতে ১৩২৯ শ্রাবণ।

সম্পাদক

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য গীতরত্ন

ঝোড়হাট "ভক্তি-নিকেতন"

পোঃ আন্দুলমৌড়ী, হাওড়া।

বার্ষিক মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।   প্রতিখণ্ড ৵০ তিন আনা।

ভক্তি-কার্য্যালয় হইতে
সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত
এবং
কলিকাতা, ১৪৫, রামতনু বসুর লেন
মানসী প্রেস হইতে
প্রকাশক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

২০শবর্ষের সূচীপত্র

ভক্তি

(২০শ বর্ষ ১ম সংখ্যা ভাদ্র মাস ১৩২৮ সাল)

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দ রূপাচ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥

নিবেদন

অনন্ত-লীলা বিলাসী শ্রীভগবানের ইচ্ছায় ধীরে ধীরে "ভক্তি" পত্রিকা আজ বিংশবর্ষে পদার্পণ করিল। ইহাতে আমার নিজস্ব কোনও বাহাদুরী নাই—আমরা সকলেই শ্রীভগবানের ক্রীড়া পুত্তলিকা, তিনি কখন কোন্ ভাবে কোন পুতুল ক নাচাইয়া যে দর্শকের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছেন তাহা একমাত্র তিনিই জানেন, তবে আমরা এইমাত্র দেখিতে পাই ও বলিতে পারি যে, নিস্বার্থ ভাবে শুভ উদ্দেশ্য লইয়া যে কোন কর্ম্ম করা যায় সেই সর্ব্ব-মঙ্গলময় শ্রীভগবান নিশ্চয়ই তাহার সহায় হইয়া থাকেন।

আমি নিজে মুর্খ, ক্ষুদ্র বুদ্ধি ও সর্ব্ব কর্ম্মে অক্ষম, তথাপি পণ্ডিতপ্রবর সাধক স্বর্গীয় শ্রীকৃষ্ণ কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত ভক্তি পরিচালনের ভার হাতে লইয়াছি, যদি ইহার কারণ সত্য বলিতে হয় তবে ইহাই বলিতে হইবে যে, কতিপয় সরলপ্রাণ ভক্তের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এবং ভক্তির পাঠকগণের সবিশেষ আগ্রহ। বৎসর পূর্ণ হইবার ২।৩ মাস পূর্ব্ব হইতেই এমন বহু পত্র আমাদের নিকট আসিয়া থাকে এবং তাহার অধিকাংশ পত্রেই লেখা থাকে যে, "মহাশয়! আপনার ভক্তি পত্রিকার বাহ্যিক কোন আড়ম্বর না থাকুক তথাপি উহা পাঠ করিয়া আমরা যথার্থই আনন্দ পাইতেছি, আগামীবর্ষে যেন ভক্তি হইতে বঞ্চিত করিবেন না। আগামী বর্ষের বার্ষিক মূল্য কবে পাঠাইব তাহা জানাইবেন।"

তারপর আরও এক আনন্দের কথা যে, ভক্তির বার্ষিক সাহায্য আদায়ের জন্য গ্রাহকগণ কোনরূপ কষ্ট দেন না। এমন কি আষাঢ় মাস হইতেই অনেকে আগামী বর্ষের চাঁদা পাঠাইতে আরম্ভ করিয়াদেন, মোট কথা ভক্তির জন্য আমি যত না ব্যস্ত, পাঠকগণ ততোধিক ব্যস্ত।

আমরা খুব দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, গ্রাহকগণের উৎসাহ আমাদের মত ক্ষুদ্র পত্রিকা-প্রকাশক যেরূপ পাইয়া থাকে, অন্যান্য অনেক বিরাটকায় পত্রিকার প্রকাশকদিগের ভাগ্যে সেরূপ হয় কি না সন্দেহ। যাহা হউক বর্ত্তমানে আমি ২।৩টী কার্য্যে বিশেষ ব্যস্ত আছি, তাহার জন্যই যথা সময় পত্রিকা প্রকাশে বিঘ্ন ঘটিতেছে, অতঃপর যাহাতে নিয়মিত ভাবে ভক্তি প্রকাশ হয় তাহার জন্য খুব সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে, ভক্তগণ হতাশ হইবেন না। গতবর্ষে যদিও পত্রিকা প্রকাশে অনেক গোলমাল হইয়াছে এ বৎসরে সেরূপ যাহাতে না হয় তাহার ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতেই করা হইয়াছে।

আমার সহায় সম্পদ যাহা কিছু সমস্তই শ্রীভগবানের কৃপা, তাই কৃপাময় শ্রীভগবানের নিকট প্রাণের ব্যাকুল প্রার্থনা জানাইয়া কার্য্য ভার মস্তকে করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে নামিলাম, ফলাফল তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম রহিল।

উপসংহারে—ভক্তগণ আসুন আমরা নববর্ষারম্ভে প্রাণ ভরিয়া মহাপুরুষের সুরে সুর মিলাইয়া বলি—

"চিন্তাং সংভব গোবিন্দ চিন্তয়াস্মি প্রপীড়িতঃ
চিন্তা মাং বাধতে নিত্যং চিন্তাংতে কর্ত্তুমক্ষমঃ।
দ্বন্দং বিমোচয় সুখ দুঃখ নীড়ং বিশ্লেষি শক্তিং ময়ি দীনবন্ধো
যথা ভবেৎ তব পাদপদ্মং বিবন্ধহীনঃ সততং স্মরামি॥"

দীন— সম্পাদক

প্রাণনাথী সম্প্রদায়

প্রাণনাথ এই সম্প্রদায় গঠন করেন বলিয়া ইহার নাম প্রাণনাথী সম্প্রদায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই সম্প্রদায় গঠিত হয়। কাথিওয়ার তাঁহার জন্ম স্থান, প্রাণনাথ জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন। বহুদিন পশ্চিমভারতে ভ্রমণ করিয়া তিনি বুন্দেলখণ্ডে উপস্থিত হন, এবং পান্না নামক স্থানের সন্নিকটে শিষ্য প্রশিষ্য

সহ তিনি অবস্থান করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার অবস্থিতি কালের মধ্যে তিনি পান্না হীরার খনিকে ১৭৩২ খৃঃ ছয়শালায় পরিণত করেন। এই সময় সেখানকার স্থানীয় রাজা প্রাণনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

প্রাণনাথ হিন্দু ও মোসলেম ধর্ম্মের সার লইয়া নিজ ধর্ম্মমত স্থাপন করেন। তিনি অন্ততঃ ষোলখানি গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু গ্রন্থ সমূহের ভাষা হিন্দী, সিন্ধী, গুজরাটী আরবী ও সংস্কৃত মিশ্রিত। গ্রোজ সাহেব প্রাণনাথী সম্প্রদায়ের 'কিয়ামত নামা' নামক গ্রন্থ সম্পাদন ও অনুবাদ করেন্। ভগবানের এক নাম ধম, এই জন্য এই সম্প্রদায়কে ধামী সম্প্রদায়ও বলা হয়।

প্রাণনাথ মদ, তামাক প্রভৃতি সকল প্রকার মাদক দ্রব্যের ও মাছ মাংস আহারের ঘোর বিরোধী ছিলেন।

স্ত্রীলোকের সঙ্গে পুরুষের দেখা শুনা সম্বন্ধে তিনি কঠোরতা অবলম্বন করিতেন। স্ত্রীলোকের সঙ্গে নীতি বিগর্হিত হিসাবে যে কেহ মিশিলে কখনই তাহা তিনি পছন্দ করিতেন না। সকলে যাহাতে শান্তি ও সন্তোষ লাভ করে, এবং ধনী, দরিদ্র সকলেরই যাহাতে দানে মতি হয়, সে বিষয়ে তিনি প্রচার করিতেন। তিনি পৌত্তলিকতার বিরোধী ছিলেন এখন কিন্তু প্রাণনাথী সম্প্রদায় পান্না-মন্দিরে তাঁহার গ্রন্থের পূজা করেন। প্রাণনাথের আসন যেখানে যেখানে আছে সেখানে সেখানেই একখানা বিছানার উপরে একটি করিয়া পাগড়ী আছে। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে মুর্তজা হুসেন (Murtaza Husain) দেখিয়াছিলেন বিছানার এক পাশে মুসলমানের কোরাণ, অপর পাশে হিন্দুর পুরাণ রহিয়াছে। হিন্দু এবং মুসলমান পণ্ডিতগণ কোরাণ ও পুরাণের জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছেন। ঈশ্বর যে এক, ইহাই সকলকে বুঝানো হইত। এই সম্প্রদায়ের শিষ্য সংখ্যা এখন বেশী নহে। শিষ্যেরা অধিকাংশই পান্নায় বসবাস করেন, যুক্ত প্রদেশে ও নেপালে কতক কতক শিষ্য আছে। বুন্দেলখণ্ডের মধ্যে এই সম্প্রদায়ের শিষ্য প্রশিষ্যের মৃত্যু হইলে পান্নায় তাহাদের কবর দেওয়া হয়। কোথায় কোথায়ও সৎকারের ব্যবস্থাও আছে।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

চাটুপুষ্পাঞ্জলি

নবগোরোচনাগৌরীং প্রবরেন্দীবরাম্বরাং।
মণিস্তবকবিদ্যোতিবেণীব্যালাঙ্গণাফণাম্॥ ১ ॥

নব গোরোচনা দ্যুতি, শ্রীঅঙ্গ শোভয়ে অতি,
নীল পদ্ম রুচি শাড়ী তায়।
লম্বিত বেণীবোপরে, মণিগুচ্ছ শোভা করে,
ফণাযুক্ত ভুজঙ্গিনী প্রায়। ১।

উপমানঘটামানপ্রহারিমুখমণ্ডলাং।
নবেন্দুনিন্দিভালোদ্যৎ কস্তুরী তিলকশ্রিয়ম্॥ ২ ॥

কিবা সে মুখমণ্ডল, চন্দ্র পদ্ম যে সকল,
উপমার গর্ব্ব খর্ব্বকারী।
জিনিয়া নবীন চাঁদ, সুন্দর কপাল ছাঁদ
কস্তুরী তিলক মনোহারী। ২।

ভ্রূজিতানঙ্গকোদণ্ডাং লোলনীলালকাবলিং।
কজ্জলোজ্জলতারাজচ্চকোরীচারুলোচনাম্॥ ৩ ॥

কন্দর্পের কোদণ্ড জিনি, ভুরুযুগ সুবলনী,
অলকা ললিত তদুপরি।
কজ্জলে উজ্জলময়, কিবা সে লোচনদ্বয়,
শোভে যেন যুগল চকোরী। ৩।

তিলপুষ্পাভনাসাগ্র বিরাজদ্বরমৌক্তিকাং।
অধরোদ্ধৃত বন্ধুকাং কুন্দালীবন্ধুরদ্বিজাম্॥ ৪ ॥

নাসা তিল-ফুল-আভা, বরমুক্তা করে শোভা,
আর তাহে বান্ধুলী অধর।
কিবা সে দশনগুলি, যেন কুন্দ পুষ্পকলি,
শোভান্বিত অতি মনোহর। ৪।

সরত্ন স্বর্ণরাজীব কর্ণিকাকৃতকর্ণিকাং।
কস্তূরীবিন্দুচিবুকাং রত্নগ্রৈবেয়কোজ্জ্বলাম্। ৫।

কর্ণে স্বর্ণপদ্ম ঢেঁড়ী, নানা রত্ন তাহে বেড়ি,
চিবুকে কস্তূরী বিন্দু শোভা।
কণ্ঠে লুণ্ঠে রত্নহার, কি কহিব শোভা তার,
অপরূপ কৃষ্ণ মন লোভা। ৫।

দিব্যাঙ্গদপরিষ্বঙ্গ লসদ্ভুজমৃণালিকাং।
বলারিরত্নবলয়কলালম্বিকলাবিকাম। ৬॥

পদ্মের মৃণাল জিনি, বাহুযুগ সুবর্ণী,
অঙ্গদ ভূষণ সুশোভিত।
নীল মণি বালা হাতে, নানারত্ন শোভে তাতে,
সুমধুর ধ্বনি সমন্বিত। ৬।

রত্নাঙ্গুরীয়কোল্লাসি বরাঙ্গুলিকরাম্বুজাং।
মনোহর মহাহার বিহারীকুচকুট্মলাম্॥ ৭॥

করাম্বুজ বরাঙ্গুলি, তাতে নানা রত্নাঙ্গুরী,
উল্লাসিত করে যার শোভা।
মনোহর হার গলে, নানারত্ন তাহে মিলে,
পয়োধর বেড়ি যার আভা। ৭।

রোমালিভুজগীমূর্দ্ধ রত্নাভতরলাঙ্কিতাং।
বলিত্রয়ীলতাবদ্ধ ক্ষীণভঙ্গুর মধ্যমাম্॥ ৮॥

কণ্ঠহারস্থিতমণি, রোমাবলি ভুজঙ্গিনী,
শিরে যেন মণি শোভা করে।
কটিতট ক্ষীণা হেন, কুচভরে ভাঙ্গে যেন,
বলিয়া ত্রিবলী আছে বেড়ে। ৮।

মণিসারসনাধার বিস্ফারশ্রোণীরোধসং।
হেমরম্ভামদারম্ভস্তম্ভনোরুযুগাকৃতিম্॥ ৯॥

বিস্তার নিতম্ব মাঝে, ক্ষুদ্র ঘণ্টী তাতে সাজে,
মণিতে খচিত মনোহর।
উরুযুগ সুবলনী, সুবর্ণ কদলী জিনি,
তার মদ গর্ব্ব খর্ব্বকর। ৯।

জানুদ্যুতিজিতক্ষুল্লপীতরত্ন সমুদ্গকাং।
শরন্নীরজ নীরাজ্য মঞ্জীরবিরণৎ পদাম॥ ১০।

কিবা সে জানুর ছটা, পীতবর্ণের বস্ত্র বোটা,
তাহার সৌন্দর্য্য তিরস্কৃত।
সুন্দর শবদ যুত, কিঙ্কিণী পদ শোভিত,
শরৎ সরোজ নিরাজিত। ১০।

রাকেন্দুকোটি সৌন্দর্য্য জৈত্রপাদনখদ্যুতিং।
অষ্টাভিঃ সাত্ত্বিকৈর্ভাবৈরাকুলীকৃতবিগ্রহাম্॥ ১১॥

পাদপদ্ম নখ চাঁদ, কোটি কোটি পূর্ণচাঁদ,
শোভা যত অপহৃত হয়।
স্তম্ভ স্বেদ পুলকাদি, অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবাবধি
সর্ব্বাঙ্গে আকুলী কৃতময়। ১১।

মুকুন্দাঙ্গ কৃতাপাঙ্গামনঙ্গোর্ম্মিতরঙ্গিতাং।
ত্বামারব্ধপ্রিয়ানন্দাং বন্দে বৃন্দাবনেশ্বরি॥ ১২॥

কৃষ্ণাঙ্গে অপাঙ্গপাতে, অনঙ্গোর্ম্মি উঠে তাতে
পরে কৃষ্ণ সঙ্গ লাভ করি।
অপার আনন্দ যত, ভোগ কর অভিমত,
বন্দ তোরে বৃন্দাবনেশ্বরী। ১২।

অয়ি প্রোদ্যন্ মহাভাবমাধুরীবিহ্বলান্তরে।
অশেষনায়িকাবস্থা প্রাকট্যাদ্ভুতচেষ্টিতে॥ ১৩॥

সমুদিত মহাভাব, মাধুর্য্যে তব স্বভাব
বিবশ হ'য়েছে হে শ্রীমতি।

সর্ব্ব নায়িকালক্ষণ,　　　　স্বভাব ভঙ্গিমাগণ,
ব্যক্ত দেখি সভে মুগ্ধ অতি। ১৩।

সর্ব্বমাধুর্য্যবিজ্ঞোলীনির্ম্মঞ্ছিতপদাম্বুজে।
ইন্দিরামৃগ্যসৌন্দর্য্যস্ফুরদঙ্ঘ্রিনখাঞ্চলে ॥ ১৪ ॥

সকল নায়িকাগত,　　　　মাধুর্য্যাদি গুণ যত,
তব পদে নির্ম্মঞ্ছন করে।
লক্ষ্মীর বাঞ্ছিত যত,　　　　সে সৌন্দর্য্য বিরাজিত,
তুয়াপদপঙ্কজ নখরে। ১৪।

গোকুলেন্দ্র মুখীবৃন্দ সীমন্তোত্তংসমঞ্জরি।
ললিতাদি সখীযূথজীবাতুস্মিতকোরকে ॥ ১৫ ॥

গোকুল বাসিনী যত,　　　　নারীর শিরভূষিত,
তুমি পুষ্প মঞ্জরী স্বরূপ।
তব মৃদু মন্দহাসি,　　　　কলিকা এ হেন বাসি,
ললিতাদির প্রাণৌষধি রূপ। ১৫।

চটুলাপাঙ্গ মাধুর্য্যবিন্দূন্মাদিতমাধবে।
তাতপাদযশঃস্তোম কৈরবানন্দচন্দ্রিকে ॥ ১৬ ॥

চঞ্চল অপাঙ্গ ধারা,　　　　মাধুর্য্যাদি বিন্দুদ্বারা
কৃষ্ণ চিত্ত উন্মত্ত কারিণী।
নিজ পিতৃকীর্ত্তিগণ,　　　　কুসুমের সুশোভন,
তুমি হও চন্দ্রিকা রূপিণী। ১৬।

অপার করুণাপূর পূরিতান্তর্ম্মনোহ্রদে।
প্রসীদাস্মিন জনে দেবি নিজদাস্যস্পৃহাজুষি ॥ ১৭ ॥

তোমার হৃদয় হ্রদ,　　　　অপার কৃপা পূরিত,
দেখি দেবি! লোভ হয় মনে।
দাস্যদান দিয়া মোরে,　　　　রাখ পদে কৃপা করে
প্রসন্না হও এই জনে। ১৭।

কচ্চিৎ ত্বং চাটুপটুনা তেন গোষ্ঠেন্দ্র সুনুনা।
প্রার্থ্যমানচলাপাঙ্গ প্রসাদাৎ দ্রক্ষ্যসে ময়া ॥ ১৮ ॥

তব মান অন্তে কৃষ্ণ, বলিয়া বচন মিষ্ট
মিলিবারে করিলে প্রার্থনা।
চঞ্চল অপাঙ্গে হেরে, প্রসন্নতা হবে তাঁরে,
সেই ভঙ্গি দেখিতে কামনা। ১৮।

ত্বাং সাধু মাধবী পুষ্পৈর্ম্মাধবেন কলাবিদা।
প্রসাধ্যমানাং স্বিদ্যন্তীং বীজয়িষ্যাম্যহং কদা ॥ ১৯ ॥

কৃষ্ণ শিল্পে সুনিপুন, ল'য়ে মাধবী কুসুম।
তোমাকে করিবে অলঙ্কৃত।
তাঁর করস্পর্শে তবে, অঙ্গে ভাব ঘর্ম্ম হবে,
ব্যজনেতে আমি হব রত। ১৯।

কেলিবিস্রংসিনোবক্রকেশবৃন্দস্য সুন্দরি।
সংস্কারায় কদা দেবি জনমেতং নিদেক্ষসি ॥ ২০ ॥

হে দেবি। হে সুন্দরি! কৃষ্ণ সঙ্গে কেলি করি,
বিমুক্ত হইলে তব কেশ।
সেই কেশ পুনর্ব্বার করিবারে সংস্কার,
কবে হবে এজনে আদেশ। ২০।

কদা বিম্বোষ্ঠি তাম্বুলং ময়াতব মুখাম্বুজে।
অর্প্যমাণং ব্রজাধীশসুনুরাচ্ছিদ্য ভোক্ষ্যতে ॥ ২১ ॥

হে বিম্বোষ্ঠি! কবে তব, মুখাব্জে তাম্বুল দিব,
কৃষ্ণ তাহা কাড়িয়া খাইবে।
তোমাদের দুজনার, এই ভাব পরচার
হবে, আমি দেখিব তা কবে। ২১।

ব্রজরাজকুমারবল্লভাকুলসীমন্তমণি প্রসীদমে।
পরিবারগণস্য তে যথা পদবী মে ন দবীয়সী ভবেৎ ॥ ২২ ॥

ব্রজরাজ কুমারের, সমস্ত প্রিয়াগণের,
তুমি হও সীমন্তের মণি।
তুমি মোরে কৃপা ক'রে, লহ সেই পরিবারে
গণ্য ক'রে নিবেদিয়ে আমি।২২।

করুণাং মুহুরর্থয়ে পরং তব বৃন্দাবন চক্রবর্ত্তিনি,
অপি কেশিরিপোর্যয়া ভবেৎ সচটুপ্রার্থনভাজনং জনঃ॥ ২৩॥

কেশিরিপু কাছে আসি, জানিয়া তোমার দাসী,
তব সঙ্গে মিলিবার তরে।
করেন চাটু বচন, শুনিয়া আমি তখন,
করে ধরি মিলাব তোমারে।২৩।

ইমং বৃন্দাবনেশ্বর্য্যা জনো যঃ পঠতি স্তবং।
চাটুপুষ্পাঞ্জলিং নাম স স্যাদস্যাঃ কৃপাস্পদম্॥ ২৪॥

বৃন্দাবনেশ্বরীর এই, চাটুপুষ্পাঞ্জলি যেই
স্তবপাঠ করে শ্রদ্ধা ক'বে।
সেই জন শ্রীরাধার, কৃপাপাত্র সুনির্দ্ধার
হইবেন চিরদিন তবে।২৪।
শ্রীরূপ গোস্বামীকৃত শ্লোকছন্দে বিরচিত
এই চাটু পুষ্পাঞ্জলি স্তুতি।
দীন—নৃসিংহপ্রসাদ, করিলা বঙ্গানুবাদ
শ্রীরাধা-পদে করিয়া প্রণতি।

শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ গোস্বামী।

ভক্তির পরাকাষ্ঠা

ভক্তির পরাকাষ্ঠা কি? এই প্রশ্ন করিলে কেহ কেহ উত্তর দিবেন, জ্ঞান। "ভক্তেস্তু যা পরাকাষ্ঠা সৈব জ্ঞানং প্রকীর্ত্তিতম্।" এই মতে "ভক্তি জ্ঞানায় কল্পতে।" আর এক পন্থা জ্ঞানকে ভক্তির চরম সীমা নির্দ্দেশ না করিয়া বলেন, ভক্তি জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ,—"সা তু কর্ম্মজ্ঞান যোগেভ্যঽপ্যধিকতরা।" ভক্তির ফল জ্ঞান নহে, জ্ঞানের ফলই ভক্তি,—

"বিদ্যা হ'তে জ্ঞান হয়, জ্ঞানে হয় ভক্তি।"

জন্মজন্মান্তরের তপস্যা, জ্ঞান ও সমাধি-প্রভাবে ক্ষীণপাপ হইলে মানুষের শ্রীকৃষ্ণে ভক্তির উদয় হয়। জ্ঞান ও ভক্তি পরস্পর স্বাধীন ও নিরপেক্ষ এমতও প্রচলিত আছে। জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের কোনও একটী আশ্রয় করিলেই শান্তি পাওয়া যায়। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি সাধন রাজ্যের তিনটী পথ। কর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা এই যে, ইহা চিত্ত শুদ্ধি সাধিত করে। "এতেষাং নিত্যাদীনাং বুদ্ধি শুদ্ধিঃ পরং প্রয়োজনম্।"—(বেদান্তসার।) এই চিত্ত শুদ্ধির ফল হৃদয়ে ভক্তির উদ্রেক। ভক্তিসন্দর্ভ বলেন,—

"দান ব্রত তপো হোম জপ স্বাধ্যায় সংযমৈঃ।
শ্রেয়োভির্বিবিধৈশ্চান্যৈ কৃষ্ণে ভক্তির্হি সাধ্যতে॥"

সুতরাং কর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে যদি শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি না জন্মে, তাহা হইলে সেই সকল শ্রৌত ও স্মার্ত্ত আচার পালন কায়ক্লেশ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? কারণ ক্রিয়া কেবল ক্রিয়ার অনুরোধে অনুষ্ঠিত হইলে তাহা ধ্রুব ফল প্রদান করিতে পারে না। "প্লবাহ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপাঃ।"—শ্রীভাষ্য। কর্ম্মরূপ ভঙ্গুর উড়ুপের সাহায্যে সংসার সাগর পার হওয়া যায় না। তাই অন্য আশ্রয় লইতে হয়, ইহাই হইল শাস্ত্রবাক্য। কর্ম্মানুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধ হইলে প্রবুদ্ধসত্ব মানস দর্পণে যথার্থ জ্ঞানের ছায়া পড়ে। জ্ঞানের আলোকে তমঃ অন্তর্হিত হইলে জীবের অব্যাহত আত্মদর্শন ঘটিয়া থাকে। সুতরাং জ্ঞান লাভই কর্ম্মের উদ্দেশ্য ও এই জ্ঞান লাভই কর্ম্মের পরিণতি।

"সর্ব্বকর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।"

তত্ত্ব জ্ঞানের উদয় হইলে আর কর্ম্মের প্রয়োজন হয় না, জ্ঞানাগ্নিতে সকল কর্ম্ম দগ্ধ হইয়া যায়। তাহার পর এই জ্ঞানের কার্য্য কি?—

"অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।"

তিনি সমস্ত ভূতে অবিভক্ত—প্রকৃতপক্ষে এক, কেবল বাহ্য উপাধির পার্থক্য বশতঃ পৃথক বলিয়া বোধ হন,—জ্ঞান ইহাই দেখাইয়া দেয়। যোগবাশিষ্ঠের মতে জ্ঞান-ভূমির সাতটী সোপান। বিষয়-বৈরাগ্য ও সাধুসঙ্গ লিপ্সা প্রথম সোপান, নাম শুভেচ্ছা। দ্বিতীয় সোপানের নাম বিচারণা, সঙ্গ-মাহাত্ম্য ও শাস্ত্রচর্চ্চার ফলে আত্মতত্ত্বের বিচারে প্রবৃত্তি। বিচারণার ফলে মন তমোশূন্য হইয়া লঘু হয়, ইহার নাম তনুমানসা। তমের প্রভাব হইতে মুক্ত হইলে মন নির্গ্রন্থি ও স্থির হয়, ইহাকে বলা হইয়াছে সত্ত্বাপত্তি। পঞ্চম সোপান অসংশক্তি,

বিষয় শক্তির সমূল বিনাশ। বিষয় বন্ধন কাটিয়া গেলেই মন অনন্যচিন্ত হইয়া প্রকৃত তত্ত্বের ভাবনা করে, ইহার নাম পদার্থ ভাবনা, ইহাই ষষ্ঠ সোপান। শেষ ও সপ্তম সোপানের নাম তুর্য্যগাগতি, এই সময় আত্মপর ভেদ জ্ঞান রহিত হইয়া ব্রহ্মে স্বাভাবিকী নিষ্ঠা জন্মে। ইহাই গীতার সাত্ত্বিক জ্ঞান।

"সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তদ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥" গীতা ১৮।২০

এই জ্ঞানের উদয় হইলে ক্ষুদ্র 'আমি'র বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। অল্পে তৃপ্তি হয় না, ভূমার সুখের জন্য প্রাণ লালায়িত হয়, সকল কর্ম্মই শ্রীবিষ্ণুপ্রীতি কামনায় অনুষ্ঠিত হয়।

জীব ত সেই সচ্চিদানন্দের চিৎকণা, তবে তাহাকে সাধনা করিয়া এ জ্ঞান লাভ করিতে হয় কেন? "জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস তাহা ভুলি গেল। অতএব মায়া পিশাচী তার গলায় বাঁধিল।" এই পিশাচীর প্রভাবে স্বতঃ নির্ম্মল চিত্তও মলিন হয়, এই চিত্তমালিন্যই অজ্ঞান। পিশাচীর কবল হইতে কি মুক্তির উপায় নাই? তাপত্রয়ে জীর্ণ দেহ, কামাদির ভূনির্দেশপালননিরত জীব ভাগ্যক্রমে—

"ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু বৈদ্য পায়।
তার উপদেশ মন্ত্রে পিশাচী পলায়।"

সুচিকিৎসায় পিশাচী অপসারিত হইলে জীব সুস্থ ও স্বস্থ হইয়া—

"কৃষ্ণ ভক্তি পায় তবে কৃষ্ণ নিকট যায়।"

অহঙ্কার বিমূঢ় জীব আপনাকে কর্ত্তা মনে করিলেও পরমকরুণ শ্রীকৃষ্ণের দয়ার অবধি নাই, তিনি তাহার উদ্ধারের জন্যই তাই—

"শাস্ত্র গুরু আত্মরূপে আপনা জানান।
কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা জীবের হয় জ্ঞান॥"

এই পরাজ্ঞানের উদয় হইলে অবিদ্যার আঁধার তিরোহিত হয় জীবের গোবিন্দাভিমুখিনা রতি জন্মে। এই জ্ঞানের উল্লেখ করিয়াই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, "আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই চতুর্ব্বিধ সুকৃতিব্যক্তি আমাকে ভজনা করে।" "জ্ঞানী" ও "ভজনা" এই দুইটা পদের প্রয়োগে যে ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে, তাহাতেও বুঝা যায় যে, জ্ঞান ভক্তির সাধন মাত্র। কিন্তু জ্ঞানমাত্রেই ভক্তির সাধন নহে,—দ্বেষী ব্যক্তিরও ভগবদ্‌বিষয়ক জ্ঞান থাকিতে পারে। অনুশীলনে অনুকূলতা থাকা আবশ্যক। সুকৃতির ফলে এই অনুকূলতা আইসে, এই জন্যই গীতার শ্লোকে "সুকৃতি" বিশেষণটা

প্রয়োগ করা হইয়াছে। ভক্তি স্বয়ং ফলরূপ, জ্ঞানের সহিত ভক্তির কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নাই। মুখ্যতঃ মহৎকৃপা বা ভগবদ্-কৃপালেশে ভক্তি লাভ হইয়া থাকে। ভক্ত ও ভগবানে প্রেমের সম্বন্ধ। জ্ঞানে ব্রহ্মের স্বরূপ জানা যায়,—কিন্তু কতটা জানা যায় তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। ইউরোপের জনৈক বিখ্যাত দার্শনিক বলিয়াছেন, "Our conception of the deity is bounded dy the condition which bound all human knowledge"—অধিকন্তু স্বরূপ জ্ঞান ও প্রেম পৃথক পদার্থ। প্রেম চাহে মাখামাখি। শুদ্ধ জ্ঞানের সাহায্যে স্বরূপ ধারণাই অসম্ভব, মাখামাখি ত দূরের কথা। "ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ" "অনোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্"—প্রেম ও প্রেমাস্পদের মধ্যে যদি এত ব্যবধান থাকে তবে কি প্রেম হয়? প্রেম সঞ্চারের পূর্ব্বে যে দৃঢ় মনঃসঙ্গ অপরিহার্য্য! প্রেমের কথা মনে আসিলে যদি ভয়, সঙ্কোচ, সম্ভ্রম আসিয়া হিয়ার দুয়ারে প্রহরী খাড়া করিয়া দেয় তবে প্রেমের আশা করা কি মূর্খতা নয়? জ্ঞান প্রেম ঘোটনা করিতে পারে না, ভাঙ্গিয়া দেয়।

"শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।

তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥"

শ্রেয়ঃ প্রাপ্তির প্রশস্ত উপায় ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া শুষ্ক জ্ঞানলাভের প্রয়াস তুষাবঘাতের ন্যায় ক্লেশেই পরিসমাপ্ত হয়। সেই ত্রৈলোক্যজয়ী পুরুষকে জয় করিতে হইলে জ্ঞানে প্রয়াস ত্যাগ করিয়া তাঁহার শ্রীচরণাম্বুজে নত হইতে হইবে, তবে তাঁহার কৃপায় লৌল্য আসিবে—জন্মকোটি সঞ্চিত সুকৃতির ফলে যাহা পাওয়া যায় না, এই লৌল্যই তাহার একমাত্র মূল্য।

এইবার বলুন দেখি, ভক্তির পরাকাষ্ঠা কি জ্ঞান? ভক্তি সাধন করিতে করিতে জ্ঞান হয়, নারদ শাণ্ডিল্যাদি ঋষিগণ একথা ত মানেনই না, অপিচ জ্ঞান সাধন করিতে করিতে ভক্তি হয়, তাঁহারা ইহাও বিশ্বাস করেন না। প্রবর্ত্তক অবস্থায় সাধকের কর্ম্মানুষ্ঠান আবশ্যক বটে, কিন্তু চিরকালই কর্ম্ম ধরিয়া থাকিবার প্রয়োজন হয় না। বালককে বিদ্যালয়ের প্রতি শ্রেণীতেই বর্ণপরিচয় পাঠ করিতে হয় না।

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।

মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥" ভাঃ ১১।২০।৯

এই শ্রদ্ধা হইতেই সাধুসঙ্গে প্রবৃত্তি ও ভজনে রুচি জন্মে। জ্ঞানের

পক্ষেও এই কথা। জ্ঞেয় জানিবার জন্যই জ্ঞানের প্রয়োজন। সে প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে জ্ঞানকে ধরিয়া রাখা বিফল। দীপ প্রজ্বলিত হইলে দগ্ধশলাকা ফেলিয়া দেওয়াই লোকাচার প্রসিদ্ধ। জ্ঞান যাহা নিশ্চিত করিতে পাবে কি না সন্দেহ (অর্থাৎ ভগবানের স্বরূপ নির্ণয়,) তাহা ভক্তি দ্বারা প্রকৃষ্টরূপেই হইয়া থাকে। "ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।"—"আমার পরিমাণ ও প্রকৃতি ভক্তির সাহায্যে যথার্থরূপে আভিমুখ্যে জানিতে পারা যায়।" পরিমাণ অর্থাৎ ব্যাপকতা,—"স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি। যাহা যাহা দৃষ্টি পড়ে তাহা কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি।" জ্ঞানের দৃষ্টি কি ইহা অপেক্ষা বেশী যায়? "রসিকশেখর কৃষ্ণ পরম করুণ" ভক্তের নিকট, আর জ্ঞানীর নিকট, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত চৈতন্য। কোন্ দেখাটা ভাল?—তাজমহলের ইট চূণ সুরকীর গাদা, না অক্ষুন্ন সৌধ।

তাহার পর ভক্তিযোগ অন্য সাধন অপেক্ষা সুলভ। "অন্যস্মাৎ সৌলভং ভক্তৌ।" কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগের মধ্যে শেষোক্ত ভক্তি সাধন-জন্য শরীর, চিত্ত ও ধনাদির পীড়ন না থাকায় উহা সুলভ। তারপর ভগবান্ জ্ঞানীর সহজপ্রাপ্য নহেন—"বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান মাং প্রপদ্যতে" কিন্তু ভক্তের তিনি ক্রীতদাস "অহং ভক্ত পরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।" ভগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন—

"যৎকর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেন শ্রেয়োভিরিতরৈরপি॥
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদভক্তা লভতেঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিৎ যদি বাঞ্ছতি॥"

কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ দান প্রভৃতি মঙ্গলবাচক ক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা যাহা যাহা লাভ হইয়া থাকে, আমার ভক্তগণ কেবল ভক্তিযোগ অবলম্বন করিয়াই সেই সকল অনায়াসে লাভ করিয়া থাকেন। এবং যদিও তাহারা নিষ্কামভাবে আমাকে ভক্তি করেন, তথাপি ইচ্ছা করিলেই স্বর্গ ভোগ মোক্ষাদি অপবর্গ ও মদ্ধাম পর্য্যন্ত পাইয়া থাকেন। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি পরস্পর পরস্পরের সহায়ক, উদ্দেশ্য সিদ্ধির সোপান, পরন্তু উদ্দেশ্য নহে। জ্ঞানচর্চ্চায় ভক্তিলাভ হয় না, অথচ ভক্তির অনুশীলনে জ্ঞানের কার্য্য সাধিত হয়। জ্ঞানে চকিতের মত তাঁহার আভাস পাওয়া যায়, ভক্তি তাহাকে পূর্ণষড়ৈশ্বর্য্য মাধুর্য্যের মহোদধিরূপে প্রতিভাত করেন ক্রমে সাধনা করিতে করিতে নির্ম্মল প্রেমের উদয়

হইলে ঐশ্বর্য্যভাবও শিথিল হইয়া যায়। ভক্ত ভগবান হইতে আপনাকে অভিন্ন দেখেন—তাঁহার কাঁধে চড়েন তাঁহাকে উচ্ছিষ্ট দেন, পায়ে ধরান। তিনিও শুদ্ধপ্রেমে সদাকৃষ্ট, বিবশীকৃত। যে আপনাকে বড় মানিয়া তাঁহাকে হীন ভাবে, তিনি চিরকালই তাহার প্রেমে অধীন হইয়া পড়েন। প্রেমের গরিমা বাড়াইবার জন্য পা দু'খানি জড়াইয়া ধরিয়া বলেন "দেহি পদপল্লবমুদারম্।" শাস্ত্র বলেন, "রসো বৈ সঃ।" এই অনুচৈতন্য জীবও ত সেই বিভু চৈতন্য রসময়ের অংশকলা, সুতরাং তাহারও প্রাণে রস-পিপাসা আছে। জ্ঞানযোগে এই পিপাসা মিটে না, মিটিলে উদ্ধবমহারাজ বলিতেন না,—

আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥" ভাঃ ১০।৪৭।৬১

শ্রুতিগণ অনুসন্ধান করিয়াও শ্রীমুকুন্দের দর্শন পান নাই। কিন্তু ব্রজদেবী-গণ স্বজন ও লোকবিধির নিরপেক্ষ ভাবে এক মনে ভজনা করিয়া তাঁহাকে পাইয়াছিলেন। তাঁহারাই ধন্যা, তাঁহাদের পদরেণুপূত গুল্মলতা ঔষধিগণও ধন্য। আমার নরদেহে ধিক্, যোগাভ্যাসে ধিক্। শ্রীবৃন্দাবনে উদ্ভিদ্ দেহও আমার ভাল ছিল, কারণ তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার প্রেয়সীগণের পাদস্পৃষ্ট রজে কৃতার্থ হইতে পারিতাম।

এহেন ভক্তির পরাকাষ্ঠা জ্ঞান, ইহা কি বলিতে পারা যায়? ভক্তির সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়া দেবর্ষি বলিয়াছেন, "সা কস্মৈ পরমপ্রেমরূপা।"—শ্রীকৃষ্ণে প্রেমের নামই ভক্তি। কবিরাজ গোস্বামী এই প্রেমের পর্য্যায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"কোনো ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ যে করয়॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্ত্তন।
সাধনভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ নিবর্ত্তন॥
অনর্থ নিবৃত্তি হৈতে ভক্ত্যে নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয়॥
রুচি হৈতে ভক্ত্যে হয় আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণ প্রীত্যঙ্কুর॥

সেই ভাব গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম।
সেই প্রেম প্রয়োজন, সর্ব্বানন্দ ধাম॥"
"পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু।
মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে একবিন্দু॥"

কেবল শুদ্ধচিত্তেই এই প্রেমের উদয় সম্ভব, ভুক্তি মুক্তি বাঞ্ছা মনে থাকিলে প্রেম উৎপন্ন হয় না। প্রেমে বাসনা থাকিলে অকৈতবে ভক্তি অঙ্গের যাজনা করিতে হয়,—

"সাধুসঙ্গ নাম কীর্ত্তন ভাগবত শ্রবণ।
মথুরাবাস শ্রীমূর্ত্তি শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥"

হৃদয়ে এই প্রেমাঙ্কুর জন্মিলে কি হয়, তাহাই বলিতেছেন —

"ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ॥
আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতভাবাঙ্কুরে জনে॥" ভঃ রঃ ১।৩।১১

প্রাকৃত কারণে তাহার ক্ষোভ জন্মে না, কৃষ্ণ কথা ভিন্ন বৃথা সময় যায় না, বিষয়ে বিতৃষ্ণা আসে, অভিমান ছাড়িয়া যায়, কৃষ্ণ কৃপায় দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে উৎকণ্ঠায় আকুল হইয়া পড়ে, সর্ব্বদা তাঁহার নাম গান ও গুণ বর্ণন করিতে ভালবাসে, কৃষ্ণলীলা স্থলে বসতির জন্য লালায়িত হয়। সে দেহ গেহের স্মৃতি ভুলিয়া যায়, সকল কর্ম্ম তাঁহাতে অর্পণ করে, তাঁহার বিরহে পরম ব্যাকুল হয়। এ প্রেম কেবল কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য, স্বসুখ নিরভিলাষ। ইহাতে লাভালাভের খতিয়ান নাই, নেওয়া দেওয়ার বণিক্‌বৃত্তি নাই, আছে কেবল অকুণ্ঠার সর্ব্ব-সমর্পণ, আত্মনিমজ্জন। তিনিই একমাত্র বাঞ্ছা, তাঁহাকে পাইলেই সকল কামনার সিদ্ধি হয়। ধনজন দেহ গেহ সকলই তাঁহার, তিনি প্রাণাপেক্ষা ও শত শত গুণ প্রিয়তম। তিনি ভিন্ন অন্য কেহ শান্তি দিতে পারে না, 'অন্যের আছয়ে অনেক জনা, আমার কেবল তুমি।' এই নিরমল হেম-সম শুদ্ধ কৃষ্ণ-প্রেম কাহারও ফল নহেন। অন্য কিছুও এই প্রেমের ফল হইতে পারে না,

কারণ জীবে ঈশ্বরে ইহা অপেক্ষা নৈকট্যের সম্বন্ধ কল্পনাতেও ধারণা করা যায় না। এই প্রেমের স্বরূপ অনির্ব্বচনীয়, উহা অনুভবের জিনিষ, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। যেমন গগনের উপমা গগন, সাগরের তুলনা সাগর সেই প্রকার প্রেমস্বরূপ ভক্তি স্বয়ং ফলরূপ ও স্বয়ং পর্য্যাপ্ত—ভক্তির পরাকাষ্ঠা ভক্তি, অন্য কিছু নহে ॥

শ্রীআশুতোষ হাটী।

প্রভুর অপ্রকট

শ্রীচৈতন্য ভাগবত, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত আছে,—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের আকুল আহ্বানে শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হন। দেশ তখন এক রূপ বিষ্ণুভক্তি শূন্য ছিল,—

"কৃষ্ণ নাম ভক্তি শূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সব এই মাত্র জানে।
মঙ্গল চণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহুধন॥"

* * * *

বাসুলি পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে॥" চৈঃ ভাঃ আদি২অঃ

লোকের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া শ্রীঅদ্বৈত প্রভু প্রাণে বড়ই ব্যথা পাইতেন। তিনি ভাবিতেন মঙ্গলময় শ্রীহরি যদ্যপি এই ধর্ম্ম-বিপর্য্যয়ের দিনে আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হন, তাহা হইলেই দেশে আবার সুদিন আসিবে। দয়াল শ্রীঅদ্বৈত এই-রূপ চিন্তা করিয়া যাহাতে প্রভু উদিত হন, তজ্জন্য একচিত্তে প্রভুর সেবা করিতে লাগিলেন।

"কৃষ্ণ অবতারিতে আচার্য্য প্রতিজ্ঞা করিলা।
কৃষ্ণ পূজা করে তুলসী গঙ্গাজল দিয়া ॥
কৃষ্ণরে আহ্বান করে কখন হুঙ্কার।
হুঙ্কারে আকৃষ্ট হৈলা ব্রজেন্দ্র কুমার ॥" (চৈঃ চঃ)

শ্রীগৌরাঙ্গ ইহা নিজ মুখে স্বীকার করিয়াছেন যে, অদ্বৈতের কারণেই আমার অবতার।—

"অদ্বৈতের কারণে চৈতন্য অবতার।
সে প্রভু কহিয়াছেন বারবার ॥" (চৈঃ ভাঃ)

শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইয়া বহুকার্য্য সাধন করিয়া ছিলেন। তন্মধ্যে আপনি আচরণ করিয়া জীবকে ভক্তি-ধর্ম্ম শিখান তাঁহার প্রধান কার্য্য ছিল। এই সমস্ত কার্য্য করিতে তাঁহার ৪৮ বৎসর পরিমিত মানব দেহ ব্যয়িত হইয়াছিল। কিন্তু গৌর আনা গোসাঞি শ্রীঅদ্বৈত তাঁহার প্রভুকে গোলকধাম শূন্য করিয়া এতদিন এই মলিন পৃথিবীতে রাখিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। আমরা ক্রমে সেই কথাই বলিতেছি।

মহাপ্রভু প্রতিবৎসর তাঁহার দুঃখিনী জননীর তত্ত্ব লইতে পণ্ডিত জগদানন্দকে নবদ্বীপে পাঠাইতেন। আর বলিয়া দিতেন, পণ্ডিত, তুমি আমার হইয়া মাতার পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া বলিও, 'মা। তুমি যখন তোমার নিমাইকে স্মরণ কর, তখন সে নীলাচলে থাকিতে না পারিয়া (সূক্ষ্মদেহে) আসিয়া তোমার চরণ বন্দনা করে তুমি খাওয়াইতে ইচ্ছা করিলে তোমার শ্রীহস্ত প্রদত্ত অন্ন ব্যঞ্জন ভোজন করিয়া যায়। আমি পাগল হইয়াছিলাম তাই তাঁহাকে ছাড়িয়া আসিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছি—মা যেন তাঁহার অধম সন্তানের অপরাধ গ্রহণ না করেন। তিনি আমার গর্ভধারিণী আর আমি তাঁহার সন্তান, আমি যে তাঁহারই আদেশে এই নীলাচলে বাস করিতেছি, আর আমি যতদিন বাঁচিব ততদিন তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া এই স্থানেই অবস্থান করিব।"

আহা। কাঙালের ঠাকুর প্রভুর আমাদের কি অপূর্ব্ব অতুলনীয় মাতৃভক্তি।

প্রভু-ভক্ত জগানন্দ নদীয়ায় গিয়া মাতার চরণে প্রণাম করিয়া প্রভুর আজ্ঞা নিবেদন করিলেন। পরে মাতার নিকট মাসাবধি অবস্থান করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া অদ্বৈতাচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। আচার্য্য তাঁহাকে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন এবং বিদায়কালে প্রভুর জন্য একটি তর্জ্জা বলিয়া পাঠাইলেন।

"প্রভুকে কহিও আমার কোটি নমস্কার।
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার॥
বাউলকে কহিও—লোকে হইল বাউল।
বাউলকে কহিও—হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিও—কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও—ইহা কহিয়াছে বাউল॥"

জগদানন্দ অবশ্য ইহার ভিতরের অর্থ বুঝিলেন না। নীলাচলে আসিয়া ভক্তগণের নিকট আচার্য্যের সন্দেশ জ্ঞাত করিলেন আর ভক্তগণের সহিত আপনি হাসিতে লাগিলেন। স্বরূপ কিন্তু ইহা শুনিয়া কিছু গম্ভীর হইলেন, তিনি ইহা রহস্য বাক্য বলিয়া মনে করিলেন না। একটু ব্যস্ত হইয়া প্রভুকে ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন।

"প্রভু কহে—আচার্য্য হয় পূজক প্রবল।
আগম শাস্ত্রের বিধি বিধানে কুশল॥
উপাসনা লাগি দেবের করে আবাহন।
পূজা লাগি কতোকাল করে নিরোধন॥
পূজার নির্ব্বাহ হৈলে পাছে করে বিসর্জ্জন।
তর্জ্জার না জানি অর্থ—কিবা তার মন॥
মহা যোগেশ্বর আচার্য্য তর্জ্জাতে সমর্থ।
আমিহো বুঝিতে নারি তরজার অর্থ॥
শুনিয়া বিস্মিত হৈলা সব ভক্তগণ।
স্বরূপ গোসাঞি কিছু হইলা বিমন॥"

ভক্তগণ প্রাণে ব্যথা পাইবেন বলিয়া,—প্রভু তাহাদিগকে শ্লোকের অর্থ বুঝিতে দিলেন না। অর্থ এই যে, শ্রীমহাপ্রভু একজন বাউল (ফঁকির) মহাজন, আর শ্রীঅদ্বৈত তাঁহারই অধীন আর একজন বাউল। এই শেষোক্ত মহাজন তাঁহাকে ভবের হাটে জীবগণের নিমিত্ত কৃষ্ণ ভক্তিরূপ চাউল বিক্রয় (বিতরণ) করিবার জন্য আকর্ষণ করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। এখন দেশের সে দুর্দ্দিন ঘুচিয়াছে। ভক্তি শূন্য সংসার ভক্তিতে পূর্ণ হইয়াছে। জীবগণ আকণ্ঠ ভক্তি সুধা পান করিয়া ধন্য হইয়াছে। তাহাদের প্রাণ পবিত্র ও স্বর্গীয় আলোকে আলোকিত হইয়াছে। আর ত চাউল বিক্রয় অর্থাৎ প্রেম প্রচারের আবশ্যক নাই। পূর্ণব্রহ্ম শ্রীগৌরাঙ্গ,—

দুরমতি অতি,　　　　পতিত পাষণ্ডী
প্রাণে না মারিল কারে।
হরি নাম দিয়ে,　　　　হৃদয় শোধিল,
যাচি গিয়া ঘরে ঘরে ॥
ভব বিরিঞ্চির　　　　বাঞ্ছিত যে প্রেম,
জগতে ফেলিল ঢালি।
কাঙ্গালে পাইয়ে　　　　খাইল নাচিয়ে
বাজাইয়ে করতালি ॥

আর তখন,—

হাসিয়ে কাঁদিয়ে,　　　　প্রেমে গড়াগড়ি,
পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ।
চণ্ডালে ব্রাহ্মণে,　　　　করে কোলাকুলি,
কবে বা ছিল এ রঙ্গ ॥
ডাকিয়ে হাঁকিয়ে,　　　　খোল করতালে,
গাইয়া ধাইয়া ফিরে।
দেখিয়া শমন,　　　　তরাস পাইয়া,
কপাট হানিল দ্বারে ॥
এ তিন ভুবন,　　　　আনন্দে ভরিল,
উঠিল মঙ্গল রোল।
কহে প্রেমানন্দ,　　　　এমন গৌরাঙ্গে
রতি না জন্মিল তোর ॥

শ্রীঅদ্বৈত, প্রভুকে বলিতেছেন হাটে বিক্রয় করিবার জন্য যে চাউল আনা হইয়াছিল লোকে তাহা পাইয়া আউল হইয়াছে অর্থাৎ তাহাদের অভাব পূর্ণ হইয়াছে। সুতরাং আপনার কার্য্য শেষ হইয়াছে, আপনি এই মলিন পৃথিবী ত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন। অদ্বৈতই তাঁহাকে আনিয়াছিলেন—এক্ষণে "অসাধনে চিন্তামণি" দুর্লভ ধনকে কার্য্য শেষে বিদায় দিতে চাহিতেছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে প্রভুর কার্য্য তখনও শেষ হয় নাই। তিনি ইহার পর আরও দ্বাদশ বৎসর ইহ জগতে অবস্থান করিয়া ছিলেন। কিন্তু,—

"সেই দিন হৈতে প্রভুর আর দশা হৈল।
কৃষ্ণের বিচ্ছেদ দশা দ্বিগুণ বাড়িল ॥

"উন্মাদ প্রলাপ চেষ্টা করে রাত্রি দিনে।
রাধা ভাবাবেশে বিরহ বাড়ে অনুক্ষণে ॥" চৈঃ চঃ অন্ত্যখণ্ড

শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর।
কৃষ্ণের বিরহ স্মৃতি হয় নিরন্তর ॥
শ্রীরাধিকার চেষ্টা যৈছে উদ্ধব-দর্শনে।
এই মত দশা প্রভুর হয় রাতি দিনে ॥
নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ ॥
রোমকূপে রক্তোদ্গম দন্ত সব হালে।
ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয় ক্ষণে অঙ্গ হালে ॥

"দ্বাদশ বৎসর প্রধানতঃ কৃষ্ণ বিরহ লইয়া, প্রভু গম্ভীরা লীলা করেন। এ কৃষ্ণ বিরহ কিরূপ ? অতি প্রিয় ভাল দেহ ত্যাগ করিলে যে দুঃখ হয় তাহাকে শোক বলে। তিনি অদর্শন হইলে প্রিয়জন কিছুদিনের জন্য যে দুঃখ ভোগ করেন তাহাকে বিরহ বলে। মনে ভাবুন পতি দূরে আছেন, তাহার প্রেমে অভিভূতা পত্নী, গৃহে তাহার নিমিত্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। এই যন্ত্রণাকে বলে বিরহ। প্রভুর কৃষ্ণ বিরহ, এই রমণীর পতি বিরহের ন্যায় নহে। পতি দূরে থাকায় তাহার অদর্শন জনিত দুঃখ ছাড়া রমণীর আরো কিছু আছে। মনে ভাবুন পত্নী, পতি কাছে না থাকায়, সাংসারিক অনেক দুঃখ ভোগ করিতে পারেন,—শারীরীর যন্ত্রণা জনিত, অতৃপ্ত ইন্দ্রিয়ের নিমিত্ত দুঃখ পাইতে পারেন, সুতরাং পতি বিরহে রমণীর দুঃখ, আর কৃষ্ণ বিরহে প্রভুর দুঃখ অনেক বিভিন্ন। প্রভু কৃষ্ণকে না দেখিয়া মরিতেছেন, সে কেবল কৃষ্ণ প্রেমের নিমিত্ত। আর পত্নী যদি পতি বিরহে দুঃখ পান তবে সে শুদ্ধ পতির নিমিত্ত নয়। পতির বিরহে পত্নীর যে দুঃখ তাহা প্রভুর কৃষ্ণ বিরহ জনিত দুঃখের সহিত তুলনাই হয় না।

প্রভু কৃষ্ণের নিমিত্ত যে বিরহ দেখাইয়াছেন, ইহা জগতে কেহ কাহারও নিমিত্ত কখন দেখাইতে পারেন নাই। এই পদ দেখুন—

"বিরহ ভাবে মোর গৌরাঙ্গ সুন্দর, ভূমে পড়ি মুরছয়।
পুন পুন মুরছিত অতি ক্ষীণ শ্বাস।
দেখিয়া লোকের মনে হয় কত ত্রাস ॥

উচ্চ করি ভকত বলে হরি বোল।
শুনিয়া চেতন পাই আঁখি ঝরু লোর॥"

আপনারা বিরহে এরূপ কাতর কাহাকেও দেখিয়াছেন কি? কাহারও কথা শুনিয়াছেন কি? কোন কবিতা বা নাটকে পড়িয়াছেন কি? বিরহে মূর্চ্ছা যায় এরূপ কেহ কখন শুনিয়াছেন বা দেখিয়াছেন কি? শোকে মূর্চ্ছা যায় সত্য, কিন্তু সে প্রথম প্রথম, উহা পরে সারিয়া যায়। আর শোকে মূর্চ্ছা যাওয়ার অনেক কারণ আছে যাহা বিরহে নাই। ছত্রিশ বৎসর হইতে প্রভু প্রত্যহ এইরূপ মূর্চ্ছা যাইতেন।

"প্রভু গম্ভীরায় বসিয়া আছেন, সম্মুখে রামরায় ও স্বরূপ। ক্রমে আপনি যে সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য তাহা ভুলিয়া গিয়া শ্রীমতী রাধা হইলেন। অর্থাৎ দেহ রহিল গৌরাঙ্গের কিন্তু শ্রীমতী ঐ দেহে প্রবেশ করিলেন। তাহাতে কি হইল না, স্বরূপ ও রামরায়ের সম্মুখে শ্রীমতী রাধা বসিলেন। সে কেমন, না একদিন যেমন শ্রীবাসের বাড়ীতে শ্রীকৃষ্ণ সকলের সম্মুখে ঐ গৌরাঙ্গ দেহ আশ্রয় করিয়া প্রকাশ হয়েন। তখন তাহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত কথা কহিয়াছিলেন, এখনও স্বরূপ ও রামরায় সেইরূপ শ্রীমতীর সহিত ইষ্টগোষ্ঠি করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কেন আসিয়াছিলেন? না তিনি কিরূপ বস্তু, তিনি চান কি ও তাঁহাকে কিরূপে পাওয়া যায়, তাহাই জীবকে জানাইতে।"—(অমিয় নিমাই চরিত ৬ষ্ঠ খণ্ড।)

এইরূপে প্রভু তাঁহার উৎকল বিহার শেষ করিলেন। গোপী অনুগত ভাবে ভজন করিয়া জীব কিরূপে শ্রীশ্রীরাধা কৃষ্ণ প্রেম-রস সুধানিধি লাভ করিবে প্রভু তাহা তাঁহার এই শেষ দ্বাদশ বৎসরে নিজে আচরণ করিয়া বিশেষ ভাবে শিক্ষা দিয়া গেলেন।　•　•

তখন ১৪৫৫ শকাব্দ; প্রভুর বয়স ৪৮ বৎসর। আষাঢ় মাস, মহাপ্রভু স্বীয় গম্ভীরা-গৃহে—কাশীমিশ্রের ঘরে বসিয়া "বৃন্দাবন কথা কহে ব্যথিত অন্তরে"। আষাঢ় মাস, সুতরাং নবদ্বীপস্থ ভক্তগণ, প্রতি বৎসর যেমন তাঁহাকে দর্শন করিতে গমন করিয়া থাকেন, এবৎসরও তেমনি গিয়াছেন। তাঁহারা চতুর্দ্দিকে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া তাঁহার শ্রীমুখের কথা শ্রবণ করিতেছেন। প্রভু বৃন্দাবন কথা বলিতে বলিতে ব্যথিত হইয়া নীরব হইলেন এবং উঠিয়া শ্রীমন্দিরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কাজে কাজেই ভক্তগণও তাঁহার সঙ্গে চলিলেন।

"নিশ্বাস ছাড়িয়া সে চলিলা মহাপ্রভু।
এমত ভকত সঙ্গে নাহি দেখি কভু॥

"সম্ভ্রমে উঠিয়া জগন্নাথ দেখিবারে।
ক্রমে ক্রমে গিয়া উত্তরিলা সিংহদ্বারে॥
সঙ্গে নিজজন যত তেমতি চলিলা।
সম্ভ্রমে মন্দির ভিতর উত্তরিলা॥"

প্রভু হঠাৎ নীরব হইয়া কেন মন্দিরাভিমুখে যাইতেছেন ভক্তগণ তাহা বুঝিতে না পারিয়া বড়ই চিন্তিত হইয়াছেন। ক্রমে তিনি মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। তাঁহার নিয়ম ছিল গরুড় স্তম্ভের নিকট দাঁড়াইয়া শ্রীজগবন্ধুর মুখারবিন্দ দর্শন করা। প্রভু সেখানে দাঁড়াইয়া উঁকি মারিয়া দেখিতেছেন যেন জগন্নাথের বদন দেখিতে পাইতেছেন না। ভাল করিয়া দেখিবার জন্য ভিতরে রত্নবেদীর নিকট গমন করিলেন।

প্রভু এরূপ কোন দিন করেন না। সুতরাং ভক্তগণ তাঁহার কার্য্য অবাক হইয়া দর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাদের বিস্ময় আরও অধিকতর রূপে বৃদ্ধি পাইল, যেহেতু প্রভু ভিতরে প্রবিষ্ট হইতেই অমনি তথাকার দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল ভক্তগণ বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

"তখনে দুয়ারে নিজ লাগিল কপাট।
সত্বরে চাহিয়া গেল অন্তরে উচাট॥
আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে।
নিবেদন করে প্রভু ছাড়িয়া নিশ্বাসে॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর সে কলিযুগ আর।
বিশেষতঃ কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তন সার॥
কৃপাকর জগন্নাথ পতিত পাবন।
কলিযুগ আইল এই দেহত শরণ॥
এ বোল বলিয়া সেই ত্রিজগৎরায়।
বাহু ভিড়ি আলিঙ্গনে তুলিল হিয়ায়॥
তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইল আপনে॥"

কপাট বন্ধ থাকায় ভক্তগণ অবশ্য ভিতরের ব্যাপার বুঝিতে পারিতেছেন না, কিন্তু পাশের ঘরে তখন একজন পাণ্ডা ছিলেন, তিনি সমস্ত দেখিতে পাইতেছিলেন, প্রভুর এই কাণ্ড দেখিয়া সেই পাণ্ডা ঠাকুরটী দৌড়িয়া বাহিরে আসিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, আর বাহিরের ভক্তগণও তাহার সেই

চীৎকার শুনিয়া কি কি বলিয়া তাহাকে দ্বার উদ্ঘাটন করিতে বলিলেন। তখন পাণ্ডাঁঠাকুর একে একে সমস্ত ঘটনা তাঁহাদিগকে বিবৃত করিয়া বলিলেন। তখন—

"এ বোল শুনিয়া ভক্তগণ করে হাহাকার।

প্রভুর অপ্রকট লীলা প্রাচীন গ্রন্থ সমূহে কিছুই বর্ণিত হয় নাই, সেই হৃদয় বিদীর্ণকারী অতি দুঃখের কাহিনী বৈষ্ণব কবিগণ বর্ণনা করিতে পারেন নাই। চৈতন্য মঙ্গলে ধৃত উপর্যুক্ত ঘটনা, উক্ত গ্রন্থের অনেক প্রাচীন পুঁথিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং তাঁহার অপ্রকট সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছুই বলিতেও পারা যায় না।

কবি জয়ানন্দ তাঁহার চৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থে এ সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যথা—

প্রভুর কার্য্যে জগতের সমস্ত পাপী তাপী উদ্ধার লাভ করিয়াছে। যমলোকে আর কোন পাপী আইসে না। যমরাজ সে বার্ত্তা সৃষ্টি কর্ত্তা ব্রহ্মাকে জানাইলেন, তিনি বুঝিলেন প্রভুর কার্য্য শেষ হইয়াছে। তখন দেবতারা মিলিয়া প্রভুর নিকট আসিলেন।

"নীলা চলে নীলাএ চৈতন্য টোটাশ্রমে।
বৈকুণ্ঠ যাইতে নিবেদিল ক্রমে ক্রমে॥
আষাঢ় সপ্তমী তিথি শুক্লা অঙ্গীকার করি।
রথ পাঠাইহ যাব বৈকুণ্ঠ পুরী॥

*　　*　　*

আষাঢ় বঞ্চিত রথ বিজয়া নাচিতে।
ইটাল বাজিল বাম পাএ আচম্বিতে॥
অদ্বৈত চলিলা গৌড় দেশে।
নিভৃতে তাহারে কথা কহিল বিশেষে॥
নরেন্দ্রের জলে সর্ব্ব পারিষদ সঙ্গে।
চৈতন্য করিল জলক্রীড়া নানা রঙ্গে॥
চরণে বেদনা বড় ষষ্ঠীর দিবসে।
সেই লক্ষ্যে টোটায় শয়ন অবশেষে॥
পণ্ডিত গোসাঞিকে কহিল সর্ব্বকথা।
কালি দশ দণ্ড রাত্রে চলিব সর্ব্বথা॥

নানাবর্ণে দিব্যমালা আইল কোথা হৈতে। কথো বিপ্র ধরি নৃত্য করে রাজ পথে॥
রথ আন রথ আন ডাকেন দেবগণ। গরুড়ধ্বজ রথে প্রভু করি আরোহণ॥
মায়া শরীর তথা রহিল যে পড়ি। চৈতন্য বৈকুণ্ঠে গেলা জম্বুদ্বীপ ছাড়ি॥"

অর্থাৎ গ্রন্থকার সংক্ষেপে ইহাই জানাইতেছেন যে, রথযাত্রার সময় নৃত্য-কালে গৌরাঙ্গের কোমল পদে একটী ইষ্টকের আঘাত লাগে। কিন্তু তখন তিনি তেমন বেদনা বোধ করেন নাই। তিনি সর্ব্ব পারিষদ সঙ্গে নরেন্দ্র সরোবরে জলক্রীড়া করিলেন। ষষ্ঠীর দিন পায়ের বেদনা বাড়িয়া উঠিল। টোটাশ্রমে শয়নাবস্থায় তিনি পণ্ডিত গোসাঞিকে কহিলেন,—আগামী কল্য দশ দণ্ড রাত্রে আমি মায়া শরীর ত্যাগ করিয়া যাইব। এইরূপে আষাঢ়ী শুক্লা সপ্তমী তিথিতে তিনি পায়ের বেদনা উপলক্ষ্য করিয়া লীলা সম্বরণ করিলেন।

কবির সহিত বহুস্থলে আমরা একমত হইতে পারি নাই। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস জীবন ২৪ বৎসর, কিন্তু তিনি তাঁহার (প্রভুর) মুখে বলাইতেছেন,—

"আটাইশ বৎসর আমি নীলাচলে রহি। স্থানান্তরে যাব আমি নিষ্কপটে কহি॥"

ইহা যে আদৌ ঠিক নহে তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। আর একটী কথা, তিনি বলিতেছেন,—

"মায়া শরীর তথা রহিল যে পড়ি। চৈতন্য বৈকুণ্ঠে গেল জম্বুদ্বীপ ছাড়ি॥"

প্রভুর মায়া শরীর, ভক্তগণ তাঁহার তিরোধানের পর যদি পৃথিবীতে দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার উপর চির-স্মরণীয়-কীর্ত্তি স্থাপিত করিয়া দারুণ বিরহ জ্বালা অনেকটা প্রশমিত করিতে পারিতেন। কিন্তু হায়! তাহা কিছুই নাই। ভারতের চারি দিকে কত সাধু মহাপুরুষের সমাধিস্থান সাদরে পূজিত হইতেছে। বুদ্ধদেবের ত কথাই নাই। তাঁহার দেহ-ভস্ম ও সামান্য দন্ত প্রভৃতি লইয়া অবিনশ্বর কীর্ত্তি কত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মন্দিরাদি নির্ম্মিত হইয়াছে কে তাহার ইয়ত্তা করিবে। কিন্তু মহাপ্রভুর ত তাহা কিছুই নাই। থাকিবার মধ্যে রাধাকান্ত মঠে অর্থাৎ যে গম্ভীরা গৃহে তিনি অবস্থান করিতেন তথায় তাঁহার কাঁথার কিয়দংশ কমণ্ডলু ও পায়ের খড়ম জোড়াটি রক্ষিত আছে। নবদ্বীপে তাঁহার সম্পর্কিত এক শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ ব্যতীত আর কিছুই নাই।

ইহা ব্যতীত তাহার গ্রন্থের বর্ণিত বিষয় সম্বন্ধে আমাদের ভূরি ভূরি মত দ্বৈধতা রহিয়াছে; অপ্রাসঙ্গিক বোধে তাহা এস্থলে আলোচিত হইল না।

ক্রমশঃ

শ্রীভোলানাথ ঘোষবর্ম্মা

ভক্তি

(২০শ বর্ষ ২য় সংখ্যা আশ্বিন মাস ১৩২৮ সাল)

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দ রূপাচ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥"

আগমনী

ওই দেখ রাণি আসিছে ঈশানী
তুষিতে তোমার তাপিত জীবন।
আন পূর্ণকুম্ভ অর্ঘ্য দূর্ব্বা ধান্য
আদরে উমারে করিতে বরণ॥
অশুভ ভাবনা ভে'বনাকো আর
সঙ্গে আছে উমার প্রাণের কুমার
বৎসবিনায়ক সর্ব্ববিঘ্নহর
হরষে করিছে-পুরে আগমন॥
কার্ত্তিকেয়, বাণী, কমলারে ল'য়ে
আসিছে শিবানী দশভুজা হ'য়ে
অসুর-নাশিনী কেশরি-বাহিনী
ত্রিনয়না উমায় কর দরশন॥
প্রাণের প্রতিমা উমা আগমনে
আনন্দিত চিত ভারত-সন্তানে
যুক্তকরে সবে "নমস্তস্যৈরবে
করিতেছে দুর্গা নাম-সঙ্কীর্ত্তন॥

হাসিছে কুসুম লুটাইতে পায়
আনন্দে বিহঙ্গ সুমঙ্গল গায়
ফুল্লতরুদলে নীহারের ছলে
প্রেম-অশ্রু-জল করে বরিষণ ॥
শুন শুন রাণি তায় স্রোতস্বিনী
কুলুকুলুরবে করে হুলুধ্বনি
স্নিগ্ধ সমীরণ করে সঞ্চরণ
প্রাণ-উমা অঙ্গে করিতে বীজন ॥
বহুপুণ্যফলে পেয়েছি রতনে
যতনের ধনে রাখগো যতনে
সন্তাপ সকল হরে সুশীতল
উমাধনে ক'রে হৃদয়ে ধারণ ॥
ধন্যহ'ল আজি হেমন্তের পুরী
হেরিনু শঙ্করী মনপ্রাণ ভরি
ধন্য ধন্য দীন— হেমন্ত জীবন
কলুষকলাপ হ'ল বিমোচন ॥

শ্রীহেমন্তকুমার মৌলিক।

ভক্ত সধনা

শ্রীভগবান একদিন তাঁহার অতি প্রিয়ভক্ত নারদকে বলিয়াছিলেন—

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে নচ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥"

হে নারদ! আমি বৈকুণ্ঠে থাকি না, যোগীগণের হৃদয়েও থাকি না আমার ভক্তগণ যেখানে আমার গুণগান করে আমি সত্য সত্যই সেইখানে অবস্থান করিয়া থাকি।

পরম করুণাময় শ্রীভগবান দুর্ব্বল জীবের জন্য সহজসাধ্য শ্রীনাম প্রচার করিয়াছেন। নাম অন্ধের যষ্টি, অকপটভাবে নাম গ্রহণ করিলে ভগবানের

সান্নিধ্য লাভে বিলম্ব হয় না। দয়াময় নিজেই ছুটিয়া আসিয়া নামগ্রহণকারীকে শ্রীহস্ত বাড়াইয়া তুলিয়া লয়েন। সংসার সাগর নিমগ্ন দুর্ব্বল নিশ্চেষ্ট জীবের পারের ভেলাস্বরূপ শ্রীনাম আশ্রয়ে জীবের কোন ভাবনাই থাকে না। শ্রীভগবানেরও যেমন অপার করুণা, তাঁহার নামেরও তেমনি অসীম ক্ষমতা, তাই শ্রীভগবান বলিতেছেন "আমার ভক্ত যেথানে আমার নামকীর্ত্তন করে সেই খানেই আমার নিত্য অধিষ্ঠান।" ভগবন্নামানুরাগীভক্ত ভগবানের বড় প্রিয়বস্তু; ভগবান তাঁহাকে বড়ই ভালবাসেন, একমুহূর্ত্তও ভক্তকে ছাড়িয়া থাকিতে ভগবান বড় ব্যথা পান। ভক্ত যেথানে যে অবস্থাতেই থাকুক সেও যেমন ভগবানকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না ভগবানও সেইরূপ ভক্তের বাসনানুরূপ যেভাবেই রাখুক তাহাতেই তাঁহার প্রীতি। ভক্ত যে সংসারে আসিয়া পরিবার-বর্গের ভরণপোষণ জন্য এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতে করিতে একবারও "জয়শ্রীহরি" বলিয়া ডাকিয়া থাকেন, ভক্তমুখে এইটুকু শুনিয়াই আনন্দময় ভগবান বিশেষ আনন্দিত হন। তাই দয়াময় ভক্ত ছাড়া থাকিতে ভালবাসেন না বা পারেন না। আমরা নামনিষ্ঠ ভক্ত সধনা সম্বন্ধে যতটুকু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহাই এথানে বলিয়া পাঠকগণের নিকট বিদায় লইব।

ভক্ত সধনা কসাই বংশজাত, মাংস বিক্রয়ই তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়। যদিও কসাইবংশে সধনার জন্ম তথাপি তিনি স্বভাবতই ভগবন্নিষ্ঠ ও দয়া-প্রবন ছিলেন, তাই তিনি নিজহস্তে হিংসা করিতে পারিতেন না, অন্য স্বজাতীয় দোকানদারের নিকট হইতে মাংস কিনিয়া আনিয়া পথের ধারে বসিয়া বিক্রয় করিতেন অবশ্য ইহাতে তাঁহার বেশী লাভ হইত না বটে, কিন্তু তথাপি তিনি নিজ হস্তে হিংসা করিতে পারিতেন না। দিবানিশি হরি-গুণগান করিতেন এবং সাধুসজ্জন দেখিলেই তাঁহার সেবা লইবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিতেন।

একদিন দৈবক্রমে কোনও এক বৈষ্ণব সেই পথদিয়া যাইতে ছিলেন সধনার মুখে হরিনাম শুনিয়া নিকটে আসিলেন, এবং দেখিলেন সধনার বাটুকারার সহিত একখণ্ড প্রস্তর রহিয়াছে। কিন্তু ঐ প্রস্তর খণ্ডটী যে কি তাহা সধনা জানে না। তবে তাহার এইমাত্র ধারণা ছিল যে ঐ প্রস্তরখানি সামান্য প্রস্তর নয়, কারণ তুলাদণ্ডের একদিকে ঐ প্রস্তরখানি দিয়া অন্য দিকে যাহা দিতেন তাহাতেই "পাষাণ" ঠিক হইত। যাহা হউক বৈষ্ণব ঐ প্রস্তরখণ্ড দেখিবামাত্র চিনিয়াছিলেন ও বিগ্রহ-সেবানুরাগী-ভক্ত শালগ্রামশীলা এই অবস্থায় রহিয়াছেন দেখিয়া বড়ই ব্যথিত হইলেন। ইতঃস্তত করিয়া শেষে রাস্তা হইতে একখণ্ড

প্রস্তর লইয়া উহার বিনিময়ে সধনার নিকট তাহার প্রস্তরটী (শালগ্রাম) চাহিলেন। বৈষ্ণবের বিনয়নম্র বচনে সধনা লজ্জিত হইয়া করজোড়ে বলিলেন—"ঠাকুর! আমার এখানিও প্রস্তর খণ্ড আপনার ওখানিও প্রস্তর খণ্ড দুইখানি যখন একই বস্তু তখন আর বিনিময়ের আবশ্যক কি? বিশেষতঃ আমার এই পাথরখানি বিশেষ উপকারে আইসে, এই বলিয়া সধনা তাহার প্রস্তরখণ্ডের গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

সধনার কথা শুনিয়া বৈষ্ণবের প্রাণ আরও ব্যাকুল হইল—শ্রীবিগ্রহ সেবার জন্য তাঁহার প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে তিনি পুনরায় সধনার নিকট ঐ প্রস্তর-খণ্ড ভিক্ষা চাহিলেন। সধনা আর কি করেন বৈষ্ণবের প্রীতির জন্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও উহা তাঁহাকে দিয়া দিলেন।

প্রার্থিত বস্তু প্রাপ্ত হইলে কার না আনন্দ হয়। বৈষ্ণবও আনন্দের সহিত ঐ শালগ্রামশীলা বাটীতে লইয়া গেলেন এবং নানা উপচারে যথাবিধি অভিষেক করিয়া যথারীতি সেবা করিতে লাগিলেন। অনন্ত-লীলা-বিলাসী শ্রীভগবানের লীলা সাধারণ জীবের বুঝিবার সাধ্য কোথায়? আজ ভগবান বৈষ্ণবের বাটীতে তুলসী চন্দন চর্চ্চিত হইয়া নানা উপচারে সেবা পাইয়াও সধনাকে ভুলিতে পারিলেন না, তাহার সেই সরল ব্যবহার ও অকপট হৃদয়ের হরিগুণানুবাদ তাঁহার প্রাণ আকর্ষণ করিতেছে। লীলারূপী নারায়ণ বৈষ্ণবকে স্বপ্নযোগে বলিলেন—"আমাকে সধনার কাছে রাখিয়া আইস। তাহার গান শুনিতে আমি বড় ভালবাসি।" বৈষ্ণব ক্রমে তিনদিন একই ভাবের আদেশ স্বপ্নে পাইয়া অগত্যা তাহাই করিলেন। প্রাতে উঠিয়া শালগ্রাম লইয়া সধনার সেই দোকানে গেলেন এবং তাঁহাকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া বলিলেন—"তুমিই ধন্য, আমি তোমাকে বঞ্চনা করিয়া এই প্রস্তর লইয়া গিয়াছিলাম ইহা সামান্য প্রস্তর নয় ইনি শালগ্রামশীলারূপী নারায়ণ। ইনি তোমার প্রতি বড়ই প্রসন্ন, তোমার মুখে হরিগুণগান শুনিবার জন্য পুনরায় তোমার নিকট আসিয়াছেন, তুমি বড়ই ভাগ্যবান, তোমার ঠাকুর তোমাকে দিলাম তুমিই সেবা পূজা কর।" এই বলিয়া বৈষ্ণব প্রস্থান করিলে এই সমস্ত কথা চিন্তা করিয়া সধনার প্রাণ চঞ্চল হইল সেই দিবস হইতে সধনা এই কুৎসিৎ ব্যবসা ত্যাগ করিয়া নারায়ণকে লইয়া অতি নিভৃত স্থানে বাস করিতে লাগিলেন এবং ভিক্ষা করিয়া নারায়ণের সেবাপূজায় প্রাণ মন নিয়োগ করিলেন।

এইভাবে কিছুদিন যায়, ক্রমে একদিন সধনার প্রাণে কেমন সাধ হইল

সে নীলাচলে যাইয়া শ্রীজগন্নাথদেব দর্শন করিবে। যে গ্রামে সধনা সেবা লইয়া ছিলেন সেই গ্রামবাসী অনেক লোক সেই সময় নীলাচলে যাইতেছিল—সধনাকে যদিও গ্রামবাসী ঘৃণা করিয়া স্পর্শ করিত না কিন্তু ভিক্ষার জন্য উপস্থিত হইলে সকলেই যথাসাধ্য কিছু কিছু দিত, সধনাও তাহাদ্বারা শালগ্রামের ভোগ লাগাইয়া নিজে প্রসাদ পাইত। যাহা হউক গ্রামবাসীগণ যখন নীলাচলে যাইবার জন্য বাহির হইল ভক্ত সধনার তখন আর ধৈর্য্য রহিল না সে দু'চার জন গ্রামবাসীকে মুখ ফুটিয়া বলিয়া ফেলিল যে, "আমাকে তোমরা সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবে? আমার শ্রীজগন্নাথ দর্শনের বড়ই সাধ হইয়াছে।" গ্রামবাসী সকলে তো আর সমান নয়? সধনার কথা শুনিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া দুই এক জন উত্তর করিল "তুই জগন্নাথ দেখ্‌বি কি ক'রে? তুই যে জাতিতে চামার, মন্দিরে প্রবেশের তো তোর অধিকার নাই? তারপর, আমরাই বা তোকে সেখানে নিয়ে যাব কেন? আমাদেরও কি পরকাল নষ্ট করবি?" এই ভাবে কেউ বা জবাব দিয়া কেউ বা বিকট হাস্য করিয়া সধনাকে খুব একটা ঘৃণ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করাইয়া চলিয়া গেল। সধনা যদিও প্রাণে দুঃখ পাইলেন কিন্তু পরক্ষণেই নিজের স্বরূপ চিন্তা করিয়া—"আমি ঘোর অপরাধী আমার ভগবদ্দর্শন হইবে কেন?" এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিলেন। গ্রামবাসী যখন বহুদূর চলিয়া গেল সধনা তখন ভিক্ষায় বাহির হইলেন।

লীলাময় শ্রীভগবানের কি অপূর্ব্ব লীলা, চক্রপাণির কি চক্র। তিনি নিজে দয়া করিয়া না জানাইলে অন্য জনে জানিবে কেমনে। অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মায়ার প্রলোভনে পড়িয়া কত ভাবে যে জীব ছুটিতেছে তাহার সীমা নাই। কিন্তু সাধারণ জীবের সহিত ভগবদ্ভক্তের তুলনা হয় না। হয় তো প্রাকৃত চক্ষে ভক্তের ব্যবহার এবং সাধারণ লোকের ব্যবহার একরূপ বলিয়াই মনে হয় কিন্তু যত প্রকার পরীক্ষাই আসুক না কেন ভক্ত কিছুতেই ভীত হয় না। বরং পরীক্ষা আসিলে ভক্ত আরও দৃঢ়তার সহিত ভগবচ্চরণ স্মরণ করিয়া থাকে। ভক্ত কখনও মায়ার মোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হয় না। শ্রীভগবান নিজ মুখে বলিয়াছেন—

"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।" গীতা ৭।১৪

যদি ভক্তের ভয়ই নাই তবে আর তাহাকে পরীক্ষা কেন? ভক্তের কাছে মায়া আসে কেন? উত্তরে এই বলা যায় যে, মায়া জানে যে ভক্তের নিকট তাহার সকল চেষ্টাই বিফল হইবে তবুও যে সে আসে তাহার কারণ ভগবানেরই মায়া

ভগবান কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ভগবদ্ভক্তের মহিমা বাড়াইবার জন্যই ব্যগ্র হইয়া ছুটিয়া আইসে। মায়ামুগ্ধ জীব! ভক্ত তোমার শ্রেণীর নহেন। ভক্তকে সামান্য মানুষ বলিয়া মনে করিও না। তুমি সামান্য মায়ার ছায়া দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাও, কিন্তু ভক্ত অসামান্য রূপরাশি প্রত্যক্ষ করিয়াও গ্রাহ্য করেনা। যেন এই সুন্দর সত্যবাণী ঘোষণা করিবার জন্যই ভক্তের নিকট মায়া আসিয়া উপস্থিত হয়। আমরা যে ভক্ত সধনার বিষয় বলিতে ছিলাম সেই ভক্তের গৌরব বাড়াইবার জন্য আজ ভগবান এক কঠিন পরীক্ষায় সধনাকে ফেলিবার উদ্যোগ করিলেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে গ্রামবাসী অন্যান্য সকল লোক শ্রীনীলাচলনাথ দর্শনে বাহির হইয়া গেলে সধনা ভিক্ষায় বাহির হইলেন। ক্রমে গ্রামে প্রবেশ করিয়া ভক্ত সধনা নিকটস্থ কোনও এক গৃহস্থের বাড়ীতে গিয়া ভিক্ষা চাহিলেন, এই-খানে বলিয়া রাখা উচিত যে, সধনা জাতিতে কসাই হইলেও আকুমার ব্রহ্মচারী ছিলেন এবং তাঁহার চেহারাও অতিশয় সুন্দর ছিল। যাহা হউক সধনা ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে একটী যুবতী বাহিরে আসিয়া সধনাকে যথোচিত সমাদর পূর্ব্বক ভিতরে আসিয়া ভিক্ষা লইতে বলিল। সরল হৃদয় ভক্ত সধনা কপটতা জানেনা কাজেই যুবতীর কথায় বিশ্বাস করিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। যুবতী তাঁহাকে একটী ঘরের মধ্যে বসাইয়া নানা প্রকার ভাবভঙ্গী প্রকাশ করিয়া তাহার চিত্ত আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল কিন্তু সধনার কোন প্রকার বাহ্য দৃষ্টি নাই সে নিরন্তর ভগবানের নাম জপ করিতেছে। যুবতী অনেক চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিল না দেখিয়া আর চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া পাপিয়সী নির্লজ্জ ভাবে আপনার কু অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া বসিল। তথাপি সধনার মন টলিল না। কেনই বা টলিবে? যিনি একবার ভগবৎ সঙ্গ-সুখ অনুভব করিয়াছেন, নাম সুধা পানে যাঁর চিত্ত একবার মাতোয়ারা হইয়াছে তুচ্ছ বিষয় সুখ, সামান্য ইন্দ্রিয় তর্পণ তাহার চিত্ত আকর্ষণ করিবে কিরূপে? সধনা কাষ্ঠপুত্তলিকার মত স্থির—নিশ্চল।

ভক্ত সধনা ঐ ভাবে বসিয়া আছেন কিন্তু দুর্জ্জয় রিপুর তাড়নে রমণী হিতা-হিত জ্ঞান একেবারে হারাইয়াছে, সামান্য ইন্দ্রিয় লালসা পরিতৃপ্তির জন্য আজ আপনার সর্ব্বনাশ করিতে আপনি প্রস্তুত। ক্ষণিক ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার জন্য মুগ্ধা রমণী নিজের সুখ শান্তি তো চিরদিনের তরে বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছেই, সেই সঙ্গে ভক্তেরও যথাসর্ব্বস্ব খাইবার জন্য দেবী আজ রাক্ষসীর ভাব ধারণ

করিয়াছে। পাপিষ্ঠা যতই চঞ্চল হইতেছে ভক্ত সধনা ততই যেন দৃঢ় ভাব ধারণ করিতেছে। কিছুতেই যখন ভক্তের মন চঞ্চল করিতে পারিতেছে না তখন সে আরও চঞ্চল ভাবে বলিল—"কি ভাবিতেছ? আমি প্রকৃতই তোমার হইলাম। এই ঘর বাড়ী যাহা কিছু দেখিতেছ এ সমস্তই আমি তোমাকে দিলাম তুমি আমাকে তোমার বলিয়া স্বীকার কর।" আশ্চর্য্য—তবুও সধনার চৈতন্য নাই যেমন অচল অটল ভাবে সে বসিয়াছিল সেই ভাবেই অবনত মস্তকে বসিয়া আছে।

এবার আর পাপিষ্ঠা রমণী স্থির থাকিতে পারিল না, সে দৌড়াইয়া ঘরের বাহিরে গেল এবং গৃহান্তরে নিদ্রিত স্বামীর মস্তক কাটিয়া আনিয়া সধনার নিকট ফেলিয়া দিয়া বলিল "এই দেখ তোমার শঙ্কা দূর করিয়াছি তোমার সহিত আমার মিলনের যে অন্তরায় ছিল তাহা সমূলে বিনাশ করিয়াছি এইবার তুমি আমাকে গ্রহণ কর।" এইবার সধনা মাথা তুলিয়া পাপিষ্ঠার দিকে চাহিলেন কিন্তু সে দৃষ্টিতে পাপ প্রবৃত্তি অনুমোদনের ভাব মোটেই নাই, দেখিয়া রমণী ভয় পাইল।

রমণী দেখিল সধনার দেহ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে ও তাহার দুই চক্ষু দিয়া অবিরল ধারা বহিতেছে। যখন দেখিল এত করিয়াও সধনার মন পাইল না তখন মায়াবিনী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া বলিতে লাগিল—

"এই দুষ্ট আমার নিকট ভিক্ষারছলে আসিয়া দুরভিপ্রায়ে আমার স্বামিকে মারিয়া ফেলিয়াছে।"

তখন প্রতিবেশিগণ ছুটিয়া আসিয়া রমণীর নিকট ঐ কথাই শুনিল এবং সধনার সম্মুখে রমণীর পতির ছিন্ন মস্তকও দেখিতে পাইল। কাজেই সাধারণ ভাবে সকলে সধনাকেই অপরাধী জ্ঞানে রাজদ্বারে প্রেরণ করিল। সধনার কিন্তু কোন রূপ চাঞ্চল্য ভাব লক্ষিত হইল না। আজ দুষ্টের কুচক্রে পড়িয়া যে তাহার কি দশা হইবে তাহা আদৌ ভাবনা করিতেছেন না। পূর্ব্ববৎ প্রফুল্ল চিত্তে নাম গ্রহণই করিতেছেন।

মায়াবিনী রমণী কাতরভাবে মায়াকান্না কাঁদিয়া সকলদোষ সধনার উপর চাপাইয়া বিচারকের নিকট সুবিচার প্রার্থনা করিল। এদিকে বিচারপতি বিচারাসনে বসিয়া সধনার দিকে চাহিয়া দেখিলেন আসামীর এমন সৌম্যমূর্ত্তি তিনি পূর্ব্বে আর কখনও দেখেন নাই, তাঁহার মনে কেমন সন্দেহ হইল। ভাবিলেন, এমন শান্ত-শিষ্ট সৌম্যমূর্ত্তি সাধুপুরুষ কখনও কি মানুষ খুন করিতে পারে? কিন্তু কি করিবেন, যখন তাঁহার নিকট বিচার প্রার্থী হইয়া উভয়পক্ষই

উপস্থিত তখন বিচারে যাহাহয় তাহা তিনি করিতে বাধ্য। তথাপি তিনি সধনাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ব্যাপার কি? ভক্তের হৃদয় সর্ব্বদাই দয়ায় পরিপূর্ণ, ভক্ত নিজে অশেষ ক্লেশ পাইলেও অন্যকে তাহার অংশীদার করিতে চায় না। রমণীর দুর্দ্দশার কথা ভাবিয়া সধনার হৃদয় গলিয়া গেল। মুগ্ধা মোহ-বশে পতির সর্ব্বনাশ করিয়াছে আবার এখনই নিজের জীবন পর্য্যন্ত নষ্ট হইবে—ভক্ত তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না তিনি স্বীয়প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াও অন্যের প্রাণ রক্ষা করিবেন এই সংকল্প করিলেন সধনা বিচারপতিকে বলিলেন—"হাঁ আমিই উহার স্বামীর হত্যার কারণ।" বিচারপতি তথাপি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না; কিন্তু কি করিবেন,আসামী নিজে যখন দোষ স্বীকার করিয়াছে তখন তাহার দণ্ড না দিলে দোষ হয় কাজেই বিচারপতি নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহাকেই দোষী বলিয়া শূলে দিবার আদেশ প্রদান করিলেন। জানিনা ভগবানের একি খেলা, চক্রপাণির এ কি চক্র, ভগবৎ সেবাপরায়ণ একনিষ্ঠ সাধক আজ বিনা অপরাধে শূলে যাইবার আদেশ পাইল।

বিচারালয় হইতে সমস্তলোক চলিয়া গেল সধনাকে আগামীকল্য শূলে চড়ান হইবে বলিয়া স্থির হইল। সাধারণতঃ দেখিতে গেলে অর্থাৎ এই স্থানেই এ-আখ্যায়িকার পরিসমাপ্তি করিলে বলিতে হইবে—পাপেরই জয় হইল। কিন্তু তাহাতো নয়?

পাপিষ্ঠা রমণী বিচারালয় হইতে বাহির হইয়া অসহ্য যন্ত্রনা ভোগকরিতে লাগিল। যেন কি এক ভীষণ অন্ধকারময় জগৎ তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল, সে যন্ত্রনায় অস্থির হইয়া বাড়ীতে যাইয়া সকলকে প্রকৃতকথা বলিয়া দিল, এবং বলিল যে, "আমিনিজেই আমার স্বামীকে বধ করিয়াছি" ক্রমে এইসংবাদ বিচারপতির কাণে উঠিলে সধনার শূল দিবার আদেশ রদ করিয়া সেই রমণীকেই শূলে দিবার আদেশ হইল। এবং ভক্ত সধনাকে নানাপ্রকারে প্রসন্ন করিয়া বিদায় দেওয়া হইল। পরিণামে ধর্ম্মেরই জয় হইল। ভক্তও ভগবানের নাম-মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়া নীলাচলনাথ দর্শনার্থে নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ভক্ত সধনার আনন্দের সীমা নাই—প্রাণ খুলিয়া শ্রীহরির গুণগান করিতে করিতে নাচিয়া নাচিয়া চলিয়াছেন। ক্রমে কিছুদিনে যখন কটকে আসিয়া উপস্থিত, তখন দেখেন কয়েক জন শ্রীজগন্নাথের সেবক পাণ্ডা পথে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। ভক্ত সধনা সেবকগণকে দেখিয়া আনন্দে হরিবোল হরিবোল

বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন সেবকগণ সধনাকে আলিঙ্গন করিয়া শ্রীজগন্নাথের আদেশ জানাইলেন—তাঁহারা বলিলেন—আমাদের উপর আদেশ হইয়াছে যে আপনাকে লইয়া গিয়া প্রভুর সম্মুখে হাজির করিতে হইবে, না করিলে প্রভু আর আমাদিগের সেবা গ্রহণ করিবেন না। ভক্ত সধনা সেবকগণের মুখে প্রভুর আদেশ শ্রবণ করিয়া প্রেমে বিহ্বল হইয়া ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন ক্রমে বেলা অবসান দেখিয়া পাণ্ডাগণ তাহাকে পাল্কীতে করিয়া লইয়া গেলেন এবং শ্রীজগন্নাথের সম্মুখে উপস্থিত করাইয়া দিলেন। সধনা সেথানে যাইয়া বহুদিনের সঞ্চিত সাধ মিটাইয়া প্রভুর শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন করিয়া পরমানন্দ পাইলেন। এদিকে সধনার গ্রামবাসীগণ যাহারা সধনাকে কত নিন্দা করিয়াছিল তাহারা সধনার প্রেম বিহ্বলভাব এবং পাণ্ডাগণের ব্যবস্থা অবলোকন করিয়া আনন্দে অধীর হইলেন। ভক্ত সধনা প্রাণ ভরিয়া প্রাণবল্লভ জগন্নাথকে দেখিতে লাগিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে হরিবোল হরিবোল বলিয়া উঠিলেন। তথন সমস্ত মন্দির মুখরিত করিয়া প্রতিধ্বনি উঠিল হরিবোল' হরিবোল।

শ্রী——

প্রভুর অপ্রকট

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীক্ষেত্রের "টোটা গোপীনাথ" অতি সুন্দর ও বিখ্যাত শ্রীবিগ্রহ। যাঁহার নিমিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গের একটী নাম "গদাধরের প্রাণনাথ" সেই শ্রীগদাধর প্রভু এই স্থানে অবস্থান করিতেন এবং এই ঠাকুর তাঁহারই শ্রীহস্ত সেবিত। ঠাকুরকে বাগানের মধ্যে পাওয়া গিয়াছিল, তাই নাম টোটা গোপীনাথ, কথিত আছে মহাপ্রভু এই গোপীনাথের দেহে বিলীন হইয়াছিলেন। আর তদবধি চিহ্ন স্বরূপ ঠাকুরের জানুদেশে একটী সোণার দাগ পড়িয়াছে। এবং সেবাইতগণ আজ পর্য্যন্ত দুঃখ করিয়া বলিয়া থাকেন,—

"কি করিব কোথা যাব বাক্য নাহি সরে।
হারাইলাম গোরাচাঁদ গোপীনাথের ঘরে॥"

এখানে গৌর গদাধরের মূর্ত্তি পূজিত হইয়া থাকে, কিন্তু শ্রীগৌর যে কোথায় কিরূপে বিলীন হইয়া ছিলেন তাহা কেহই নিশ্চিতরূপে বলিতে পারেন না।

মহাপ্রভুর তিরোভাবে ভক্তগণের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল তাহা আমি প্রিয় পাঠকবর্গকে শ্রীল শিশির কুমার ঘোষের মাধুর্য্য পূর্ণ রচনা "শ্রীপ্রবোধানন্দ ও শ্রীগোপাল ভট্ট" গ্রন্থ হইতে এ স্থানে উপহার দিতে ইচ্ছা করি।—

"শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে সকলেই প্রভূত ভক্তি করিতেন। যাঁহাকে শ্রীভগবান বলিয়া জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাঁহাকে ভক্তির ক্রটি কেন হইবে? কিন্তু শ্রীবৃন্দাবন-বাসী প্রায় সকলেই তাঁহার পার্ষদ। সকলেই তাঁহার পূর্ণচন্দ্র অপেক্ষাও মনোহর "প্রণয়াকুল" শ্রীবদন দর্শন করিয়াছেন। সকলেই তাহাতে এত আকৃষ্ট ছিলেন যে, পুত্রের প্রতিও এত আকৃষ্ট কেহই হইতে পারে না। শ্রীগৌরাঙ্গ অপ্রকট হইয়াছেন, ইহাতে যে শুধু ভুবন অন্ধকার হইল তাহা নয়, শ্রীবৃন্দাবনবাসীগণ শতপুত্র শোকাপেক্ষাও নিদারুণ প্রভু-বিরহ জনিত বজ্র কর্ত্তৃক আহত হইয়া, হাহাকার করিতে লাগিলেন।

"তখন দেখা গেল যে সেই সাধুগণ—যাঁহারা এক এক জন ভুবন পবিত্র করিতে ক্ষমতা ধারণ করেন—আমাদের ন্যায় জীব বই নয়। তাঁহারা "প্রাণ যায়" "প্রাণ যায়" বলিয়া ধুলায় লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। কেহ ক্ষিপ্তবৎ উচ্চৈঃ-স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। কেহ মূর্চ্ছিত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে হৃদয়ে দর্শন করিতে লাগিলেন।

তখন শ্রীপ্রভু জনা জনার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, তিনি আছেন, আর যিনি তাঁহাকে দর্শন করিতে নিতান্ত ব্যাকুল হয়েন, তিনি তাঁহাকে ধ্যানে দর্শন করিতে পারিবেন। তিনি বলিলেন যে, তিনি বৃন্দাবনে আসিবেন বলিয়াছিলেন, তাই অপ্রকট ছলনা করিয়া বৃন্দাবনে আসিয়াছেন। "শ্রীবৃন্দাবন বাসীরা বলেন যে, প্রভু এখন নিভৃতে শ্রীবৃন্দাবনে আছেন।"

শ্রীক্ষেত্রবাসীরা বলেন যে, প্রভুর এক অংশ শ্রীজগন্নাথ দেবের শরীরে, আর এক অংশ সেখানকার গদাধরের গোপীনাথের শরীরে আছেন।

"বৈষ্ণব সন্ন্যাসীরা বলেন যে, সন্ন্যাসীবেশে প্রভু এখনও বিচরণ করিতেছেন, তবে তাঁহাকে দর্শন পাওয়া অতি দুর্ঘট, বিস্তর সাধনা ব্যতীত হয় না।

"কর্ত্তাভজাগণ বলেন যে, প্রভু অপ্রকট ছল করিয়া, পায়ে খড়ম ও গাত্রে ছেঁড়া কন্থা দিয়া অতি গোপনে শ্রীক্ষেত্র ত্যাগ করেন। কেন? তিনি দেখি-

লেন, সংসার ত্যাগ করিয়া সকলে হরিনাম লইতে পারিল না, তাই সংসার রাখিয়া ধর্ম্ম শিখাইবার নিমিত্ত এই লীলা করিলেন।

শ্রীনবদ্বীপ বাসীরা বলেন যে, তাঁহাদের নদীয়ায়—

"অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গোরারায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দে'খবারে পায়॥"

যাহারা অতিশয় জ্ঞানী, তাঁহারা বলেন যে, প্রভু সকলের হৃদ্‌পদ্মাসনে বাস করেন।

* * * * *

শ্রীগৌরাঙ্গের অপ্রকটে বৈষ্ণব ধর্ম্ম পিতৃহীন হইলেন। তাঁহার পার্ষদ বক্রেশ্বর, তাহার পরে বক্রেশ্বরের শিষ্য গোপালগুরু শ্রীক্ষেত্রে শ্রীগৌরাঙ্গের গদি পাইলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রভুর সঙ্গোপনে শ্রীক্ষেত্র একেবারে প্রায় ভক্ত-শূন্য হইল। শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র অস্তে গমন করিলে, দেশ অন্ধকার হইল। যাহারা তাঁহাকে দেখিতে পাইতেন ও তাঁহাকে দর্শন করিয়া জীবন ধারণ করিতেন, তাঁহারা সেই গৌরশূন্য স্থানে তিষ্ঠিতে পারিলেন না। তাঁহারা শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিলেন। কেহ তখনি প্রাণত্যাগ করিলেন। রহিলেন কে ? না, যাঁহারা অতি বৃদ্ধ, চলৎশক্তি রহিত, কিম্বা যাঁহারা শ্রীক্ষেত্রে কোন সেবা লইয়াছেন।"

প্রভুর মায়াশরীর পৃথিবীতে ছিল না এবং তাঁহার দেবদেহে বিলীন হওয়ার সম্বন্ধে আমাদের কোন অবিশ্বাস নাই বা থাকিতে পারে না। এই ধরণের একটী ঘটনা চরিতামৃতে বর্ণিত আছে—প্রভু গম্ভীরা গৃহে থাকেন এবং রাত্রেও অর্দ্ধ রাত্র পর্য্যন্ত স্বরূপ রামরায় প্রভৃতি মর্ম্মী ভক্তগণের সহিত কৃষ্ণকথা আলা-পন করেন, পরে ভক্তগণ প্রভুকে শয়ন করাইয়া আপন আপন গৃহে যান। গোবিন্দ কিন্তু গম্ভীরা গৃহের দ্বারদেশে শয়ন করিয়া থাকেন, একদিন এইরূপ নিশি দ্বিপ্রহরে প্রভুকে শয়ন করাইয়া স্বরূপ ও রামরায় আপন কুটীরে গিয়াছেন তখন—

"গম্ভীরার দ্বারে গোবিন্দ করিল শয়ন।
সবরাত্রি প্রভু করে উচ্চ সংকীর্ত্তন॥
আচম্বিতে শুনে প্রভু কৃষ্ণ বেণুগান।
ভাবাবেশে প্রভু তাহা করিলা পয়ান॥

তিন দ্বারে কপাট দৈছে আছত লাগিয়া।
ভবাবেশে প্রভু গেলা বাহির হইয়া॥
সিংহ দ্বারের দক্ষিণে রহে তেলেঙ্গা গাবীগণ।
তাহা যাই পড়িলা প্রভু হৈয়া অচেতন॥"

গম্ভীরা গৃহের তিনটী দ্বারই রুদ্ধ ছিল এবং দ্বারে গোবিন্দ নামক প্রভুর একজন ভৃত্য শয়ন করিয়াছিল। এই গম্ভীরা গৃহ আমরা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া আসিয়াছি। তাহার চতুর্দ্দিক উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। এইরূপ অবস্থায় প্রভু সে সমস্ত ভাবাবেশে অতিক্রম করিয়া শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বারের দক্ষিণে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া রহিলেন। এখন বুঝুন ভাবাবেশ হইলে প্রভু কিরূপ অসম্ভবও সম্ভব করিয়া তুলিতেন। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী সেই রাত্রে তাঁহাকে অন্বেষণ কারিগণের মধ্যে একজন ছিলেন। এবং পরে স্বরচিত গৌরাঙ্গস্তব কল্পবৃক্ষ নামক গ্রন্থে ইহা এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

অনুদ্‌ঘাট্য দ্বারত্রয়মুরু চ ভিত্তিত্রয়মহো।
বিলঙ্ঘ্যোচ্চৈঃ কালিঙ্গিকসুরভিমধ্যে নিপতিতঃ॥
তনূদ্যৎসঙ্কোচাৎ কমঠ ইব কৃষ্ণোরুবিরহাৎ।
বিরাজন্ গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্ মাং মদয়তি॥"

সুতরাং তাঁহার পক্ষে দেবদেহে বিলীন হওয়া বা মহাকাশে অন্তর্হিত হইয়া যাওয়া কিছুই অসম্ভব নহে। তবে তিনি কোথায় কি ভাবে অন্তর্হিত হইলেন ঠিকভাবে তাহা কেহই বলিতে পারেন না, বা তেমন করিয়া বলিবার মত কোন বিশিষ্ট প্রমাণ প্রাচীন গ্রন্থ সমূহেও আমরা পাই নাই। আমার বেশ স্মরণ আছে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎমন্দির হইতে ৺ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় তাঁহার জীবদ্দশায় সংবাদপত্র সমূহে এ সম্বন্ধে একবার প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন কিন্তু গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সমাজ হইতে তাহার কোন উত্তর হইয়াছিল কি না অবগত নহি। গোস্বামী প্রভুগণ যদ্যপি এ সম্বন্ধে প্রকৃত বিবরণ জ্ঞাত থাকেন এবং অনুগ্রহ পূর্ব্বক যদি তাহা এ অধমকে জ্ঞাত করান তাহা হইলে আমরা তাঁহাদিগের নিকট চির কৃতজ্ঞ এবং ঋণী থাকিব।

বৈষ্ণব-দাসানুদাস

শ্রীভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা

বল্লভাচারী সম্প্রদায়

শ্রীরামানুজসম্প্রদায়, মধ্বাচারী সম্প্রদায় ও বল্লভাচারী সম্প্রদায় এই তিন প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে তৃতীয় সম্প্রদায়ের নাম রুদ্র সম্প্রদায়। বল্লভাচার্য্য এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক, এই জন্য ইহার নাম বল্লভাচারী সম্প্রদায়।

ভাষ্যকার বিষ্ণুস্বামী এই মতের প্রচার করেন বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি কিন্তু সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কাহাকেও শিষ্য করিতেন না। তাঁহার শিষ্য জ্ঞানদেব, জ্ঞানদেবের শিষ্য নামদেব ও ত্রিলোচন। এই ত্রিলোচনের পর লক্ষ্মণভট্টের পুত্র বল্লভাচার্য্যকে গুরুর পদে অভিষিক্ত করা হয়। ইনি তৈলঙ্গ দেশীয় ব্রাহ্মণ। শকাব্দের পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে ইনি এই মত প্রচার করিতে আরম্ভ করেন।

রামসীতার উপাসনা ভারতবর্ষের নানা স্থানে প্রবর্ত্তিত ও প্রচারিত থাকিলেও ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের ধনী ও ভোগবিলাসী গৃহস্থ ব্যক্তিরা রাধাকৃষ্ণের উপাসক ছিলেন। আচার্য্য প্রবর্ত্তিত বালগোপালের সেবা তাঁহার সময় হইতেই প্রচারিত হইয়াছে। প্রথমে তিনি যমুনা নদীর বামতীরবর্ত্তী মথুরার প্রায় তিনক্রোশ পূর্ব্বে গোকুল গ্রামে বাস করিতেন। এই গোকুলের গোস্বামীরাই বল্লভাচার্য্যকে ধর্ম্মোপদেশ দেন। বল্লভাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত বালগোপালের সেবাই এখন সর্ব্বলোকের প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। গোস্বামীরা এই ধর্ম্মের উপদেশ দেন বলিয়া ইহা গোস্বামীদের ধর্ম্ম বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

ভক্তমালে লিখিত আছে, আচার্য্য ভারতবর্ষের দক্ষিণ খণ্ডে বিজয় নগরের রাজা কৃষ্ণদেবের সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া সেখানকার স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণদিগকে বিচারে পরাস্ত করেন এবং তত্রত্য বৈষ্ণবগণের আচার্য্যের পদে অভিষিক্ত হন। তথা হইতে উজ্জয়িনী নগরীতে গমন করিয়া শিপ্রা-তটে এক অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে তিনি অবস্থিতি করেন। ঐ স্থান এখনও তাঁহার বৈঠক বলিয়া প্রসিদ্ধ। মথুরার ঘাটেও তাঁহার আর একটি বৈঠক বিদ্যমান। চুনারের একক্রোশ পূর্ব্বদিকেও একটি 'মঠ ও মন্দির' রহিয়াছে। ঐ মঠের প্রাঙ্গণে একটী কূপও আছে, ঐ কূপকে আচার্য্য কুঁয়া বলে। তথায় তিনি কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন করিলে পর, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অচলাভক্তি ও ধর্ম্মানুরাগ দেখিলেন— তিনি শরীরের কোনও ক্লেশই ক্লেশ বলিয়া মনে করেন না, ইহা দেখিয়া

পালন পরিতুষ্ট হইলেন, শ্রীকৃষ্ণ তখন অপূর্ব্ব মূর্ত্তিতে তাঁহাকে দেখা দিয়া বালগোপালের সেবা প্রচার করিতে আদেশ করিলেন। তিনিও আদেশ পালন করিলেন। এই সম্প্রদায়ের বহু ভক্তই বালগোপালের আরাধনা করেন।

বল্লভাচার্য্যের মতে পরমেশ্বরের উপাসনায় উপবাসের আবশ্যকতা নাই। অন্নবস্ত্রের ক্লেশ স্বীকারেরও আবশ্যকতা নাই, কঠোর তপস্যায় বনবাসেও আবশ্যকতা নাই। উত্তম বসন ভূষণে সজ্জিত হও, সুস্বাদু অন্নব্যঞ্জনাদি ভোজন কর, সংসারে সুখে স্বচ্ছন্দে কালযাপন কর, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের সেবা কর। গৃহস্থের পক্ষে এই মত প্রায় সর্ব্বত্রই আছে। এই মতের সার বুঝিলে গৃহস্থাশ্রমীরও ভগবানের সেবায় শ্রেষ্ঠ অধিকারী না হইবার কারণ নাই। এসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা অতিমাত্র বিষয়ী ও ভোগ-বিলাসী বলিয়া প্রসিদ্ধ। গোস্বামী প্রভুরাও বিষয়ী লোক। ব্যবসা বাণিজ্যও তাঁহারা করিয়া থাকেন। সেবকগণও বহুমূল্য দ্রব্যাদি প্রদান করে। এজন্য এসম্প্রদায়ের গুরুগণ প্রায়ই ভোগবিলাসী হন, তবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরুগণ উত্তম উত্তম দ্রব্য ভোগ করিয়াও সংযমী ও পরম ভক্ত ছিলেন। শিষ্যদিগের প্রতি গোস্বামীদের এতই প্রভুত্ব যে শিষ্যেরা গুরুকে তনু, ধন, মন, তিনই সমর্পণ করিবে এরূপ বিধি আছে।

দেবতাদের সেবা সম্বন্ধে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত ইহাদের বড় একটা প্রভেদ নাই। ইহাদের মন্দিরে গোপাল, রাধাকৃষ্ণ এবং কৃষ্ণাবতার সম্বন্ধীয় অন্যান্য মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে। মূর্ত্তি ধাতুনির্ম্মিত। প্রতিদিন শ্রীকৃষ্ণের আটবার সেবা হয়। সেবার নাম। ১। মঙ্গলারতি; ২। শৃঙ্গার, ৩। গোয়ালা; ৪। রাজভোগ; ৫। উত্থাপন; ৬। ভোগ; ৭। সন্ধ্যা; ৮। শয়ন।

নিত্যসেবা ভিন্ন কতকগুলি সাংবৎসরিক মহোৎসব আছে। সেগুলির নাম— রাসযাত্রা, জন্মাষ্টমী, রথযাত্রা প্রভৃতি। রথযাত্রার আমোদ বাঙ্গালা ও উড়িষ্যাতেই বেশী, পশ্চিমাঞ্চলেও স্থানে স্থানে এই উৎসব প্রচলিত আছে।

কাশীধামে ও পশ্চিমদেশের অন্যান্য অনেক স্থলে জন্মাষ্টমী ও রাসযাত্রায় যথেষ্ট আমোদ হয়। বাঙ্গালা দেশেও এই উৎসবে বেশ ধুম হইয়াছে।

গ্রামসমূহে সন্নিহিত কোনও চত্বরে সমারোহ পূর্ব্বক রাসযাত্রার উৎসব হয়। নানাবিধ বিচিত্র বসনভূষণে সজ্জিত হইয়া রাসভূমিতে সমাগত হয়, নৃত্য, গীত, বাদ্যের অনুষ্ঠান করিয়া শ্যামসুন্দরের লীলার অভিনয় হয়। গায়ক,

বাদক, নর্ত্তক নিজ নিজ গুণের পরিচয় দেয়। স্থানে স্থানে বস্ত্রগৃহ, তৃণগৃহ, পণ্যশালা প্রস্তুত হয়, মধ্যে মধ্যে দোলনা ও দোলনায় ঝুলিয়া লোকে আমোদ করে। বৃন্দাবনেও চান্দ্র আশ্বিন মাসে দশমী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত উৎসব হয়।

বল্লভাচার্য্য শ্রীভাগবতের একখানি টীকা করেন। তা' ছাড়া বেদব্যাস-প্রণীত কতকগুলি ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য প্রস্তুত করেন এবং সিদ্ধান্তরহস্য, ভাগবত-লীলারহস্য, একান্তরহস্য ইত্যাদি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থও রচনা করেন। এগুলি এক্ষণে দুষ্পাপ্য গ্রন্থ।

বিষ্ণুপদ; এই গ্রন্থ বল্লভাচার্য্যকৃত বলিয়া বিখ্যাত। বিষ্ণুর গুণব্যাখ্যা ইহাতে আছে। ব্রজবিলাস, ব্রজবাসী দাস অনতিক্ষুদ্র গ্রন্থখানি লেখেন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলার কথা আছে।

অষ্টচ্ছাপ; আচার্য্যের আটজন প্রধান শিষ্যের কথা আছে।

বার্ত্তা; আচার্য্যের মতাবলম্বী সকল বর্ণের ৮৪ জন ভক্ত কথা স্ত্রী পুরুষের ইহাতে আছে।

একটী রাজপুত নারীর কথা পাঠে জানা যায় যে, ইহাদের মধ্যে সহমরণের প্রথা ছিল না।

বল্লভাচার্য্যের পুত্র বিট্‌ঠলনাথ পিতার পদে অভিষিক্ত হন। বিট্‌ঠলনাথের সাত পুত্র। ইঁহারা সকলেই ধর্ম্মোপদেশক ছিলেন।

নানাস্থানের বিশেষতঃ গুজরাট ও মালোয়া দেশের বহু সুবর্ণ বণিক্ এবং ব্যবসায়ী ও ধনী লোক আচার্য্যের মতাবলম্বী। ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানে বিশেষতঃ মথুরা ও বৃন্দাবনে ইহাদের বিস্তর মঠ ও দেবালয় আছে। কাশীতে এ সম্প্রদায়ের দুইটী প্রসিদ্ধ মন্দির আছে; ইহাদের নাম শ্যামজীর মন্দির ও পুরুষোত্তমজীর মন্দির।* এই দুই মন্দিরের বিগ্রহ অতি বিখ্যাত ও বহু-বিষয়াপন্ন। জগন্নাথ ক্ষেত্র ও দ্বারকা এসম্প্রদায়ের অতি পবিত্র তীর্থ। আজমীরের মধ্যে শ্রীনাথ দ্বারের মঠ, সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ ও মহিমান্বিত। বল্লভাচারীদিগের অন্ততঃ একবারও শ্রীনাথ দর্শন করিতে হয় এবং প্রধান গোস্বামীর সন্নিধানে তদ্বিষয়ের প্রমাণ পত্র গ্রহণ করিয়া মঠের সাহায্যের জন্য যথাসম্ভব কিছু কিছু দান করিতে হয়।

---

* কাশীর গোলদারেরা প্রত্যেক হুণ্ডিতে একপয়সা করিয়া দেবালয়ে দেয়। গুজরাট ও মালোয়ার ব্যবসায়ীরা প্রতি বস্ত্র বিক্রয়ে দুপয়সা করিয়া দেয়।

বল্লভাচার্য্য ১৪৭১ খৃষ্টাব্দে বারাণসীর নিকটবর্ত্তী চম্পারণ্য নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার জন্ম সম্বন্ধে অদ্ভুত কাহিনী আছে। আচার্য্যের পিতা লক্ষ্মণভট্ট বিজানগরাধিপতির পুরোহিত সুশর্ম্মার কন্যা ইলম্মাগারুর সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন। ইঁহার প্রথম পুত্রের নাম রামকৃষ্ণ, দ্বিতীয় রামচন্দ্র, রামচন্দ্রের জন্মের সময় তিনি মনে মনে দুঃখিত হন, কিন্তু মনোভাব গোপন করিয়া পিতার নিকট হইতে আদেশ লইয়া তীর্থযাত্রা করেন। তীর্থযাত্রা করিয়া জনার্দ্দনক্ষেত্রে বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের মহাত্মা প্রেমাকরকে সেবা করিতে আরম্ভ করেন। অনেকদিন পর্য্যন্ত পুত্রের কোনও সংবাদ না পাইয়া পিতা পুত্রের জন্য কাতর হইয়া পড়িলেন। পিতা তীর্থযাত্রায় বাহির হইয়া পুত্রকে প্রেমাকর ঋষির নিকট দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হন। ঋষি বলিলেন যে আমি ধ্যানে অবগত হইয়াছি স্বয়ং পুরুষোত্তম ইহার ধর্ম্মপত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন ও ভক্তিমার্গ পুনঃস্থাপন করিবেন। তুমি ইহাকে ঘরে ফিরাইয়া লইয়া যাও। ঋষির আদেশ শুনিয়া বল্লভভট্ট বাড়ী যাইতে অস্বীকার করিয়া বলিলেন, আমি আপনার কাছে থাকিয়াই আপনার সেবা করিব। লক্ষ্মণভট্টের আত্মীয়-স্বজনও কেহ কেহ আসিয়াছিলেন, লক্ষ্মণভট্টের সঙ্গে এক ঋষিকে বল্লভভট্ট ফিরাইয়া ছিলেন, এবং নিজে পর্ণকুটীর বাঁধিয়া ঋষির সেবা করিতে আরম্ভ করিলেন।

লক্ষ্মণভট্ট বাড়ী আসিয়া ৫টী সোমযজ্ঞ করেন। যজ্ঞকর্ত্তা শঙ্কর দীক্ষিত সেবারে প্রয়াগ কুম্ভমেলায় যাইতে তাঁকে অনুরোধ করেন। লক্ষ্মণভট্ট শঙ্কর দীক্ষিতকে সঙ্গে লইয়া সস্ত্রীক প্রয়াগ যাত্রা করেন, পরে প্রয়াগ হইতে কাশীতে আসিয়া কিছুকাল বাস করেন, তথায় লক্ষ্মণভট্টের স্ত্রী ইলম্মাগারুর গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পায়, ইতিমধ্যে কাশীতে দণ্ডী ও ম্লেচ্ছজাতির সহিত বিবাদ আরম্ভ হয়। বিবাদ ঘোরতর হইলে কাশী হইতে দলে দলে সকলে পলায়ন করিতে আরম্ভ করে। লক্ষ্মণভট্টও সস্ত্রীক তথন পলায়ন করে। ইহারা যথন চৈম্পারণ্যে প্রবেশ করেন তখন ইলম্মাদাকজির অষ্টম মাসের গর্ভ ছিল, পথচলার জন্য ইহার প্রসববেদনা উপস্থিত হয়, এবং এক শিমুল গাছের তলায় বসিয়া পড়েন। তিনি সেস্থানে একটি পুত্র প্রসব করেন। জরায়ু আচ্ছাদিত ছিল বলিয়া মৃত সন্তান মনে করিয়া পুত্রকে নিজবস্ত্রে আবৃত করেন ও গাছের কোটরে পাতা দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়া প্রস্থান করেন, এবং স্বামীকে সকল বলিয়া নিকটবর্ত্তী গ্রামে বিশ্রাম করেন। কাশীতে যথন শান্তি স্থাপিত হয়, তথন লক্ষ্মণভট্ট আবার সস্ত্রীক কাশী যাত্রা করেন, যাইবার সময় চৈম্পারণ্যের

সেই গাছের কোটরে আগুন দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। ইলম্মাদারুজি ইহার কারণ জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া গাছের নিকটে গিয়া দেখিলেন, একটী বালক আঙ্গুল চুষিতেছে। বালককে দেখিয়া তার অত্যন্ত স্নেহের উদয় হয় ও স্তন হইতে দুগ্ধধারা স্রাবিত হয়, তখন তিনি ইহাকে নিজপুত্র জানিয়া গ্রহণ করিয়া মুখচুম্বন করিলেন ও পুত্রকে স্বামীর কোলে দিলেন।

কথিত আছে, বল্লভাচার্য্য মাসের মধ্যেই চতুর্ব্বেদ ও ষট্‌শাস্ত্রে দক্ষতা লাভ করেন, পরে এগার বছর বয়সে দক্ষিণ যাত্রা করেন। সে সময়ে বিদ্যা-নগরে স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণবের ঝগড়া চলিতেছিল, বল্লভপ্রভু সেখানে উপস্থিত হইয়া আমার কাছে সব শুনিয়া ২৮ দিন প্রতিবাদ করিয়া ব্রহ্মবাদ স্থাপন করেন।

মাতুলালয়েই আচার্য্য বিল্বমঙ্গলের সঙ্গে তাঁহার দেখা হয়। বিল্বমঙ্গল তাঁহাকে বলেন যে, বিষ্ণু স্বামীর সাতশত আচার্য্যের চক্রবর্ত্তী আচার্য্য রাজবিষ্ণুস্বামী আমাকে নিত্য গদী দেওয়ার সময় বলিয়াছিলেন, বল্লভাচার্য্য ভগবৎ অবতার হইবেন; বল্লভাচার্য্য বিল্বমঙ্গলের নিকট সম্প্রদায়ী উপদেশ ও দীক্ষা গ্রহণ করিলে বিল্বমঙ্গল অন্তর্ধান করেন। পর দিবস বল্লভাচার্য্য বিদ্যানগর হইতে প্রস্থান করিয়া পৃথিবী পরিভ্রমণে বহির্গত হন ও আঠার বৎসরের মধ্যে তিনবার পৃথিবী পরিভ্রমণ করেন। সেই সময় বঙ্গদেশে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব হয়। পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে, শ্রীবৃন্দাবন গোবর্দ্ধনে ও প্রয়াগের নিকটবর্ত্তী অড়েম গ্রামে উভয়ের মিলন হয়, পরস্পর মিলনে উভয়েই বিশেষরূপে আনন্দ লাভ করিলেন। এমন সময়েই দুই জনে অলৌকিক চরিত্রে সকলকে মুগ্ধ করিয়া রাধাকৃষ্ণ প্রেমে জগৎ প্লাবিত করেন।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

গঙ্গাস্নান-মাহাত্ম্য

গঙ্গা অতি পবিত্র তীর্থ, ইহা আমাদের দেশে সর্ব্বত্র প্রচার আছে। হিন্দুরা প্রায় সকলেই জানেন যে "সর্ব্বতীর্থময়ী গঙ্গা" অর্থাৎ গঙ্গাই সর্ব্বতীর্থের স্বরূপ। হিন্দুদিগের মুখে গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া এই শ্লোকটী সর্ব্বদাই শুনা গিয়া থাকে,—

"গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রূয়াৎ যোজনানাং শতৈরপি।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥"

গঙ্গায় স্নান করা দূরে থাকুক, শত যোজন অন্তরে থাকিয়াও যিনি 'গঙ্গা গঙ্গা' এই নাম উচ্চারণ করেন, তিনিও সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করেন।

শাস্ত্র বাক্যে বিশ্বাস থাকিলে এই একটী প্রচলিত ফলশ্রুতিতেই গঙ্গা স্নানের মাহাত্ম্য যথেষ্ট প্রকাশ হইয়াছে। গঙ্গা গঙ্গা উচ্চারণ করিয়া যখন বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি পর্য্যন্ত হয়, তখন আর সুফলের কোন অভাব থাকে কি? তবে সেই ফলের ক্ষেত্র বিশেষে তারতম্য হইয়া থাকে কিনা তাহাই পর্য্যালোচনা করা এই প্রবন্ধটীর উদ্দেশ্য।

গঙ্গাস্নান সকল জাতিতেই করেন। কেহ ভাবেন যে, তদ্দ্বারা তাহাদের বাহ্যান্তর পবিত্র হইবে এবং পরলোকে সদ্‌গতি হইবে আবার কেহ ভাবেন যে উহা একটী ভ্রমাত্মক সংস্কার মাত্র; স্রোতের জলে স্নান করায় যতটুকু উপকার হয়, ততটুকু উপকার ভিন্ন বেশী উপকারের কোন সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে ঐ সংস্কারটীর ফলাফল কি তাহাই দেখা যাউক।

পাপ করিলেই তাহার ফল অবশ্য ভুগিতে হইবে, আমরা যত কিছু করিনা কেন, একবার পাপ করিলে তাহার আর নিস্তার নাই, তাহার ফল ভুগিতেই হইবে।

যাহারা এই বিষয় বাস্তবিক ভাবেন এবং তদনুসারে পাপ হইতে নিবৃত্ত থাকিতে পারেন, তাঁহারা অতি পবিত্র ও মহান্। কিন্তু যাঁহারা অনেক কার্য্য গর্হিত জানিয়াও মোহবশতঃ আবার সেই কার্য্যে লিপ্ত হন, তাঁহাদের পক্ষে ঐরূপ বিশ্বাস ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ রোধ করে। পাপ করিয়া ফেলিয়াছি তাহাতে অন্যথা করিতে পারিব না, এই হতাশায় পাপানুতপ্ত জীবের বিবেকবুদ্ধি হারাইয়া যায়, সে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া মৃতের ন্যায় হয়। সেই স্থলে যদি কেহ সহজ উপায় বলিয়া দিয়া তাহাকে আশ্বস্ত করে, তখন সেই জীব আশার সঞ্চারে পুনর্জীবিতের ন্যায় হয় এবং সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে তাহার চেষ্টা আইসে। পাপ করিয়া মুক্তি নাই ইহাও একটী যেমন সংস্কার, আবার পাপ করিলে গঙ্গাস্নানে মুক্তি হয় ইহাও একটী সংস্কার। স্থান বিশেষে দুইটীরই সমান প্রয়োজন। যখন মারি ভয় উপস্থিত হয় তখন প্রথমতঃ ব্যারামটী যাহাতে না জন্মায় সেইরূপ ঔষধাদির ব্যবস্থা করা উচিত, কিন্তু তৎসত্বেও ব্যারাম জন্মাইলে তাহারও প্রতিবিধান করা আবশ্যক। হিন্দুশাস্ত্র মতে

পাপ সকল মানব দেহেতেই আছে। তাহা না থাকিলে দেহ ধারণ হইত না। পাপ হিন্দুদিগের পক্ষে একটী মহামারি এবং গঙ্গাস্নান তাহার একমাত্র সর্ব্ব সুলভ মহা মহৌষধ।

কিসে গঙ্গাস্নানে যে পাপ নাশ হয় তাহার অন্য কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি দেখাইতে না পারিলেও, অন্ধ বিশ্বাসেও যে অনেক সময় সুচারু ফল ফলে তাহা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিবেন।

এস্থলে যিনি গঙ্গায় স্নান করিয়া তাহাতে প্রবাহিত জলে স্নান করা হইল, এইরূপ ভাবেন, তিনি তাহার ফলে দেহ সুস্থ হইবে ইহা ভিন্ন অন্য কোন ফল আশা করেন না এবং তাহার মনেও উদয় হয় নাই। কিন্তু যিনি ঐ জল বিষ্ণু-পাদ নিঃসৃত বলিয়া বুঝিয়া শাস্ত্রোক্ত বিশ্বাসে তাহাতে স্নান করেন, তাহার দেহের আরোগ্য শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির সহিত তুল্যই হয়, অধিকন্তু শ্রদ্ধান্বিত ব্যক্তি পাপক্ষয় রূপ একটী পরম আনন্দ উপভোগ করেন, যাহা শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির ভাগ্যে কোন ক্রমে ঘটিতে পাবে না। আনন্দ ও মানসিক সুখ যদি পরম পুরুষার্থ অর্থাৎ সকলেরই প্রার্থনীয় হয়, তাহা হইলে যদি ভ্রম বিশ্বাসেও অধিক সুখ ও আনন্দ পাওয়া যায় তাহাও কদাচ ত্যাগ করা উচিত নহে।

আমরা যে কোন কার্য্য করি তাহা কোনও না কোনও একটী বিশ্বাস বা ধারণার উপর নির্ভর পূর্ব্বকই করিয়া থাকি। যাঁহার প্রেত যানির অস্তিত্বে বিশ্বাস, তিনি অন্ধকারে ভূতের ভয়ে সশঙ্কিত, যাহার ঐ অস্তিত্বে অবিশ্বাস, তিনি ভূতের ভয় হইতে মুক্ত। মাংস ভক্ষণ করিলে শরীর সবল হয় আর কিছুতেই সেরূপ হইতে পারে না, ঐ বিশ্বাস হইলে আমি জীব হিংসা যে কোন গতিকে হউক, ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিব এবং অকাতরে মাংস ভক্ষণ করিব। কিন্তু যদি আমার বিশ্বাস হয় যে, দুগ্ধ মাংস অপেক্ষা বল কারক এবং মাংস ভক্ষণে যে সকল ভাবী অনিষ্টের আশঙ্কা আছে, তাহা দুগ্ধ পানে নাই, তখন সেই বিশ্বাসে আমি মাংস ভক্ষণ ত্যাগ করিব এবং দুগ্ধ পানে রত হইব। এইরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বিশ্বাসই আমাদের সুখ দুঃখের কারণ, এবং বন্ধন মোচন আমাদের বিশ্বাসেই হয়, তাহার আর কোন সন্দেহই থাকে না। এই সত্যটী ভগবদ্বাক্যেও সমর্থিত হইয়াছে—"যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ।"

গীতা—

অর্থাৎ জীবের যেরূপ ভক্তি ও বিশ্বাস তাহার সত্তাও ঠিক তদনুরূপ। যদি গঙ্গাজল পবিত্র মনে কর, তবে তাহার কণামাত্র তৃণাগ্র দ্বারা স্পর্শ করিলেই শৌচ

লাভ করিবে। যদি তাহা না ভাব, তবে গঙ্গা স্রোতে অবগাহন করিয়াও মনের কোন শৌচ আসিবে না। ভগবান যে বলিয়াছেন—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।" গীতা ৪।১১

অর্থাৎ যে যেরূপ ভাবে আমার শরণাগত হয় আমি সেইরূপ ভাবেই তাহার ভজনা করি ও কামনা পূর্ণ করি। এই সত্যটী যে কেবল ভগবান সম্বন্ধে ঘটে তাহা নহে, ইহা নিরপেক্ষ নিত্য সত্য। ইহার প্রয়োগ কার্য্যে সর্ব্বত্র প্রতি নিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছি, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহা কখন ভাবি নাই।

গঙ্গাস্নানের ফলশ্রুতি বিশ্বাসীর পক্ষে যে ফল তাহা বিশ্বাস মূলক বটে, এবং পূর্ব্বে যাহা বলা হইল তাহা ঠিক হইলে ধর্ম্ম জগতের ফল বিশ্বাস ছাড়া কোথাও নাই। খৃষ্ট ধর্ম্মেরও ত ইহা প্রধান ভিত্তি। মহাপুরুষ যীশু খৃষ্টের দেহ ধারণে ও দেহ ত্যাগে অন্য জীবের মুক্তি কেবল শ্রদ্ধামূলক। তদ্ভিন্ন তাহাতে অন্য যুক্তি খাটে না।

এখন দেখা যাউক গঙ্গাস্নানের যে ফল তন্ত্র মন্ত্রাদিতে নিহিত হইয়াছে তাহা ভ্রম কি বাস্তবিক যুক্তি সিদ্ধ।

ম: কাণ্ডে আসিলে গঙ্গার ধ্যানই তাঁহার প্রধান মন্ত্র। ধ্যানের উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহার পূজাকালেই মন্ত্রের অর্থানুরূপ তাঁহার মনন করিতে হইবে। স্নান-কালেও এইরূপ মনন করিয়া স্নান করা কর্ত্তব্য। ভগবতীকে স্নান করান যেমন পূজার অঙ্গ, আমাদেরও সেইরূপ সেই ভগবতী ভাগীরথীতে স্নান করাতেই তাঁহার পূজা ও উপাসনা করা হয় এবং পূজা করিবার অধিকার জন্মে। শাস্ত্রে গঙ্গার ধ্যান এই ভাবে কীর্ত্তন করা হইয়াছে, যথা—

"ধ্যেয়া গঙ্গা শ্বেতরূপা ত্রিনেত্রা বরদা শিবা।
অভয়া পদ্মহস্তা চ পীয়ূষ ঘটপাণিকা॥
চতুর্ভুজা দিব্যরূপা বসন্তী মকরে শুচৌ।
নানালঙ্কার ভূষাঢ্যা স্ফুরৎ স্মেরমুখাম্বুজা॥
ভ্রাজমানা দশদিশো দীপয়ন্তী মহাপ্রভা।
জ্বলৎ কনক হেমাভা বাসো যুগপিধায়িনী॥
কলিকল্মষ সংহন্ত্রী পাতু পর্ব্বত কন্যকা॥

অর্থাৎ গঙ্গাদেবী শ্বেতবর্ণা ও ত্রিনেত্রা, তিনি শিবা ও মঙ্গলময়ী তাঁহার স্বভাব ঐরূপ বলিয়া আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ ফল প্রদান করিয়া থাকেন। আমরা মোহান্ধ

হইয়া অন্য নশ্বর ফল কামনা করিলেও তিনি শ্রেষ্ঠ মোক্ষফল দিতে চাহেন। তাঁহার শরণ লইলে ভবভয় সমস্ত দূর হয়। তিনি নারায়ণের শক্তি বলিয়া নারায়ণের পদ্ম তাঁহার হস্তে শোভা করিতেছে। আর এক হস্তে ভক্তের জন্য অমৃত পূর্ণ ঘট বহন করিতেছেন তিনি চারি হাতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ তাহার ভক্ত সেবকের জন্য বহন করিতেছেন।

তাঁহার এই যে সকল রূপ বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা দিব্যরূপ অর্থাৎ তিনি ইচ্ছাময়ী, নিরাকারা হইলেও ইচ্ছাক্রমে এই সকল রূপ ধারণ করেন। শুচি মকর তাহার বাহন। সংসারের স্রোত এবং জলের স্রোত উভয়ই নিম্ন দিকে টানিয়া লইয়া যাওয়া। মৎস্যের ধর্ম্ম ঐ স্রোতের বিপরিত দিকে অর্থাৎ উজানে লইয়া যাওয়া। সাধককেও মকরবাহিনী গঙ্গার আশ্রয়ে সুবিশুদ্ধ হইয়া ঐ মকরের ন্যায় সংসারের স্রোত অতিক্রম করিয়া গঙ্গার উদ্ভব স্থল বিষ্ণুর পরমপদের দিকে (ঊর্দ্ধ দিকে) যাইতে চেষ্টা করিতে হইবে। গঙ্গা পূজা করিতে হইলে ভক্তের হৃদয়ই পূজা দেবীর বসিবার স্থান, সেই ভক্তের মন শুচি হইলেই বিষ্ণু-ভক্তি-প্রদায়িনী গঙ্গাদেবী তদুপরি আসন পরিগ্রহ করেন।

ক্রমশঃ—

প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনা

(শ্রীশ্রীকৃষ্ণরাসলীলা)

ভাগবতাচার্য্য শ্রীযুক্ত নীলকান্ত গোস্বামী মহোদয় কর্ত্তৃক অনুদিত, ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত এবং ১৮ নং অদ্বৈতচরণ মল্লিকলেন হইতে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সাধু কর্ত্তৃক প্রকাশিত মূল্য ২৲ দুই টাকা। ইতিপূর্ব্বে আমরা গোস্বামী প্রভুর প্রণীত শ্রীকৃষ্ণ-লীলামৃত গ্রন্থখানি পাইয়া ছিলাম উহার সমালোচনার সময়ই আমরা গোস্বামী প্রভুর কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছিলাম, তিনিও শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে বলিয়াছিলেন যে "বর্ত্তমান গ্রন্থে ভগবানের রাসলীলা পর্য্যন্তই বিবৃত হইল, তাহাও সংক্ষেপে লিখিয়াছি; যদি সজ্জনগণের সানুরাগ অভিপ্রায় বুঝিতে পারি এবং আমার পরমায়ু থাকে তবে এই গ্রন্থ আবার বিস্তার পূর্ব্বক পরিবর্দ্ধিত করিয়া অন্যান্য লীলার সহিত প্রকাশ করিব।" গোস্বামী প্রভুর সেই কথা যথার্থ ই ফলিয়াছে তবে পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি মত অন্যান্য লীলার সহিত বিস্তার পূর্ব্বক লিখিত না হইয়া কেবল মাত্র রাস লীলাই বিস্তৃত ভাবে প্রকাশ করিয়া-

ছেন। গ্রন্থ খানিতে মূলশ্লোক, শ্লোকের অন্বয়, শ্রীধরস্বামীর টীকা, শ্লোকের অবিকল বঙ্গানুবাদ এবং পরিশেষে বঙ্গভাষায় শ্লোকের বিস্তৃত তাৎপর্য্য ব্যাখা দেওয়া হইয়াছে। বলাবাহুল্য অন্বয়াংশে প্রত্যেক পদেরই প্রতিবাক্য দেওয়া আছে এবং তাৎপর্য্যাংশে রাসলীলার অতি পবিত্র ভাবেরই ব্যাখ্যা হইয়াছে।

আমরা শুনিয়াছি বহুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা "বিশ্ব বৈষ্ণব-সভা" নামক একটী হরিসভা ছিল এবং গোস্বামী প্রভু উক্ত সভায় আচার্য্য পদে ব্রতী হইয়া শ্রীভগবানের লীলা ব্যাখ্যা করিতেন আর সেই সুসিদ্ধান্ত পূর্ণ ব্যাখ্যা শুনিয়া নাকি অনেক পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী নব্য যুবকের দলও নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া শ্রীকৃষ্ণলীলা-রসামৃত-সমুদ্রে ডুবিয়া ছিলেন। বর্ত্তমান গ্রন্থের যিনি প্রকাশক তিনিও ঐ দলের একজন।

যাহা হউক সেই সময় হইতেই অনেকে গোস্বামী প্রভুকে শ্রীকৃষ্ণলীলার ব্যাখ্যা বিশেষতঃ যে সকল লীলাগুলিকে আপাততঃ অশ্লীল বলিয়া সাধারণতঃ মনে হয় তাহার প্রকৃত ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিয়া মুদ্রন জন্য ধরিয়াছিলেন কিন্তু কি জানি কেন এতদিন তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। এক্ষণে শ্রীভগবানেরই ইচ্ছায় উহা প্রকাশিত হইয়াছে। এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণ লীলার ব্যাখ্যা আমরা আজ পর্য্যন্ত কোথাও শুনি নাই, আর শুনিতে পাইব বলিয়াও আশা হয় না। একেতো নিগম কল্পতরুর গলিত ফল শ্রীমদ্ভাগবত, তাহা আবার শুকদেব গোস্বামী পাদের অধরামৃত পুষ্ট হইয়া প্রকাশ হইয়াছে, তাহার উপর আবার গোস্বামী পাদ যে ভাবে সুযুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত দ্বারা সরল অথচ মধুর ভাবে বিবৃত করিয়াছেন তাহাতে যে গ্রন্থ খানি কত মধুর হইয়াছে তাহা আমরা সামান্য ভাষায় প্রকাশ করিতে অক্ষম। পাঠ করিয়া মনে হয় প্রভু শ্রীভাগবতামৃত রসে একেবারে আপনাকে ডুবাইয়া রাখিয়াছেন। কোনখানটী রাখিয়া কোনখানটী বলিব ভাবিয়াই পাই না। আমরা পাঠকগণকে এই শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা গ্রন্থ খানি একবার পাঠ করিতে বিশেষ অনুরোধ করি।

শ্রীভগবান গোপীগণের প্রেম পরীক্ষারছলে যে সকল কথা বলিয়া গোপীগণকে গৃহে ফিরিয়া যাইবার জন্য বলিয়াছিলেন সে সকল কথা আপাততঃ শ্রুতিমাত্র দারুণ অপ্রিয় হইলেও মেঘান্তরিত পূর্ণচন্দ্রের অনতি স্পষ্ট আলোকের ন্যায় যেন তাহার অন্তরে অন্তরে আশ্বাসময় পরিহাসের অস্পষ্ট আভাস প্রকাশ পাইয়াছে ইহার ব্যাখা করিতে যাইয়া গোস্বামী প্রভু এক স্থানে বলিয়াছেন—

"চিৎ ও জড়ে মিলিত হইয়া এই অখিল জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, অতএব

জগতের কিয়দংশ চিৎ ও কিয়দংশ জড়। চিজ্জড়াত্মক অখিলব্যাপী চিতের সহিত ব্যক্তি গত চিতের এবং অখিল গত জড়ের সহিত ব্যক্তিগত জড়ের নিত্য সংযোগ আছেই আছে। যেমন অনন্ত বিসারিত আকাশের কিয়দংশ প্রাচীর বেষ্টিত হইলেই সেই প্রাচীরান্তর্গত আকাশই গৃহনামে অভিহিত হয়। অবনীতলে উত্তম, মধ্যম ও অধম প্রভৃতি যত প্রকার ও যত-সংখ্যক গৃহ আছে, সকল গৃহেরই প্রাচীরে প্রাচীরে পরস্পর সংযোগ না থাকিলেও জড় স্বরূপে সংযোগ আছে এবং প্রাচীরান্তর্গত সকল আকাশের সহিত পরস্পর সংযোগ আছেই। সেইরূপ নিখিল-ব্যাপী অনন্ত চৈতন্যর কিয়দংশ ভূতময় দেহ বেষ্টিত হইলেই ঐ দেহান্তর্গত চৈতন্যই "জীব" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এক দেহরূপ ব্যক্তি বিশেষের সম্বন্ধ না থাকিলেও জড় স্বরূপে সকলের সহিত সকলেরই সংযোগ আছে এবং সকল দেহেরই অন্তর্গত চৈতন্যের সহিত পরস্পর সংযোগ আছেই আছে। সেই জন্যই একজনের দুঃখে অপরের দুঃখ হয়, এবং একজনের আনন্দে অপরের আনন্দ হয়, একজনকে রোদন করিতে দেখিলে, অপরের অশ্রুপাত হয় এবং একজনকে হাস্য করিতে দেখিলে, অপরের হাস্য আসিয়াই থাকে। অনেকের অন্যের দুঃখে দুঃখ এবং অন্যের আনন্দে আনন্দ দেখিতে পাওয়া যায় না ইহাও সত্য। যাহাদের পশ্বাদির ন্যায় দেহাভিমানের আবরণ অত্যন্ত ঘনীভূত, তাহাদের চিতে চিতে সংযোগও সমাচ্ছন্ন। যেমন অনন্ত আকাশের কিয়দংশ সূক্ষ্ম বস্ত্রাবৃত হইলে, তাহার সহিত বাহিরাকাশের এবং অসংখ্য গৃহাকাশের সংযোগ বুঝিতে পারা যায়; কিন্তু আকাশাংশ ইষ্টক নির্ম্মিত নিশ্ছিদ্র প্রাচীর বেষ্টিত হইলে, ঐ আকাশাংশের সহিত বহিরাকাশের বা অন্যান্য গৃহাকাশের সংযোগ অবরুদ্ধ হইয়া যায়; অথচ অন্তরে অন্তরে অদৃশ্য সংযোগ থাকে কিন্তু সংযোগের ক্রিয়া হয় না। সেইরূপ সমস্ত জীবেরই চিদংশে পরস্পর সংযোগ থাকিলেও দেহাভিমানের বিরলতা ও গাঢ়তা অনুসারে চৈতন্য সংযোগের প্রকাশ ও অপ্রকাশ হইয়া থাকে। যাহার দেহাভিমান বিরল ও সূক্ষ্ম বা পাতলা, তাহারই চৈতন্য সংযোগের ক্রিয়া হইয়া থাকে; অর্থাৎ অন্যের হৃদয়ের ভাব তাহার হৃদয়ে অভিভূত হয়, আর যাহার দেহাভিমানের আবরণ অত্যন্ত গাঢ়—অর্থাৎ দেহ ও দৈহিক পদার্থই যাহার সর্ব্বস্ব, তাহার চৈতন্য সংযোগের ক্রিয়া হয় না। অর্থাৎ অন্যের হৃদয়ের ভাব তাহার হৃদয়ে অনুভূত হয় না। সংসারে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার উপর যাহার অধিক স্নেহ, যাহার সহিত যাহার অধিক প্রণয় এবং যাহার প্রতি যাহার অধিক ভক্তি, তাহারাই

পরস্পরের সুখ দুঃখ অধিক অনুভব করে। পিতা মাতা পুত্রের, পতিব্রতা পত্নী পতির এবং সৎশিষ্য গুরুর হৃদয় বুঝিতে পারে। তাহার কারণ, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে পৃথক ভাবের আবরণ নাই; সুতরাং তাহাদের অন্তরে অন্তরে অর্থাৎ চৈতন্যে চৈতন্যে সংযোগের অন্তরায়ও ঘটে নাই। অতএব যে যাহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসে, সে যে তাহার অন্তরের কথা বুঝিতে পারে, ইহাই স্থির। প্রিয়তম ব্যক্তি যদি প্রণয় পরীক্ষার্থ পরিহাস গর্ভ পরুষ বাক্যও বলে, বাক্য পরুষ হইলেও তদন্তর্গত নিগূঢ় পরিহাস আপনা আপনিই প্রকাশ পায়। কৃষ্ণ প্রাণা গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণেই প্রাণ মন অর্পণ করিয়াছিলেন—শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ের সহিত আপন আপন হৃদয় মিশাইয়া ছিলেন; তাই প্রিয়তমের পরিহাস তাঁহাদের অবিদিত রহিল না এবং সেই জন্যই তাঁহারা রোষ ভরে গৃহে প্রতিগমন না করিয়া, উপযুক্ত উত্তর দানে প্রস্তুত হইলেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্গত ভাব বুঝিয়াও প্রকাশ্য পরুষার্থ সহ্য করিতে না পারিয়া কাঁদিয়াছিলেন। মহর্ষি বেদ-ব্যাস বেদান্ত সূত্রে বলিয়াছেন—"লোকবত্তু লীলা কৈবল্যম্" অর্থাৎ পরব্রহ্ম যে, ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহার লোকবৎ লীলা অর্থাৎ খেলা মাত্র। শাস্ত্রানুসারে যদি সৃষ্টি কার্য্য তাঁহার খেলাই হয়, তবে সুবুদ্ধি পাঠক বুঝিয়া লইবেন, জগৎ সংসারে যাহার যাহা কিছু বিপদ্, বিভীষিকা, বা কোনও প্রকার অমঙ্গল ঘটে, তাহাও সেই লীলাময়ের পরিহাস গর্ভ পরীক্ষা বা খেলা। তিনি অনুক্ষণ আনন্দের আকর্ষণ রূপ বাঁশীর গানে জীবগণকে আত্মসমীপে আহ্বান করিতেছেন—আবার নানাপ্রকার বাহ্য বিভীষিকা দেখাইয়া নিবারণ ও করিতে-ছেন,—আর হাসিতেছেন। সুদারুণ বিভীষিকার ভিতরেও তাঁহার অসীম দয়া, কুশলময় আশ্বাস এবং সুমধুর পরিহাস নিগূঢ় ভাবে রহিয়াছেই। যে ব্যক্তি তাঁহার প্রদর্শিত কৃত্রিম বাহ্য বিভীষিকা দর্শনে সাধন পথে পশ্চাৎপদ হইয়া এবং তাঁহার অন্তর্নিহিত দয়া, আশ্বাস ও পরিহাসের ভাব অবগত হইয়া, তাঁহাকে পাইবার জন্যই গোপীর ন্যায় দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান থাকে, সেইই আনন্দ-বিগ্রহের আলিঙ্গন লাভে সমর্থ হয়। এখন অবশ্যই বুঝিতে পারা যায় যে,—পরিহাসময় পরীক্ষা অনাদি কাল হইতে অনন্ত সংসারে অনুক্ষণ হইতেছে।"

এই ভাবে সুযুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা সর্ব্বত্রই গ্রন্থ মধ্যে দেখা যায় আমরা স্থানাভাব বশতঃ কয়েক ছত্র মাত্র পাঠকগণকে উপহার দিলাম রস-লোলুপ পাঠকগণ গ্রন্থ-খানি পাঠ করিলে যথার্থই আনন্দ পাইবেন।

ভক্তি

(২০শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা কার্ত্তিক মাস ১৩২৮ সাল)

"ভক্তি র্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তি র্ভক্তস্য জীবনম্॥"

পারের তরী

সেদিন তোমায় কে তরাবে ?
(যেদিন) সঞ্চিত ধনে বঞ্চিত ক'রে
শমন কিঙ্কর ল'য়ে যাবে॥
(আসি) ভীষণ বেশেতে ধরিবে কেশেতে
ভীমপ্রহরণ প্রহারিবে।
(তখন) আকুল পরাণি ফুটিবে না বাণি
দু'নয়নে ধারা বহিবে॥
(দিয়ে) হাতেতে শৃঙ্খল বলিবেরে চল
(সেদিন) ভবের খেলা সাঙ্গ হবে॥ ১॥
দেখিয়ে তুফান কাঁপিবে পরাণ
পুলিনে শাসিবে রিপুদলে।
(বলবে) যে উপায় পার হওরে ওপার
(নৈলে) ঝাঁপ দাও ঐ গভীরজলে॥
(দেখি) তরণী বিহীন হবে বুদ্ধিহীন
ডাকিলে পাবে না মানব দেবে॥২॥

গুরুপদ-পঙ্কজ নিরমল সেই রজ
সঁপরে ভকতি চিতে মাথে।
পাপ তাপ হবে ক্ষয়, দেহ হবে পুণ্য ময়
পারের তরণী যাবে সাথে ॥
থাকিবে না ভয় আর অনায়াসে হবে পার
চির আনন্দধামে যাবে ॥৩॥

শ্রীভোলানাথ সিংহ।

গঙ্গাস্নান-মাহাত্ম্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ইহার তাৎপর্য্য, লক্ষ্মীর দৃষ্টি কম হইলে যেমন গৃহস্থের শ্রী, অলঙ্কার ও গুণ সকল কম হয় আবার লক্ষ্মীর দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই যেমন সমস্ত উন্নতি হইতে থাকে, সেইরূপ গঙ্গাদেবী যখন লক্ষ্মীপতি নারায়ণের পাদপদ্ম হইতে দ্রবীভূত হইয়াছেন তখন তাঁহার অলঙ্কার ও ভূষণের কোনই অভাব থাকিতে পারেনা ; ভক্তজনও যখন ঐ ইষ্টদেবীর ভাবে ভাবিত হন তাহারও তখন আর অলঙ্কারাদি ভূষণের ইয়ত্তা থাকে না। দেবীর মুখে সদা মৃদু-মধুর হাস্য খেলা করিতেছে। শুদ্ধ কণকের ন্যায় আভা যুক্ত হওয়ায় তাহার প্রভায় দশ দিক আলো করিয়াছে এমন যে পর্ব্বত দুহিতা গঙ্গা তিনি আমাদিগের পাপ তাপ বিধৌত করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন।

বশিষ্ঠদেব যখন ভগীরথকে গঙ্গার ধ্যানটী বলিয়া দেন তখন সেই সঙ্গে ইহাও বলিয়া দিয়াছিলেন যে—

"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং ব্রহ্মাণ্ডোপরি রাজতে।
তস্মিন্ বসতি সা গঙ্গা ত্যক্ত্বা ব্রহ্মকমণ্ডলুম্ ॥"

গঙ্গার ধ্যানে গঙ্গাকে পর্ব্বত কন্যা বলা হইয়াছে, পর্ব্বত কন্যা ও পার্ব্বতী দুই শব্দেরই এক অর্থ। হিমাচল হইতে গঙ্গা নিঃসৃত হইয়াছেন বলিয়া তিনি পার্ব্বতী। কিন্তু পাছে লোকে ভাবে তৎপূর্ব্বে তাঁহার অস্তিত্ব ছিল না, তাই বশিষ্টদেব বলিলেন যে, হিমাচল গঙ্গার উৎপত্তি স্থান হওয়া দূরে থাকুক ব্রহ্মার কমণ্ডলুও তাঁহার প্রকৃত উৎপত্তি স্থান নহে। আমাদিগের চতুর্দ্দিকে অণ্ডাকার যে বিশ্ব-

সংসার দেখিতে পাই তাহার উপরে বিষ্ণুর পরমপদ এবং সেই পরমপদে ব্রহ্মার কমণ্ডলু ত্যাগ করিয়া গঙ্গাদেবী বাস করেন।

যাঁহারা আধুনিক বিজ্ঞানশাস্ত্র আলোচনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে পূর্ব্বোক্ত বশিষ্ঠদেবের বাক্যটী আপাততঃ অবৈজ্ঞানিক বলিয়া বোধ হইতে পারে,—কিন্তু কিঞ্চিৎ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে সেরূপ বোধ আর থাকেনা। বিষ্ণুশক্তি সমস্ত জগৎ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। জগৎ বলিলেই তদ্দ্বারা কিঞ্চিৎ গমনশীল, দুই নিমেষকালও একভাবে স্থায়ী নহে, এইরূপ কোন পরিবর্ত্তন-শীল বস্তু বুঝায়। বস্তুর পরিবর্ত্তন কারণসাপেক্ষ ইহা বৈজ্ঞানিক যুক্তি। নদ নদী প্রবাহিত হইতেছে; সূর্য্যের উত্তাপ তাহার কারণ। জীবের হ্রাস বৃদ্ধি হইতেছে কাল তাহার কারণ। এইরূপে জাগতিক সকল ব্যাপারেরই কারণ বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে প্রদর্শিত হয়। কিন্তু ঐ সকল কারণের কারণত্ব কে রক্ষা করেন বা কিরূপে রক্ষিত হয় জিজ্ঞাসা করিলে আধুনিক বিজ্ঞান তথায় নিরুত্তর। আর্য্য-বিজ্ঞান তখন বলেন যে, সর্ব্ব কারণের কারণ এক বিষ্ণু, তিনি সর্ব্বত্র প্রবিষ্ট হইয়া কারণগুলি যে সকল নিয়মাবলীর অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতেছে সেই সকল নিয়মের প্রবর্ত্তনা করিতেছেন ও নিয়ন্তৃভাবে তাহা সতত রক্ষা করিতেছেন। বিশ্বসংসারের অনন্ত নিয়মাবলীকে তিনি নিজ নিজ পথে ধরিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া—তাঁহার একটী নাম ধর্ম্ম [ধৃ=ধরা–মন্]। যিনি এইরূপে সকলগুলিকে ধরিয়া রাখিবেন তিনি যদি নিজে একস্থানে কি একভাবে স্থির না থাকেন তাহা হইলে কোনটী ধরিয়া রাখা যাইতে পারে না। যে স্থানে বা যেভাবে তিনিও নিশ্চল, সেইটীই তাঁহার পরমপদ। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড চলৎ স্বভাব ও স্পন্দনময়, তজ্জন্য বিষ্ণুর নিশ্চল শান্ত পদ সেই ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর রাখিতে পারে না। কাজেই ব্রহ্মাণ্ডের উপরি ভাগে বিরাজিত।

নিয়ন্তা নিজে নিয়মাধীন হইলে নিয়ম চলে না, ইহা রাজনীতির একটী স্থির সিদ্ধান্ত। এই হইতেই "রাজা কখন কোন অপরাধ করিতে পারে না।" এই সিদ্ধান্ত স্থির হইয়াছে। বিশ্বরাজ্যের অধিপতিও বিশ্বনিয়মের অধীন নহেন—একটী তাঁহার পরমপদের একটী মর্য্যাদা। বৈদিক সন্ধ্যাদিতে যে জলের উপাসনা আছে, তাহা তন্ত্রাদিতে ভিন্নাকারে পরিণত হইয়াছে। অল্প জলে রাস্তা পঙ্কিল হইয়া আমাদের শরীর ও বস্ত্রাদি মলিন করে আবার বেশী জলে বস্ত্রাদি ধৌত করিলে সেই মল দূর হয়। অল্পজল

কেবল থাঁতে থাকিলে তাহা শীঘ্রই পচিয়া উঠে, কিন্তু নদী বা সমুদ্রের জল কখনও পচে না। যে জল দ্বারা অগ্নি নির্ব্বাপিত হয় সেই জলেই বৃক্ষাদি উৎপন্ন হইয়া অগ্নি উৎপন্ন করে ও পরে কাষ্ঠাকারে দগ্ধ হইয়া অগ্নিময় হয়। জলেরদ্বারা আমাদের জীবন রক্ষা হইয়াছে এবং তদ্বারা সমস্ত প্রবৃত্তি উত্তেজিত ও ভোগশক্তি জন্মিতেছে। অতএব জলেতে সাক্ষাৎ নারায়ণী শক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহাতে সৃষ্টি স্থিতি ও লয় হয়। অবস্থা ভেদে তাঁহার পাবনী ও অপাবনী দুই শক্তিই আছে। যখন জলই আমাদের জীবনী শক্তির ও সকল ভাবের কারণ, তখন জল সাক্ষাৎ বিষ্ণুরূপে আমাদিগকে পরমভাবে শিব তমরস প্রদান করুন। এই বৈদিক প্রর্থনায় জলেতে বিষ্ণুকে সাক্ষাৎকার করিতে হয়। কিন্তু তাহা করা সহজ নহে। তজ্জন্য অমুক নদীতে অমুক দেবীর ও অঁমুক পদে অমুক দেবের আবির্ভাব কল্পনা করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর জলাশয়াদিতে আবির্ভাব উপলব্ধি করান তন্ত্রশাস্ত্রকার দিগের প্রধান উদ্দেশ্য। তীর্থ বলিয়া যে সকল নদ নদী প্রসিদ্ধ, তাহাতে ঐরূপ ভক্তি হইলে পর "আপো নারায়ণঃ স্বয়ং" অর্থাৎ সমস্ত জলই স্বয়ং নারায়ণ এই শিক্ষা হিন্দুদের অভ্যাস করিতে হয়।

এখন জলাশয় মাত্রেই পবিত্র। জলাশয়ে শৌচ প্রস্রাব ত্যাগ ও মুখ ধৌত জল পর্য্যন্ত নিক্ষেপ করা নিষেধ। এইভাবে পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বর্গলাভ হয়। ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবানকে বিশ্বময় আকারে উপলব্ধি করানই তন্ত্রের উদ্দেশ্য এবং তাহাতে যেরূপ কল্পনা হইয়াছে তাহা উপাসকগণের হিতের জন্যই হইয়াছে, তাহাও স্পষ্ট প্রকাশ আছে।

"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণোঃ রূপকল্পনা।"

যাহারা উপাসক অর্থাৎ ক্রমশঃ ব্রহ্মের দিকে অগ্রসর হইতে চাহেন তাঁহাদের হিতের জন্য অথবা সহজে ক্রমে অগ্রসর হইবার জন্য ঐ সকল রূপ কল্পনা হইয়াছে। ব্রহ্মের অনন্তরূপ; কিন্তু কেহ যদি ভাবেন যে সকল রূপগুলি একবারে দর্শন করিবেন, তাহা তাঁহার ভ্রম। অনন্ত ব্রহ্মের কথা দূরে থাকুক যদি একটি ভূমির আয়তন স্থির করিতে হয় তাহাও আমরা একবারে দেখিয়া ঠিক করিতে পারি না। প্রথমতঃ তাহার দৈর্ঘ্যের দিকে লক্ষ্য করিয়া ও পরে প্রস্থ স্থির করিয়া এই দুইটা গুণ করিয়া তবে তাহার আয়তন স্থির করিতে হয়। ভূমির দৈর্ঘ্য স্থির করিতে গিয়া প্রস্থ আছে কি না কিছুমাত্র ভাবি নাই দৈর্ঘ্যকে যেমন একটি স্বতন্ত্র দ্রব্য বলিয়া ভাবি, সেইরূপ ব্রহ্মকে জল বলিয়া এক সময়

ভাবনা করাতে তাহার জলময় রূপ কল্পনা করা হইল। এই কল্পনা কাল্পনিক উপন্যাসের কল্পনা নহে।

ইতিপূর্ব্বে গঙ্গার ধ্যানে যেরূপ কল্পনা করা হইয়াছে তাহা বিশুদ্ধ জলের ও তাহা হইতে আমরা যে সমস্ত মঙ্গল প্রাপ্ত হই তাহারই রূপক মাত্র।

ভক্ত পাঠকবৃন্দ! গঙ্গাতে যে এই সকল ভাব আছে, তাহা নিম্নের গীতা-মাহাত্ম্যে প্রকাশ। কিন্তু আমাদের ইহাও মনে রাখা উচিত যে, কোন দ্রব্যের নিজের কোন ভাব নাই, ভাবুকের কৃপায় ঐ দ্রব্য দৃষ্টে তাহার অভ্যস্ত চিন্তার অনুরূপ ঐ ভাব উদয় হয়। গীতা মাহাত্ম্যে উল্লেখ আছে—

"গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা, সত্যা পতিব্রতা।
ব্রহ্মাবলি, ব্রহ্মবিদ্যা, ত্রিসন্ধ্যা মুক্তি গেহিনী॥
অর্দ্ধমাত্রা, চিতা, নন্দা, ভবঘ্নী, ভ্রান্তিনাশিনী।
বেদত্রয়ী, পরানন্দা তত্ত্বার্থ-জ্ঞান-মঞ্জুরী॥

গীতা মাহাত্ম্য গঙ্গাই মুখবন্ধ। গীতা জ্ঞান-গঙ্গা, কেবল জ্ঞানীর স্নান তাহাতে হইতে পারে কিন্তু গঙ্গায় আপামর সকলেই স্নান করিতে পারে। গঙ্গারজল বিষ্ণুপাদপদ্ম হইতে আসিতেছে, বিষ্ণুর অঙ্গ দ্রব হইয়া ঐ জল হইয়াছে এই ভাবে স্নান করিলে শরীর তৎক্ষণাৎ স্নিগ্ধ ও সমস্ত পাপক্ষালন হইল ভাবিয়া এক পরমানন্দ উপস্থিত হয় এবং বৈকুণ্ঠের চিন্তা আইসে। গীতা পাঠ করিয়া জ্ঞান হয় যে, বিষ্ণুর মূর্ত্তি জ্ঞানেতেই জগৎ রহিয়াছে। এই জগৎ ভ্রম মাত্র। সেই জ্ঞান দিয়া তিনিই অহঙ্কার মমতা ইত্যাদি মল সমস্ত ক্ষালন করেন। তাহাতে অনন্য হইয়া আশ্রয় করিলে কোন ভয় নাই দুঃখ নাই। শ্রীহরি সুহৃদ পিতা, মাতা এই ভাবিয়া জীব এই মর্ত্তে থাকিয়াই বৈকুণ্ঠ সুখ উপভোগ করিতে থাকে।

শ্রীনরহরি ঠাকুর প্রসঙ্গে নৃসিংহ প্রসাদের প্রবন্ধের প্রতিবাদ

শ্রীগৌরাঙ্গসেবকে পূর্ব্বে "বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম", ১৩২৬ ভাদ্রে "সংশয়-ভঞ্জন" ও ১৩২৭ শ্রাবণে পুনরায় "সংশয় ভঞ্জন" প্রবন্ধে শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ গোস্বামী অনেক কথা লিখিয়াছেন। আমার মনে হয় তিনি অপরের সংশয় ভঞ্জন করিতে গিয়া

উর্ণনাভের ন্যায় নিজ জালেই নিজে আবদ্ধ হইয়াছেন। মনে করিয়াছিলাম কেহ তাঁহার এই প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিবেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, ১৩২৭ কার্ত্তিক "গৌরাঙ্গ সেবকে" শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল দাস মহাশয় ব্যতীত কেহই সে প্রয়াস করেন নাই। যাহা হউক, শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল বাবুর চেষ্টা কতদূর ফলবতী হইয়াছে, তাহা, "ভক্তি" ১৩২৭ মাঘ ফাল্গুনে শ্রীনৃসিংহপ্রসাদের "শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর" প্রবন্ধেই বুঝিতে পারিতেছি। বিদ্বেষ বুদ্ধি প্রণোদিত না হইলে বোধ হয় তাঁহার এত মতিভ্রম ঘটিত না।

শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ, শ্রীমন্নরহরির প্রতি এবং প্রেমবিলাস গ্রন্থকার শ্রীনিত্যানন্দ দাসের প্রতি কোন্ প্রয়োজনে যে এতদূর নির্ম্মম হইলেন তাহা আমাদের বুদ্ধিতে আসিতেছে না, তবে তাঁহার এযাবৎ আলোচিত প্রবন্ধগুলির যুক্তি এবং ভাষার প্রাঞ্জলতা দেখিয়া হাস্য সংবরণ করা কঠিন হইয়াছে। পুনরায় "ভক্তিতে" তাঁহাকে তাঁহার ভঙ্গিমাময়ী গবেষণা লইয়া "আসর জমকাইতে" প্রয়াসী দেখিয়া কিছু বলিবার বিশেষ প্রয়োজন বোধ করিতেছি, কারণ এই সমস্ত প্রবন্ধ উপকারের পরিবর্ত্তে সাধারণের অপকারার্থেই লিখিত হইয়াছে।

আমাদের মনে হয় শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ ব্রাহ্মণ্যাভিমানে নিতান্তই বিবেক শূন্য হইয়া পড়িয়াছেন, নতুবা "বৈদ্যজাতি" "বৈদ্যজাতি" করিয়া ও শ্রীমন্নরহরি ঠাকুর মহাশয়ের মহিমাকীর্ত্তন শুনিয়া এত ব্যাকুলচিত্ত হইতেন না।

অম্বষ্ঠজাতি ব্রাহ্মণ অপেক্ষা কোন বিষয়ে হীন নহে। বিদ্যা, বুদ্ধি জ্ঞান ও ভক্তিতে কাহারও নিকট তাঁহাদের মস্তক অবনত নহে। অনেকের গুণগরিমায় মুগ্ধ হইয়া এযাবৎ বহু ব্রাহ্মণও তাঁহাদিগের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন—বৈষ্ণবজগৎ এবিষয়ে সাক্ষীস্বরূপ দণ্ডায়মান।

শ্রীল দৈবকীনন্দন দাস তাঁহার প্রসিদ্ধ "বৈষ্ণব বন্দনায়" শ্রীল সদাশিব কবিরাজ মহাশয়ের পুত্র শ্রীপুরুষোত্তমদাস ঠাকুরের মহিমা শতমুখে বর্ণনা করিয়াছেন ; অম্বষ্ঠ কুলোদ্ভব বলিয়া নৃসিংহপ্রসাদের মত নাসিকা কুঞ্চিত করেন নাই। নৃসিংহপ্রসাদই বলিয়াছেন, "তখনকার সময় এখনকার মত ব্রাহ্মণজাতির গৌরব নষ্ট হয় নাই।"

পণ্ডিতগণ জানেন শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয় প্রভৃতি অম্বষ্ঠকুলোদ্ভব ব্রাহ্মণই। বৈদ্য বা কবিরাজ তাঁহাদের উপাধিমাত্র। দেহরোগ ও ভব রোগ উভয় রোগেরই তাঁহারা চিকিৎসক সুতরাং অবজ্ঞাচ্ছলে নৃসিংহপ্রসাদ তাঁহাদিগকে বৈদ্য বলিয়া নিজের অজ্ঞতারই পরিচয় দিয়াছেন মাত্র।

জাতিগত, বংশগত যে উচ্চাবচ্চ বিভাগ মানব সমাজে সম্মানের কেন্দ্রস্বরূপ আজিও অবস্থিত আছে, শ্রীমন্নরহরি প্রভৃতি শ্রীভগবানেরপার্ষদ সম্বন্ধে সে বিভাগ মানদণ্ডে পরিমাণ একেবারেই খাটে না। ফলতঃ শ্রীভগবান ও শ্রীভগবৎগণ সম্বন্ধে জাতিকুল বিচার করা যেমন একদিকে বৈষ্ণব শাস্ত্রে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক, তেমনি অন্যদিকে বৈষ্ণবের পক্ষে বিশেষতঃ ঠাকুর বা গোস্বামী সন্তানের পক্ষে, এইরূপ উচ্চাবচ্চ ভেদজ্ঞান মহাপরাধ মধ্যে গণ্য।

দেখিতেছি শ্রীল সেন শিবানন্দের পুত্র অম্বষ্ঠকুলোদ্ভব শ্রীকবিকর্ণপুর মহাশয়কেই নৃসিংহ বাবু তাঁহার প্রমাণদণ্ডস্বরূপ দাঁড় করাইয়াছেন। গৌরগণোদ্দেশদীপিকা তাঁহারই রচিত। উক্ত গ্রন্থে শ্রীল নরহরিকে তিনি ব্রজে রাধাপ্রাণ সখী মধুমতী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

"ব্রজাধিকারিণী যাসীদ্‌বৃন্দাদেবী তু নামতঃ।
সা শ্রীমুকুন্দদাসোহদ্য খণ্ডবাসঃ প্রভুপ্রিয়ঃ॥
পুরা মধুমতী প্রাণসখী বৃন্দাবনেস্থিতা।
অধুনা নরহর্য্যাখ্যঃ সরকারঃ প্রভো প্রিয়ঃ॥

পুরাণ——খণ্ডবাসোনবহরেঃ সাহচর্য্যান্মহত্তরৌ।
গৌরাঙ্গৈকান্তশরণৌ চিরঞ্জীব সুলোচনৌ॥

এইরূপ মহাপূজ্য শ্রীগৌরাঙ্গপার্ষদ পরম বৈষ্ণবগণের অবমাননা দুরপনেয় বৈষ্ণবাপরাধ মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে।

শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ বলিতে চাহেন, শ্রীমন্নরহরি শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নবদ্বীপলীলা একেবারেই দর্শন করেন নাই। কবি কর্ণপুর মহাশয় নরহরির বিষয় সামান্য ভাবেই বর্ণনা করিয়াছেন, ইহাই যদি এ সিদ্ধান্তের কারণ হয় তবে বলিতে বাধ্য হই, তিনি কাহার কথাই বা অধিক করিয়া বলিয়াছেন।

বৈষ্ণব-গ্রন্থে একমাত্র শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ব্যতীত অন্য কাহারও জন্ম, সন প্রভৃতি এবং জীবনের ঘটনাবলীর অধিক পরিচয় পাওয়া যায় না। সরলপ্রাণ পূজনীয় চরিতকারগণ ভক্তিতত্ত্ব লইয়াই ব্যাপৃত থাকিতেন—সামান্য খুঁটীনাটী তাঁহাদের লক্ষীভূতই হইত না; উপরন্তু, প্রধান ভক্তগণের বৃত্তান্ত বিশেষভাবে জানিতে না পারার হেতু, তাঁহারা প্রতিষ্ঠাকে ঘৃণা করিতেন, এবং নিজ নিজ বিষয় গ্রন্থকারগণকে লিপিবদ্ধ করিতেও নিষেধ করিতেন। এইজন্যই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নিষেধ আজ্ঞায় শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর কয়েকজন ছাড়া নবদ্বীপ পরিকরের অধিকাংশেরই ব্রজপরিচয় আমাদিগকে বলিতে গিয়াও বলিতে পারেন নাই।

যাহা হউক, ইহা নিশ্চয় যে, যদি শ্রীকবিকর্ণপুর মহাশয় বুঝিতেন যে এত-কাল পরে খণ্ডবাসী শ্রীমন্নরহরি সম্বন্ধে এতদূর গোলমাল হইবে তাহা হইলে অবশ্যই তিনি আরও কিছু লিখিয়া যাইতেন। পরমাশ্চর্য্য যে, প্রায় সাড়ে চারিশত বৎসরের ভিতর আর কাহারও হৃদয়ে এই দারুণ সমস্যারাজির উদয় হয় নাই।

বৈষ্ণব জগৎ জানেন শ্রীনরহরি শ্রীগৌরাঙ্গের অতি অন্তরঙ্গ ভক্ত কি না। শ্রীগৌরাঙ্গের নবদ্বীপলীলায় সহিত শ্রীল গদাধরের ন্যায় শ্রীমন্নরহরির জীবনও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রেমবিলাস, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল এবং তৎকালীন প্রতি পদকর্ত্তাই ইহা পুনঃ পুনঃ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীনরহরির নিজকৃত অসংখ্য পদও ইহার সাক্ষীরূপে দণ্ডায়মান।

দেখা যাউক একমাত্র শ্রীকবিকর্ণপুরের দোহাই দিয়া নৃসিংহপ্রসাদ, শ্রীমন্নর-হরিকে নবদ্বীপলীলা হইতে বাদ দিতে পারেন কিনা। এবং তাঁহার উদ্ধৃত শ্লোকের প্রকৃত অর্থ তাঁহার নিজের বোধগম্য হইয়াছে কিনা।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যের যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং তাহার যে ব্যাখ্যা দেখাইয়াছেন তাহাতে "পুরুষোত্তমে স্থিতবতি" কথাটী উপলব্ধি করিলে বোধ হইবে, যে সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া এযাবৎ শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশ ভ্রমণাদিতে ব্রতী ছিলেন, সুতরাং গৌরদেশের ভক্তগণের সহিত মিলিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না, পরে প্রত্যাগমন করিয়া পুরুষোত্তমে স্থিত হইলে শ্রীনরহরি, রঘুনন্দন প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া তথায় তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। অধিকন্তু নীলাচল আগমন সংবাদ প্রাপ্তি মাত্রই দীর্ঘ অদর্শনের পর কাতর হইয়া নরহরি সর্ব্বাগ্রেই যাত্রা করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

পুনরায় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের মূল পয়ারের বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া নৃসিংহ প্রসাদ বলিতেছেন, "তন্মধ্যে গৌড়দেশীয় লোক ভগবানের প্রিয়, গৌড়ীয়গণের মধ্যে অতি প্রিয় শত শত ব্যক্তিকে দর্শন করিলাম।" তাঁহারা ইহাঁকে পূর্ব্বে না দেখিলেও অতীব সৌভাগ্যশালী। যেমন খণ্ডবাসী নরহরি প্রভৃতি ভাগ্যবানগণ প্রথমে ইহাঁকে দর্শন করেন নাই, এক্ষণে প্রতিবৎসর পুরুষোত্তমে আগমন করেন" ইত্যাদি।

কিন্তু প্রকৃত ব্যাখ্যা মহাজনগণ এইরূপ করিয়াছেন—

"সর্ব্বলোক মধ্যে তাঁর প্রিয় গৌড়বাসী।
তার মধ্যে অতি প্রিয় কেহ ভাগ্যরাশী॥

বৈদ্যকুলে খণ্ড হইতে আইল নরহরি।
রঘুনন্দনাদি শত শত ভক্ত সঙ্গে করি॥
পূর্ব্বে নবদ্বীপে যবে বিহার করিল।
ইহা সভাকার সনে দর্শন না হৈল॥" ইত্যাদি—

এই শেষোক্ত ব্যাখ্যা আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে দ্বিতীয় ছত্রে "তার মধ্যে অতি প্রিয় কেহ ভাগ্যরাশী" বলিয়া খণ্ডবাসী নরহরিকেই বুঝাইতেছে। যদি পূর্ব্বে কখনও শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ না হইয়া থাকে তবে হঠাৎ প্রথমেই কেমন করিয়া কর্ণপুর মহাশয় তাঁহাকে "অতি প্রিয় ভাগ্যরাশী" ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করিলেন কেন?

শ্রীরঘুনন্দন এবং অন্যান্য শত শত ভক্তবৃন্দ যাঁহারা, পূর্ব্বে শ্রীগৌরাঙ্গের নবদ্বীপ লীলা দর্শন করেন নাই, তাঁহারাই শ্রীমন্নরহরির সহিত মহাপ্রভুর নীলাচলে স্থিতি সংবাদ পাইয়া আগমন করিলেন, ইহাই প্রকৃত ব্যাপার এবং ইহাতে সর্ব্ব-সামঞ্জস্যই রক্ষিত হইয়াছে। শ্রীমন্ রঘুনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসগ্রহণ সময়ে শিশুমাত্র। ১৪২৫ হইতে ১৪৩০ শকের মধ্যেই রঘুনন্দনের জন্মকাল স্থির হইয়াছে—সুতরাং তিনি নবদ্বীপলীলা দর্শন করেন নাই, পরে মহাপ্রভু ছয় বৎসর পর্য্যটনপূর্ব্বক পুরুষোত্তমে আগমন করিলে নরহরি ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দন এবং অন্যান্য ভক্তজনকে সঙ্গে লইয়া মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে যাত্রা করেন।

এক্ষণে অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, নৃসিংহবাবু নিজ প্রয়োজন সংসিদ্ধির জন্য, শ্রীমন্নরহরিকে নিজকৃত সুকৌশল সম্পন্ন অভিনব ব্যাখ্যার ভিতর টানিয়া নবদ্বীপলীলা হইতে বাদ দিয়া একেবারেই নগণ্য করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন এবং পরিশেষে সুযোগ বুঝিয়া হয়ত বলিবেন, নরহরির স্বজাতি কবি কর্ণপুরই যখন তাঁহাকে গৌরাঙ্গলীলা দর্শন করেন নাই বলিয়াছেন তখন অন্য পরে কা কথা!

শ্রীকবিকর্ণপূর চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের শেষভাগে পুনরায় বলিতেছেন—যথা অনুবাদ:—

"গোকুলে যতেক গোপ গোপী পরিবার।
গৌড়ে নবদ্বীপ আদ্যে কৈলা অবতার॥
সুবল আমার সখা সর্ব্বতত্ত্ব জানে।
গৌরীদাস পণ্ডিত এবে মোর সনে॥
শ্রীদাম আমার সখা সেহো সদা ব্রজে।

সংপ্রতি শ্রীরামদাস স্বরূপে বিরাজে ॥
শ্রীসুন্দরানন্দ আর শ্রীপুরুষোত্তম।
পুরুষোত্তম পণ্ডিত কমলাকর নাম ॥
উদ্ধারণ দত্ত আর কালা কৃষ্ণদাস।
পুরুষোত্তম দাস আর পরমেশ্বর দাস ॥
এই সব আমার গোকুল সহচর।
মোর ইচ্ছা আইলেন পৃথিবী ভিতর ॥
গদাধর, গদাধর দাস শ্রীরাঘব।
নরহরি জগদানন্দ প্রভৃতি বৈষ্ণব ॥
প্রেয়সী সকল এই পুরুষ আমাব।
সেই যে হৈলা শুন হেতু কহি তার ॥"—ইত্যাদি

এই যে দেখিতেছি—শ্রীনরহরির "নামগন্ধ" একাধিক স্থানেও কবিয়াছেন। তবে কি নৃসিংহবাবুর ইহা নয়নগোচর হয় নাই ?

শ্রীকবিকর্ণপুর প্রায় অধিকাংশেরই নাম এইরূপ সামান্যভাবেই উল্লেখ করিয়াছেন, এমন কি অনেকানেক প্রধান ভক্তের উল্লেখও করেন নাই। ইহাতেই কি প্রমাণ হইবে যে শ্রীনরহরি রঘুনন্দন নগন্য ছিলেন ? পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন।

কবিকর্ণপুর মহাশয় যে গৌরগণোদ্দেশদীপিকাতে নরহরি প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ কবিয়াছেন তাহা প্রথমেই দেখাইয়াছি। পুনরায় বলিতেছেন—

"শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোরতিকৃপা মাধ্বীক সদ্ভাজনং
সান্দ্রপ্রেমপরম্পরা কবলিতং বাচঃ প্রফুল্লং মুদা।
শ্রীখণ্ডে রচিত স্থিতিং নিরবধি শ্রীখণ্ড চর্চ্চার্চ্চিতং
বন্দে শ্রীমধুমত্যুপাধিবলিতং কঞ্চিন্মহাপ্রেমদং ॥"

ইহা অপেক্ষাও অধিক আর কি আশা করা যাইতে পাবে ?

যাহা হউক কেবলমাত্র কবিকর্ণপুরের উপর নির্ভর করিতে না পারিয়া সূক্ষ্মদর্শী নৃসিংহবাবু বলিতেছেন—"শ্রীচৈতন্যলীলাতে যিনি সাক্ষাৎ বেদব্যাস সেই বৃন্দাবনদাস ঠাকুর আপন গ্রন্থে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থের মধ্যে যে নরহরি প্রভৃতির নাম পর্য্যন্ত বর্ণনা করেন নাই, সেই নরহরিকে লইয়া এত আন্দোলন করা অতি অসঙ্গত। বিশেষতঃ তিনি শ্রীমহাপ্রভুর অতি

অন্তরঙ্গ পার্ষদের মধ্যে কেহ ছিলেন, এই কথা কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারা যায় বলুন ?”

ইংরাজী ভাষায় এইরূপ প্রবচন আছে, দেবদূতগণ যেখানে পদার্পণ করিতে ভীত হন, মূঢ়গণের তথায় প্রবেশ করিতে বিন্দুমাত্রও শঙ্কার উদয় হয় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি নৃসিংহবাবু নরহরি আতঙ্কে একান্ত অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন।

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর যে নরহরি সম্বন্ধে চৈতন্যভাগবতে স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করেন নাই, ইহা বৈষ্ণবজগৎ অনেকদিন হইতেই জানেন। তবে কি তিনি একেবারেই করেন নাই ? শ্রীমন্নরহরির যে চামর সেবার কার্য্য ছিল, ইহা বৈষ্ণব-জগতে প্রসিদ্ধ আছে। চৈতন্যভাগবত মধ্যখণ্ড নবম অধ্যায়ে তাই বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন :—

“ছত্র ধরিলেন শিরে নিত্যানন্দ রায়।
কোন ভাগ্যবন্ত রহি চামর ঢুলায়॥”

সুবৈষ্ণবগণের অবিদিত নাই এই ভাগ্যবন্ত কোন জন। শ্রীগোবিন্দ ঘোষ মহাশয় নিজপদে লিখিয়াছেন—

“নিতাই গদাই সহ ভোজনে বসিলা গোরা
আনন্দে নেহারে ভক্ত বৃন্দ।
* * * *
নরহরি পাশে থাকি তিনরূপ নিরখিছে
চামর ঢুলায় অঙ্গে সুখে॥” ইত্যাদি।

শুধু চৈতন্যভাগবতে নহে, বৃন্দাবনদাস তাঁহার শ্রীচৈতন্য পারিষদ পুস্তকে (চৈতন্যভাগবতের পরে রচিত) পুনরায় শ্রীনরহরি নাম না করিয়া ঐরূপভাবে বলিতেছেন :—

“কোন কোন ভাগ্যবান চামর ঢুলায়।”

আমরা বিশেষরূপে জানি এই ভাগ্যবান শ্রীনরহরি। যদি নৃসিংহপ্রসাদের অবিশ্বাস থাকে, তবে তাঁহার মতে নাম না লইয়া পুনঃ পুনঃ যাঁহাকে এই ভাগ্যবান বলা হইতেছে—তিনি কোন জন ?

কিন্তু শ্রীচৈতন্যভাগবতই শুধু শেষ নহে। ঐ গ্রন্থের পূর্ব্বে লিখিত, শ্রীবৃন্দাবনদাস তাঁহার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় গ্রন্থের দ্বিতীয় দর্শনে বলিতেছেন :—

“নিত্যসিদ্ধ ভক্তজন কৃষ্ণসম জানি।
দীক্ষা শিক্ষা লোকাচার লীলা করি মানি॥

শ্রীচৈতন্য চন্দ্র বেড়ি তারা ভক্ত যত।
ক্ষুদ্র হইয়া আমি কহিব তাহা কত॥
আপনার গুণে তেঁহ হইয়াছে প্রকাশ।
তাহাই বলিতে মনে কিছু করি আশ॥
অশ্বিন্যাদি যথা সপ্তবিংশতি কথন।
তথা নিত্য সিদ্ধ ভক্ত করিব গণন॥
সংক্ষেপেতে অপরাধ না লবে আমার।
শ্রীচৈতন্যমঙ্গলেতে করিব প্রচার॥
মুখ্য ভক্ত যত আর অন্যত্র বলিব।
সপ্তবিংশতি মাত্র অগ্রেতে কহিব॥
নিত্যসিদ্ধ গোপগোপী চৈতন্যাবতারে।
হেন জন কে আছে তাহা বিস্তারিতে পারে॥" ইত্যাদি।

উপরে যে চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থের নাম করিয়াছেন, উহা শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের চৈতন্যমঙ্গল প্রচারিত হইলে বৃন্দাবনবাসী জীবগোস্বামী প্রমুখ গোস্বামী এবং মহান্তগণ দ্বারা, শ্রীচৈতন্যভাগবত নাম হয়। কেহ কেহ বলেন শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের নিজের ইচ্ছামতই নাম পরিবর্ত্তন হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় গ্রন্থের শেষভাগে "সপ্তবিংশতি তারকাদি কথনং" দ্বিতীয় দর্শনটী এইবার উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি যে "পাদুকাবহন" ঘটনার পূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবনদাস শ্রীমন্নরহরি মুকুন্দ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মনে করিতেন। পায় সমগ্রদর্শনটী উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইলাম বলিয়া পাঠকগণের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।

"মধুর রস কহিলাম সংক্ষেপে বিচার।
সপ্তবিংশ তারকাদি হইল প্রচার॥
সিদ্ধ ভক্ত নাম কিছু সংক্ষেপেতে বলি

* * *

শ্রীচৈতন্যপ্রিয়গণ চৈতন্য সহিতে।
কাব্যভঙ্গ হয় বহু স্বরূপ বলিতে॥
শ্রীরূপ সনাতন গোস্বামী সমাজে।
শ্রীবৃন্দাবন মাধব সতত বিরাজে॥

কি কহিব শ্রীরূপের স্বভাব মহিমা।
শতমুখে কহি যদি তবু না হয় সীমা॥
মুখ্যভক্ত সিদ্ধবাক্য অষ্টৈমু বিচার।
ত্রিভুবনে সমগুণে নাহিক যাহার॥
শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহাব প্রিয়তম জানি।
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় বলি যাঁহাব আজ্ঞা মানি॥
সংস্কৃত করিয়া জীব বলিলা কহিতে।
মুরারি গুপ্তের কবিত্ব দেখি না লইল চিত্তে॥
পবম আনন্দে জীব আমারে কহিলা।
শ্রীরূপের বচন তাতে প্রকাশিতে দিলা॥
পণ্ডিত গোস্বামী আদি মুখ্য ভক্তগণ।
সার্ব্বভৌম আদি ভক্ত তাহার গণন॥
রঘুনাথ দাস নাম পবম সাধু জন।
রাধাকুণ্ড বাসী সদা করয়ে ভজন॥
শ্রীগোপাল ভট্ট নাম বৈবাগী মহাশয়।
শ্রীরূপ সঙ্গে রঙ্গে বিরাজিত হয়॥
শ্রীচৈতন্য প্রিয়ভক্ত লোকনাথ নাম।
সর্ব্বশেষে মহাপ্রভুর প্রেমগুণ ধাম॥
নিগুঢ় আলিঙ্গন প্রভু ধ'রে দিলা।
প্রেমাবেশে লোকনাথ নাচিতে লাগিলা॥
শ্রীমুকুন্দ দাস ঠাকুব আব শ্রীনরহবি দাস।
শ্রীচৈতন্য প্রেমসিন্ধু মধ্যেতে বিলাস॥
শ্রীপ্রবোধানন্দ নাম সিদ্ধ ভক্তগণ।
শ্রীচৈতন্যচন্দ্র বিনা নাহি কিছু মন॥
রাঘব গোস্বামী নাম গোবর্দ্ধনে বাস।
চৈতন্য ভজন বিনা কিছু নাহি আশ॥
মথুরা মণ্ডলে শ্রীকাশীশ্বর গোস্বামী।
শ্রীকৃষ্ণভজনে নাহি হয় অন্য কামী॥
জগদীশ পণ্ডিত আদি মুখ্যভক্তগণ।
নিত্যসিদ্ধ মধ্যে সভার হয়েন কথন॥

রঘুনাথ ভট্ট আদি মুখ্য মহাশয়।
যাহাদিগের নামে সর্ব্বলোকে বশ হয়॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ ভক্তবৃন্দ যত।
প্রত্যেকে স্তবন আমার সভাকারে তত॥
সন্ন্যাস আশ্রমে নিন্দা স্ত্রী পরশিতে।
বহু প্রেয়সী পুরুষরূপে শ্রীচৈতন্য সহিতে॥
ভাবিয়া শ্রীনিত্যানন্দ চরণ মানসে।
শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় কহে বৃন্দাবন দাসে॥

শ্রীমান্ রঘুনন্দনকে সপ্ত বিংশতি তারকার মধ্যেই গণনা করিয়াছেন।

পাঠকগণ দেখিলেন যে, নৃসিংহ প্রসাদের গবেষণা কতদূর অনর্থকারী। যাহা হউক শ্রীনিত্যানন্দ ভাগবতে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর যে পরে নরহরি ঠাকুরের নাম করেন নাই এ বিষয়ে শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীরঘুনন্দনের উপযুক্ত বংশধর পণ্ডিত শ্রীগৌর গুণানন্দ ঠাকুর মহাশয় কি লিখিয়াছেন তাহাই শুনুন, আমাদের নিজের কথার প্রয়োজন নাই।

"শ্রীচৈতন্য ভাগবত কর্ত্তা স্বয়ং ব্যাসাবতার পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস স্বগ্রন্থে কিম্ শব্দের দ্বারায় অনির্দ্দিষ্ট ভাবে ইঁহার (শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের) নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে শৃঙ্গার রসের পাত্র গোপাঙ্গনাগণ কিম্ শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ আছে, নামতঃ উল্লেখ নাই। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—"তং কাচিন্নেত্র রন্ধ্রেণ হৃদিকৃত্য নিমীল্য চ" ইত্যাদি। যদি কেহ বলেন রাধাবতার গদাধরের নামোল্লেখ করিলেন কেন? তবে বক্তব্য এই, গদাধরে মহালক্ষ্মীর (রুক্মিণীর) শক্তি পর্য্যন্ত অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। নরহরির বিশুদ্ধ ব্রজগোপীভাব, এই হেতু তাঁহার নামোল্লেখ নাই।" যথা চৈতন্য ভাগবতে—

"ছত্র ধরিলেন শিরে নিত্যানন্দ রায়।
কোন ভাগ্যবান রহি চামর ঢুলায়॥"

"চৈতন্য পার্ষদগণের মনোমালিন্য থাকা নিতান্ত অসম্ভব। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে শ্রীনরহরির নাম উল্লেখ না থাকায় যাঁহারা এইরূপ মনোমালিন্যের ভাব কল্পনা করিতেও কুণ্ঠিত নহেন, তাঁহারা যে বিষম ভ্রান্তি বিবর্ত্তে পড়িয়াছেন তাহা বলাই বাহুল্য। ইঁহাদের সিদ্ধান্ত যে নরহরি নাগরী ভাবে গৌরাঙ্গ ভজন করিতেন বলিয়া বৃন্দাবন দাস অসূয়া বশতঃ ইঁহার নামোল্লেখ করেন নাই। যে হেতু বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন—"

"অতএব মহামহিম সকলে।
গৌরাঙ্গ নাগর হেন স্তব নাহি বলে॥
যদ্যপি সকল স্তব সম্ভবে তাহানে।
তথাপিহ স্বভাবে সে গায় বুধগণে॥"

এই সকল মূর্খের মূর্খতার সীমা নাই। ইহারা এতই অন্ধ দৃষ্টি যে শেষ দুই পংক্তির তাৎপর্য্য অনুধাবন করিতেও অক্ষম। পরন্তু এই কান্তাভাব যদি বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের নিকট হেয় বলিয়া পরিগণিত হইত, তবে তিনি স্বয়ং শ্রী শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর নাগরীভাব বর্ণনা করিলেন কেন? নিম্নে একটীমাত্র পদ উদ্ধৃত করিলাম। বৃন্দাবন দাসের এ প্রকারের বহু পদাবলী পাওয়া যায়।" যথা—

"নিতাই হইল অভিমানী সাধে গৌর গুণমণি
করজুড়ি সম্মুখে দাঁড়ায়।
গলায় অম্বর ধরি লুটায়ত গৌরহরি
পদযুগ ধরিবারে যায়॥"

বৈষ্ণবদ্বারা পাদুকাবহন এবং শ্রীনিত্যানন্দ বিদ্বেষ প্রভৃতি যে সমস্ত অন্যান্য কারণ শ্রীবৃন্দাবনের অসন্তোষের হেতু বলিয়া প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে কত-দূর সত্য নিহিত আমরা জোর করিয়া বলিতে অক্ষম। আমাদের মনে হয় সকলই তাঁহাদিগের লীলামাত্র, বাহ্যে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া কোন্ অন্তর নিহিত প্রয়োজন সাধন করিয়াছিলেন তাহা তাঁহারাই জানিতেন। শ্রীশিবানন্দ সেনকে শ্রীমন্নিত্যানন্দের ৩ পুত্র বিনাশের অভিশাপের কথা কে না জানেন?

যদিও শ্রীগৌরাঙ্গ পার্শ্বদের সকলেই সমান তথাপি বিচার করিয়া দেখিলে যেমন ইহাতেও তারতম্য আছে বলিয়া কবিরাজ গোস্বামী নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেইরূপ প্রাণসখী মধুমতীর তুলনায় ব্যাসাবতার শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর ভক্ত মাত্র। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মধুররসের যাহারা প্রস্ফুটিত পারিজাত, মকরন্দ তৃষ্ণাতুর কৃষ্ণ-ভৃঙ্গ যাহাদিগের ঘনীভূত প্রেমরসে সদা বিহ্বলচিত্ত, যাদবশ্রেষ্ঠ ভক্তরাজ শ্রীউদ্ধব যাহাদিগের সৌভাগ্যপ্রার্থী হইয়া ব্রজভূমে তৃণ-জন্মও লাভ করিতে লালায়িত, ষষ্ঠীসহস্রবৎসর কঠোর তপস্যা করিয়াও ব্রহ্মার যে সৌভাগ্য সঞ্জাত হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, নারায়ণ বক্ষস্থিতা হইয়াও লক্ষ্মী যে গোপীগণের সৌভাগ্য-বাঞ্ছা করিয়া আজিও বিল্ববনে তপস্যায় নিযুক্তা আছেন, সেই ব্রজের প্রাণসখী

মধুমতীস্বরূপ "প্রেমের রমণী" শ্রীমন্নরহরির কথা অধিক আর কি বলিব? আমরা যদিও বিচারক নহি তথাপি "বেত্তি ন বেত্তিবা" যে ব্যাস সেই শ্রীবৃন্দাবন ঠাকুর শত কারণ থাকিলেও চৈতন্যভাগবতে শ্রীনরহরির নাম গ্রহণ না করিয়া অত্যুদার কার্য্য করেন নাই এবং সম্ভবতঃ ইহা বলিয়াই পুনরায় নরহরিকে তাঁহার উপযুক্ত সম্মান দিয়া গিয়াছেন।

যে সকল লেখকগণ আজকাল শ্রীল নরহরি ঠাকুর মহাশয়ের জয়গীত গান করিতেছেন তাঁহারা বিশেষভাবে ধন্য এবং ধন্য তাঁহাদের লেখনীধারণ। শ্রীমন্নর-হরিরগুণ কীর্ত্তন করিবার সৌভাগ্য কয়জন জীবের হইয়া থাকে? যাঁহাদের হইয়াছে তাঁহারা সামান্য নহেন।

যাহা হউক "বৈষ্ণবজীবনী" এ সম্বন্ধে যাঁহা বলিয়াছেন তাহাও পাঠকগণের অবগতির জন্য উদ্ধৃত করিতেছি।

শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীপাদ নরহরি সরকার ঠাকুর মহোদয় কোন সময়ে স্থানান্তরে যাইতেছিলেন। সঙ্গে একজন বৈষ্ণব ছিলেন। বৈষ্ণব তাঁহার কাষ্ঠপাদুকা (খড়ম) বহন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর এইটী অবলোকন করিয়া বৈষ্ণবের অপমান বোধ করতঃ দুঃখিত হইয়াছিলেন এবং নিজ-গ্রন্থ চৈতন্য ভাগবতে নরহরির কোন কথা লিখিয়া যান নাই। গ্রন্থ শেষ হইলে নরহরির মাহাত্ম্য ও বৈষ্ণবগত-জীবন জানিতে পারিয়া অনুতাপ পূর্ব্বক নরহরির প্রিয় শিষ্য লোচনদাসকে তদীয় গ্রন্থে (চৈতন্য মঙ্গলে) নরহরির প্রসঙ্গ বিশেষ ভাবে বর্ণনা করিতে আদেশ করেন। এই জন্য লোচনদাসের গ্রন্থে নরহরির ভূয়ো ভূয় উল্লেখ দৃষ্ট হয়। শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী মহাশয় তাঁহার বঙ্গ-রত্ন পুস্তকে বলেন যে, বৃন্দাবন দাস তাঁহার "চৈতন্য পারিষদ" গ্রন্থে ঐ পূর্ব্ব দোষ পরিহারার্থ বলিয়াছেন—

"কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়।
কোন কোন ভাগ্যবান চামর ঢুলায়॥"

অর্থাৎ এই ভাগ্যবানই নরহরি। কোন কোন বৈষ্ণব বলেন ঐ লেখাও পাদুকাবহন ঘটনার সময়। এজন্য স্পষ্ট নাম না করিয়া "কোন কোন" লেখা হই-য়াছে। যাহা হউক পাদুকা বহন ব্যাপার যে সত্য তাহা বেশ বুঝা যায় এবং উহা লইয়া একটা জল্পনা কল্পনা চলিয়াছিল তাহাও সত্য বলিয়া বোধ হয়। তবে উত্তমাধিকারী ও বৈষ্ণবগণ প্রাণ নরহরির সেটা দোষের বলিয়া আমাদের মনে হয় না।"

"যাহা হউক, পরিশেষে মহাপ্রভুর পরিকর বর্ণনে প্রধান ভক্ত নরহরির নাম উল্লেখ না করিলে তাঁহার গ্রন্থ অসম্পূর্ণ হয় এই ভয়ে প্রকারান্তরে তাহার কথা "কোন কোন ভাগ্যবান" এই বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।"

শ্রীল নরহরি ঠাকুর যে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কোন বৈষ্ণবদ্বারা নিজ পাদুকা বহন করাইয়াছিলেন একথা কখনই সত্য হইবার নহে। শ্রীনরহরিবতুল্য অন্তরঙ্গ প্রধান ভক্তের প্রতি ভক্তি ও অনুরাগ বশতঃ একার্য্য তদীয় কোন শিষ্য বা ভক্তেরই করা সম্ভব। ব্রাহ্মণাদি সর্ব্ববর্ণের লোকই তদ্‌গুণমুগ্ধ হইয়া তাহার চরণে শরণাগত হইয়াছিলেন এবং দীক্ষা গ্রহণে কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

চৈতন্যভাগবত গ্রন্থ প্রণয়ণের পূর্ব্বে যে বৃন্দাবন দাসের নরহরির প্রতি কোন মনোমালিন্য ছিল না তাহা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় হইতে পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশ পাঠেই অবগত হওয়া যাইবে। মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের অল্প পরেই চৈতন্য ভাগবত রচিত হয়। শ্রীমন্নরহরি ইহার পূর্ব্বে গৌড় দেশে বিশেষরূপে বিখ্যাত এবং পার্ষদগণের মধ্যে অতি অন্তরঙ্গ অগ্রগণী ভক্ত বলিয়া গণ্য হইয়াছেন, বৃন্দাবন দাস গাহিয়াছেন—

সংকীর্ত্তনের অধিকারী হইলেন নরহরি
বিলসই শ্রীরঘুনন্দন।
আজ্ঞা দিয়া সবাকারে, বচন বিনয় করে,
আস্বাদিয়া গৌরাঙ্গের গুণ ॥
রাধাকৃষ্ণ লীলানন্দ করিয়া সে আস্বাদন
এই ত পরমধন জনে।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্র বলরাম নিত্যানন্দ
বৃন্দাবন দাস গুণগান ॥

আমরা পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম যে শ্রীনরহরি গৌরাঙ্গ নাগর ভাবে ভজনার বিরূপ হইয়া বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছিলেন।

"এতএব মহামহিম সকলে।
গৌরাঙ্গ নাগর হেন স্তব নাহি বলে ॥" ইত্যাদি,

তাঁহাকেই আবার পরে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখ দিয়া বলিতে হইয়াছে" :—

"অলসে অরুণ আঁখি, কহ গৌরাঙ্গ একি দেখি,
রজনী বঞ্চিলে কোন স্থানে।

তোমার বদন শশীরুহ মলিন যে হইয়াছে,
সারানিশি করি জাগরণে ॥
তুয়া সঙ্গে কিসের পিরীতি।
এমন সোণার দেহ পরশ করিল কেহ,
না জানি সে কেমন রসবতী ॥
নদীয়া নাগরী সনে, রসিক হৈয়াছ ওহে,
অবহি পার ছাড়িবে। (?)
সুরধুনী তীরে গিয়া, মার্জ্জন কবহ হিয়া,
তবে সে আসিতে দিব ঘরে ॥
গৌরাঙ্গ করুণ ভাষী, কহে মৃদু মৃদু হাসি,
শুন প্রিয়ে কহ :কটু ভাষ।
হরিনামে জাগি নিশি অমিঞা সাগরে ভাসি,
গুণগায় বৃন্দাবন দাস ॥"

এই "শ্রীনরহরির প্রদর্শিত পথে নাগরিভাবে ভজনা করিতে গিয়া তিনি সরকার ঠাকুরের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষভাব ভুলিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি বহু সুমধুর পদ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে সরকার ঠাকুরের নামোল্লেখ করেন নাই কিন্তু আজ মনের সাধে লিখিলেন—

"বিনোদ বন্ধনে, নাচে শচীনন্দনে, চৌদিকে রূপ পরকাশ ॥
বামে রহু পণ্ডিত প্রিয় গদাধর, দক্ষিণে নরহরি দাস ॥
গৌরাঙ্গ অঙ্গেতে, কনয়া কদম্বজনু, ঐছন পুলকের আভা।
আনন্দে বিভোল, ঠাকুর নিত্যানন্দ, দেখিয়া গৌরাঙ্গের শোভা ॥
যাহার অনুভব, যেই সে সমুঝই, কহনে না যায় পরকাশ।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, ঠাকুব শ্রীনিত্যানন্দ, গুণ গায় বৃন্দাবন দাস ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের বিনোদবন্ধনে নৃত্য, সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে অর্থাৎ নবদ্বীপ লীলাতেই সম্ভবপর ছিল সুতরাং শ্রীবৃন্দাবন দাসই নবদ্বীপে শ্রীনরহরির গৌরাঙ্গ বিলাসের সাক্ষী। শ্রীগৌরাঙ্গপাদ বাসুঘোষ মহাশয়ও মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণে প্রিয়তম ভক্তবৃন্দের দুঃখ বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন।

"গদাধর পড়িয়াছে, নরহরি তার কাছে
আর কারও মুখে নাহি বাণী।
দেখিয়া ভকত দশা কহে গদগদ ভাষা ॥"
ধরণী লোটায়ে ন্যাসিমণি ॥" ইত্যাদি

শ্রীনরহরির প্রিয়তমের সন্ন্যাসে অত্যধিক কাতর হইয়া নবদ্বীপে ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতেছেন :—

"আওব গৌর, পুনহি নদীয়াপুর, হোয়ব কিয়নহি উল্লাস।
ঐছে আনন্দ কন্দ, কিয়ে আর হেরব, শুনব কি কীর্ত্তন বিলাস॥
কুন্দ কনক জিনি, কাঁতি কি হেরব, যতিকি সূত্র বিরাজ।
বাহু যুগল তুলি, হরি হরি বোলব, নটন ভকতগণ মাঝ॥
এত কহি নয়ন, মুদি রহি সবজন, গৌর প্রেম ভেল ভোর।
নরহরি দাস, আশা কবে পূরব, হেরব গৌর কিশোর॥"

তদানীন্তন প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তাগণ বহুস্থানে শ্রীনরহরির গৌরাঙ্গ বিলাসের কথা গাহিয়াছেন, বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত করিলাম না।

ভক্ত পাঠকগণ এক্ষণে অনুভব করুন, শ্রীনরহরি নবদ্বীপ লীলার কত অন্তরঙ্গ এবং তাঁহার মহিমা কিরূপ উচ্চে অবস্থিত।

কিন্তু হইলে কি হইবে! নৃসিংহ বাবু অভিমান ভরে বলিতেছেন, "এই সমস্ত কথাতে আস্থা না করিয়া যাহারা কতকগুলি আধুনিক বাজে বহির কথা লইয়া প্রবন্ধ লেখালেখি করেন, তাঁহাদিগকে আর কি বলিব বলুন? আরও দেখুন শ্রীচৈতন্য লীলাতে যিনি সাক্ষাৎ বেদব্যাস সেই শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর আপন গ্রন্থে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য ভাগবতে যে নরহরি প্রভৃতির নাম পর্য্যন্ত বর্ণনা করেন নাই সেই নরহরিকে লইয়া এত আন্দোলন করা অতি অসঙ্গত। বিশেষতঃ তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর অতি অন্তরঙ্গ পার্ষদের মধ্যে কেহ ছিলেন, এই কথা কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারা যায় বলুন?"

আমাদের এ সম্বন্ধে যাহা বলিবার পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পাঠকগণ এবং যাঁহারা শ্রীনরহরি সম্বন্ধে "লেখা লেখি" করেন তাঁহারাই বিচার করিবেন। বিশ্বাস করা সকলের সৌভাগ্য নহে।

ফলতঃ আমাদের মতে এইরূপ বৈষ্ণব বিদ্বেষী ভাব ভাষা এবং অনর্থপূর্ণ প্রবন্ধ কোন বৈষ্ণব পত্রিকাতেই স্থান পাইবার উপযুক্ত নহে।

শ্রীযুক্ত নৃসিংহ প্রসাদের শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ের পয়ার উদ্ধৃত করিয়া শ্রীবৃন্দাবন দাসকে প্রতিষ্ঠিত করিবার কোন প্রয়োজনই ছিল না। আমরা শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদের প্রতিবাক্যই শত বেদ তুল্য প্রামাণিক বলিয়া শিরো-ধার্য্য করিয়া থাকি। শ্রীল বৃন্দাবন দাস, শ্রীলোচন দাস ঠাকুর, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীনিত্যানন্দ দাস বা বলরাম দাস, শ্রীকবিকর্ণপুর এবং জগৎপূজ্য শ্রীরূপ

শ্রীসনাতন প্রভৃতি তৎসাময়িক প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মহানুভব বৈষ্ণবগণ ত্রিতাপদগ্ধ পরবর্ত্তী জীবের প্রতি কৃপা পরবশ হইয়া তাহাদের পিপাসিত হৃদয়কে শ্রীগৌরাঙ্গ চরিতামৃত বর্ষণে সুশীতল করিতে যে সকল পরম পবিত্র গ্রন্থরাজি এবং ছন্দোবন্ধে উন্মাদকারী অমৃত ভরামহোচ্চ ভাব ও ভাষায় গ্রন্থন করিয়া যে সকল অক্লান্ত কবিতা রাশি স্তবকে স্তবকে সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন, ত্রিজগতে তাহার তুলনা কোথায় ? এই সকল গ্রন্থের প্রতি অক্ষর আমাদের মস্তকের ভূষণ তাহাতে সত্যাসত্য বা ভালমন্দ বিচার করা ধৃষ্টতা বলিয়াই বোধ হয়।

শ্রীল নবহরির বিষয় শ্রীল রূপ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

"শ্রীবৃন্দাবন বাসিনো রসবতী রাধা ঘনশ্যাময়ো
রসোল্লাস রসাত্মিকা মধুমতী সিদ্ধনুগা যা পুরা।
সেয়ং শ্রীসরকার ঠকুর ইহ প্রেমর্থিতঃ প্রেমদঃ
প্রেমানন্দ মহোদধিবিজয়তে শ্রীখণ্ড ভূখণ্ডকে॥
বৈদগ্ধী রসিকা শ্রেষ্ঠা বিশালাক্ষী সুচঞ্চলা
তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গী নিতম্বর শালিনী।
আষোডশাব্দ বয়সা পীনোন্নত পয়োধরা
মৌন প্রাপ্তাধরা স্নিগ্ধা মধুমত্যালিকাশুভা॥" ইত্যাদি।

এবং শ্রীল স্বরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন—

"অবনি সুরবর শ্রীপণ্ডিতাখ্যো যতীন্দ্রঃ"
স খলু ভবতি রাধা শ্রীল গৌরাবতারে।
নরহরি সরকার স্থাপি দামোদরস্থ
প্রভু নিজদয়িতানাং তচ্চ সারং মতং মে॥

নৃসিংহ বাবুর সকল কথার উত্তর এখনও হয় নাই। সত্যের অনুরোধে এবং শ্রীল নরহরির অযথা অসম্মান নীরবে সহ্য করিবার ক্ষমতা না থাকায়, যখন হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তখন আমাদের আরও কিছু বলিতে হইবে। নিশ্চয়ই পাঠকগণের ধৈর্য্য অপহরণ করিতেছি তাঁহারা ক্ষমা করিবেন। নৃসিংহ বাবু সম্ভবতঃ গোস্বামী বা ঠাকুর সন্তান হইয়া নরহরি সম্বন্ধে যে সমস্ত অবান্তর প্রশ্নের উত্থাপন করিয়া স্বীয় পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়া ফেলিয়াছেন। সাধারণতঃ তাহা নরহরি তত্ত্ববেত্তা ভক্ত বৈষ্ণবগণের চিত্ত চাঞ্চল্য উৎপাদন করিতে সমর্থ না হইলেও, আজকাল নূতন যাঁহারা গোড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতি চিত্তবৃত্তি

নিযুক্ত করিতে প্রয়াসী হইতেছেন, তাঁহারা যাহাতে নৃসিংহবাবুর মায়াপাশে পতিত না হয়েন, এই জন্যই আমার ক্ষুদ্র লেখনী ধারণ। আমাদের মনে হয়, নৃসিংহ বাবুর প্রবন্ধগুলির প্রতি অনেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু জানিনা কেন এ পর্য্যন্ত কেহই এ বিষয়ে বিশেষভাবে কিছু বলেন নাই হয়ত বলিবার প্রয়োজনই মনে করেন নাই।

"খণ্ডের সম্প্রদায় করে অন্যত্র কীর্ত্তন
নরহরি নাচে তাঁহা শ্রীরঘুনন্দন।"

শ্রীযুক্ত নৃসিংহ প্রসাদ গোস্বামী এই দুই ছত্র উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিতেছেন :—

"এই লেখাতেই অনুমিত হইতেছে যে, শ্রীনরহরি প্রভৃতি ভক্তগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমভিব্যাহারে শ্রীসংকীর্ত্তন করিতেও সমর্থবান ছিলেন না।"

একথায় হাস্য সম্বরণ করা দুঃসাধ্য। যদি শ্রীনরহরিই শ্রী গৌরাঙ্গের সহিত কীর্ত্তনে অযোগ্য হয়েন তবে জানি না পার্ষদগণের মধ্যে যোগ্য কে?

যাহা হউক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ঐ স্থানটী উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি যে "সমর্থবান ছিলেন কি না। আদ্যন্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক মধ্য হইতে দুই ছত্র উদ্ধৃত করিয়া স্বীয় মত পোষণ করিতে একটি বিকৃত মন্তব্যগঠন করিলেই যে, সাধারণও লেখকের মতই বিকৃত মস্তিস্ক হইবেন তাহার মানে কি?

"তবে মহাপ্রভু মনে বিচার করিয়া
চারি সম্প্রদায় কৈল গায়ন বাটিঞা॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত হরিদাস বক্রেশ্বরে।
চারিজনে আজ্ঞা দিল নৃত্য করিবারে॥
প্রথম সম্প্রদায় কৈল স্বরূপ প্রধান॥
আর পঞ্চজন দিল তার পালি গান॥
দামোদর নারায়ণ দত্ত শ্রীগোবিন্দ।
রাঘব পণ্ডিত আর শ্রীগোবিন্দানন্দ॥
অদ্বৈত আচার্য্য তাঁহা নৃত্য করিতে দিল।
শ্রীবাস প্রধান আর সম্প্রদায় কৈল॥
গঙ্গাদাস হরিদাস, শ্রীমান শুভানন্দ।
শ্রীরামপণ্ডিত তাঁহা নাচে নিত্যানন্দ॥

বাসুদেব গোপীনাথ মুরারি যাহা গায়।
মুকুন্দ প্রধান কৈল আর সম্প্রদায়॥
শ্রীকান্ত বল্লভসেন আর দুই জন।
হরিদাস ঠাকুর তাঁহা করেন নর্ত্তন॥
গোবিন্দ ঘোষ প্রধান কৈল আর সম্প্রদায়।
হরিদাস বিষ্ণুদাস রাঘব যাঁহা গায়॥
মাধব বাসুদেব আর দুই সহোদর।
নৃত্য করেন তাঁহা পণ্ডিত বক্রেশ্বর॥
কুলীন গ্রামের এক কীর্ত্তনীয়া সমাজ।
তাঁহা নৃত্য করে রামানন্দ সত্যরাজ॥
শান্তিপুর আচার্য্যের এক সম্প্রদায়।
অচ্যুতানন্দ নাচে তাঁহা আর সব গায়॥
খণ্ডের সম্প্রদায় করে অন্যত্র কীর্ত্তন।
নরহরি নাচে তাঁহা শ্রীরঘুনন্দন॥
জগন্নাথ আগে চারি সম্প্রদায় গায়।
দুই পার্শ্বে দুই, পাছে এক সম্প্রদায়॥
সাত সম্প্রদায়ে বাজে চৌদ্দমাদল।
যার ধ্বনি শুনি বৈষ্ণব হৈল পাগল॥
আপনি নাচিতে যবে প্রভুর মন হৈল।
সাত সম্প্রদায় তবে একত্র করিল॥

*　　*　　*

এই দশ জন প্রভুর সঙ্গে গায় ধায়।
আর সব সম্প্রদায় চারিদিকে রহি গায়॥"

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু স্বরূপ, শ্রীবাস, মুকুন্দ এবং গোবিন্দ ঘোষ মহাশয়কে প্রধান করিয়া চারি সম্প্রদায় করিলেন, তাহার পর কুলীন গ্রামের, শান্তিপুর আচার্য্যের এবং শ্রীখণ্ডের, আরও এই তিনটী সম্প্রদায় হইল। জগন্নাথের অগ্রে প্রথমোক্ত চারি সম্প্রদায়, দুই পার্শ্বে দুই এবং পশ্চাতে এক সম্প্রদায় গাহিতে লাগিলেন। সর্ব্বশুদ্ধ এই ৭টী সম্প্রদায় হইল এবং চৌদ্দমাদল বাজিতে লাগিল। পরে—

"আপনে নাচিতে যবে প্রভুর মন হৈল।
সাত সম্প্রদায় তবে একত্র করিল॥"

এইত আবার মহাপ্রভু স্বয়ং একত্রও করিলেন। এক্ষণে পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন শ্রীমন্নরহরি মহাপ্রভুর সমভিব্যহারে "শ্রীসংকীর্ত্তন করিতে সমর্থবান" ছিলেন কি না? এই অক্ষত্র কথাটীর অর্থ অবশ্যই "মাঠে কীর্ত্তন" নহে।

শ্রীলোচন দাস কৃত আধুনিক চৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থ সম্বন্ধে রাঢ দেশে একটী বরাবর প্রবাদ চলিতেছে যে, শ্রীচৈতন্য ভাগবতে শ্রীনরহরি প্রভৃতির নামোল্লেখ না থাকার কারণেই (?) শ্রীনরহরি দাস আপন শিষ্য লোচন দাসকে দিয়া শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।"

শ্রীচৈতন্য মঙ্গল সম্বন্ধে নৃসিংহ প্রসাদের ইহা হইতেছে আর একটি অভিনব টীপ্পনি।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ আধুনিক কি করিয়া হইলেন? নৃসিংহবাবু এবিষয়ে গবেষণা করিয়া তাঁহার সন তারিখ দেখাইলে আরও সুখী হইতাম। চৈতন্যমঙ্গল নরহরির প্রিয় শিষ্য শ্রীলোচন দাস ঠাকুরের লিখিত। লোচন দাসের জন্ম ১৪৪০।৪৫ শকে এবং প্রায় ৬৬ বৎসরকাল জীবিত ছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার একাদশ পরিচ্ছেদে নিত্যানন্দ শাখা বর্ণনে এই লোচন, লোচনানন্দ বা সুলোচনের নাম একসঙ্গে পূর্ব্বপরিচ্ছেদে দেখা যায়—এই সুলোচনের সহিত অনেকে চৈতন্য মঙ্গলকার লোচনদাসের একতা করিয়া থাকেন। লোচনদাস মহাপ্রভুর অপ্রকটের সময় ১০।১৫ বৎসর বয়স্কবালক। ইনি কবিকর্ণপুরের সমসাময়িক এবং রঘুনন্দন ও বৃন্দাবন দাস ঠাকুর হইতে বয়ঃকনিষ্ঠ। মহাপ্রভুর অল্প পরেই ১৪৬২ শক্ অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা একাদশীতে শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের অন্তর্ধান হয়। শ্রীলোচনদাস ঠাকুর তাঁহার নিজ গ্রন্থে নরহরি ঠাকুরের আজ্ঞায় চৈতন্য-মঙ্গল রচনা করেন লিখিয়াছেন। সুতরাং নরহরি আধুনিক না হইলে লোচনদাস এবং তাঁহার গ্রন্থও আধুনিক হইতে পারে না, হইলে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুও আধুনক হইয়া পড়েন ও সমস্ত গৌরাঙ্গধর্ম্মই উল্টাইয়া দিতে হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে নৃসিংহ বাবুর গোড়াতেই বিষম গলদ।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে নরহরি প্রভৃতির নামোল্লেখ না থাকায় তিনি লোচনদাসকে দিয়া শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তবে কি নিজের নাম "জাহির" করিবার জন্যই নরহরি এই কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন? নৃসিংহ প্রসাদের উক্তির এই অর্থই বোধগম্য হইতেছে। হায়! বৈষ্ণবকুলাগ্রগণ্য আত্ম-প্রতিষ্ঠা বিদ্বেষী পরম কারুণিক উচ্চাধিকারী শ্রীল নরহরির এইরূপ বাসনা হইয়াছিল একথা মনে করিতেও শত অপরাধ হয়। যাহা হউক এবিষয়ে

নরহরি যাঁহাদের কুলদেবতা, গৌরবের মুকুটমণি সেই শ্রীখণ্ডবাসীগণ কি বলিয়াছেন তাহাই বলিতেছি।

"যাহাতে গৌরলীলা বাঙ্গলা ভাষায় বিস্তৃতরূপে প্রচারিত হয় তদ্বিষয়ে বহুদিন হইতেই নরহরির প্রবল ইচ্ছা ছিল এবং লোচনকে দিয়া এই কার্য্য সুসম্পন্ন করাইবেন মনস্থ করিলেন। নরহরির আদেশানুসারেই লোচন শ্রীচৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থ রচনা করেন। ঠাকুর নরহরির প্রেরণায় তাঁহারই কৃপায় এবং তাঁহারই উৎসাহে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে তাহা চৈতন্য মঙ্গল পাঠেই জানা যায়।"

"যাহা হউক শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত করিয়া লোচন শ্রীখণ্ডে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক শ্রীনরহরির করে গ্রন্থ অর্পণ করিলেন। নরহরি গ্রন্থ দেখিয়া বলিলেন, শ্রীবৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্যমঙ্গল নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, অতএব এই গ্রন্থ প্রচারের জন্য তোমার শ্রীবৃন্দাবন দাসের অনুমতি লওয়া আবশ্যক। নরহরির আজ্ঞায় লোচন বৃন্দাবন দাসের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে এই গ্রন্থ অর্পণ করিয়া সমস্ত কথা বলিলেন। অতঃপর বৃন্দাবন দাস গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে নিম্নলিখিত পয়ারটী দেখিয়া প্রেমে মূর্চ্ছিত হইলেন।"

"অভিন্ন চৈতন্য সে ঠাকুর অবধুত। শ্রীনিত্যানন্দ বন্দ রোহিনীকা সুত॥"

শ্রীবৃন্দাবন দাস বলিলেন, "লোচন! তুমি নরহরির অনুগ্রহে শ্রীনিত্যানন্দ তত্ত্ব যথার্থই উপলব্ধি করিয়াছ, কারণ গৌরনিত্যানন্দকে তুমি অভেদ মূর্ত্তিতে বর্ণনা করিয়াছ। অদ্য হইতে তোমার গ্রন্থের নাম শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ও আমার শ্রীচৈতন্য মঙ্গলের নাম শ্রীচৈতন্য ভাগবত হইল।" ইত্যাদি।

আমাদের বিশ্বাস নৃসিংহ বাবুর কথিত প্রবাদটী তাঁহার নিজের কল্পিত। কারণ, নরহরি আত্মপ্রসঙ্গ বর্ণনা করতে চৈতন্যমঙ্গল লিখিতে আদেশ করেন এরূপ প্রবাদ বাঢ় দেশে কেন, কোন দেশেই আছে বলিয়া আমরা শুনি নাই। জানি না লেখকের শ্রীমুখে আরও কত অশ্রাব্য কথা শুনিতে হইবে। পুনরায় লিখিতেছেন,

"প্রেম বিলাস গ্রন্থ খানিও সেইরূপ। শ্রীখণ্ড নিবাসী শ্রীনিত্যানন্দ দাস ঐ গ্রন্থ কর্ত্তা (?)। ইনি জাতিতে বৈদ্য এবং নরহরি দাসের আত্মীয় বলিয়াই শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব হইলেও তাঁহাকে দিয়া শ্রীনরহরিদাসের দাসত্ব পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ বৈদ্যজাতি সকল অতিশয় স্বজাতি বৎসল বলিয়াই এই সকল গ্রন্থের প্রকাশ হইয়াছে, কিন্তু এই সকল গ্রন্থ অতিশয় আধুনিক। শ্রীপ্রেমবিলাস গ্রন্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের প্রায় দুই শত বৎসর পরে প্রণীত হইয়াছিল।"

ক্রমশঃ

শ্রীহরিজীবন গোস্বামী

ভক্তি

(২০শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ মাস ১৩২৮ সাল)

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥"

শ্রীনরহরি ঠাকুর প্রসঙ্গে নৃসিংহপ্রসাদের প্রবন্ধের প্রতিবাদ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এইখানেই শ্রীনৃসিংহ প্রসাদ বৈদ্যবিদ্বেষের তীব্র দংশনে অধীর হইয়া নিজের হৃদয়-দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া ফেলিয়াছেন। প্রেমবিলাস গ্রন্থ আধুনিক নহে, কারণ শ্রীনিত্যানন্দদাস বা বলরাম দাস শ্রীমতী জাহ্নবাদেবীর বা কাহারও কাহারও মতে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর মন্ত্রশিষ্য। শ্রীবৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন—

"প্রেম রসে মহামত্ত বলরাম দাস।
যাঁহার বাতাসে সব পাপ হয় নাশ॥"

নিত্যানন্দগত প্রাণ সরল হৃদয় বৈষ্ণবগণ যে স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া কোন কার্য্য করিয়াছেন ইহা অসম্ভব। শ্রীভগবান এবং শ্রীভগবৎ পার্ষদগণের মহিমা কীর্ত্তন ব্যতীত কোন ইতর উদ্দেশ্য তাঁহাদিগের হৃদয়ে স্থান পায় নাই। নৃসিংহ-প্রসাদ স্বার্থান্ধ হইয়া যাহাই বলুন তাহা তাঁহার শূন্যে নিষ্ঠীবন ত্যাগের ন্যায় বৃথা প্রয়াস মাত্র।

তিনি যাহাদিগকে বৈদ্য জাতি বলিয়া হীন মনে করিতে চাহেন, অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ হইতে কত উর্দ্ধে তাঁহারা অবস্থিত, নৃসিংহপ্রসাদের বিদ্বেষকলুষিত বুদ্ধি বোধহয় তাহা ধারণা করিতেও সমর্থ হইবে না। ব্রাহ্মণত্ব একটি গুণময় অবস্থা

মাত্র, বৈষ্ণবত্ব তাহার অনেক উর্দ্ধে স্থিত। ব্রাহ্মণের সকল সদ্‌গুণ বৈষ্ণবে অবস্থিত হইতে পারে কিন্তু বৈষ্ণবের সামান্য গুণও অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ কখনই ধারণা করিতে সমর্থ নহে। আজ তিনি যাহাদিগকে বৈদ্যজাতি বলিয়া উপেক্ষা করিতেছেন তাঁহারা অম্বষ্ঠ কুলোদ্ভব ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবাগ্রগণ্য এবং নিখিলজ্ঞানী ও ভক্ত হইতে উৎকৃষ্টতম। এই সকল নিত্যসিদ্ধ শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদগণ বৈষ্ণব বলিয়াই জগৎপূজ্য, ব্রাহ্মণ বলিয়া নহেন।

এই প্রেমবিলাস গ্রন্থকে অপ্রামাণিক বলিয়া প্রমাণ করিতে পূর্ব্বে নৃসিংহ প্রসাদ অনেক কথাই বলিয়াছেন। নিরীহ মেষশাবককে বধ করিয়া স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যাঘ্র যে ছল অবলম্বন করিয়াছিল নৃসিংহপ্রসাদও সেই ছলগুলি অবলম্বন করিয়াছেন। লেখকের মতে প্রেমবিলাস মহাপ্রভুর অপ্রকটের দুই শত বৎসর পরে প্রণীত হইলে গ্রন্থকার নিত্যানন্দ দাস মেষশাবকের ন্যায় করজোড়ে বলিতে পারেন, "হে ব্যাঘ্রদেব, আপনি যখন জানেন, ঘটনার দুইশত বৎসর পরে আমার জন্ম হইয়াছে তখন কেমন করিয়া আমি আমার স্বজাতি দ্বারা আপনার স্বজাতির অবমাননা করিলাম?" হয়ত উত্তর হইবে "তুই নহিস, তোর বৃদ্ধ প্রপিতামহ নিত্যানন্দ দাস সে-ই আমার স্বজাতি শ্রীনিবাসাচার্য্যের অবমাননা করিয়াছিল। কিন্তু তৎকালে যখন প্রেমবিলাসের জন্মই হয় নাই তখন অধিক কথার প্রয়োজন নাই।

প্রেমবিলাস গ্রন্থ মহাপ্রভুর অপ্রকটের দুই শত বৎসর পরে প্রণীত হইলে গ্রন্থকার শ্রীনিত্যানন্দ দাস কি করিয়া জাহ্নবাদেবীর শিষ্য হইতে পারেন? আমাদের মনে হয় নৃসিংহপ্রসাদ স্বকপোল কল্পিত কোন আধুনিক প্রেমবিলাস বা নিত্যানন্দদাসের কথা বলিতেছেন বৈষ্ণব জগৎ সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনবগত।

জাহ্নবাদেবীর শিষ্য এবং প্রভু নিত্যানন্দের কৃপাপাত্র সরল প্রাণ শ্রীনিত্যানন্দ দাস শ্রীমতী জাহ্নবার সহিত শ্রীবৃন্দাবনধামে গমন করিয়াছিলেন। নিত্য সমীপে অবস্থান বশতঃ স্বচক্ষে দর্শন করিয়া বীরচন্দ্রের জীবনী "বীরচন্দ্র চরিত" লিখিয়া গিয়াছেন। এই বীরচন্দ্র চরিতকে শুনিয়াছিলাম, নৃসিংহপ্রসাদ বাবুর সম্প্রদায়ের কেহ কেহ এইরূপ ভাবে অপ্রামাণিক বলিয়া চাপা দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কোন্ উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া এইরূপ বলিতেছেন তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুই বলিতে পারেন। অথবা লীলাপুষ্টির জন্য আজ পর্য্যন্তও হয় ত অনেক সময় জটিলা ও কুটিলা প্রকৃতির লোকের প্রয়োজন হইয়া থাকে। লীলাময়ের লীলারাজ্যে নিত্যই এই লীলা সংঘটিত হইতেছে।

প্রেমবিলাস গ্রন্থে শ্রীনিবাসাচার্য্যের নরহরি-দাসত্বের বর্ণনা কোথাও আমরা দেখিতে পাই নাই, তবে নৃসিংহবাবু যে অংশ উদ্ধৃত করিয়া দাসত্বের পরিচয় দেখাইতেছেন পাঠকগণও একবার আমাদের সহিত বিচার করুন ইহাকে দাসত্ব বলিতে পারা যায় কি না।

"শ্রীনিবাস নাম শুনি প্রেমাবিষ্ট হইলা।
বাহু প্রসারিয়া আসি আলিঙ্গন কৈলা॥
হাতে ধরি লইয়া গেল ঠাকুরের পাশ।
আইস আইস ওহে বাপু বৈস শ্রীনিবাস॥
দয়া করি অঙ্গেতে শ্রীহস্ত বুলাইলা।
শ্রীহস্ত পরশে অতি প্রেমাবিষ্ট হইলা॥
নিকটে আছিল নয়ান সেন মহাশয়।
ধরাধরি করি নিল আপন আলয়॥
সে দিবস তাঁর গুরু আরাধনা পিতৃবাসর।
বৈকালে রঘুনন্দন সহ গেলা তাঁর ঘর॥
এইকালে শ্রীনিবাস নরহরি দেখি।
প্রণাম করিলা, হাস্যমুখ দেখী সুখী॥"

এই স্থলে নৃসিংহ প্রসাদ বাবুর পূর্ব্বের টীকাটি পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিতে বাধ্য হইলাম। তিনি বলিতেছেন, "এই স্থানে আমার মহা সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। কারণ পূর্ব্বে শ্রীনরহরি ঠাকুর শ্রীনিবাসকে যে মর্য্যাদায় স্থাপন করিয়াছেন, এখনকার ব্যবহারে তাহা আকাশ পাতাল তফাৎ। পূর্ব্বে প্রভুপদে স্থাপন করিয়া এখন দাস হইতেও নীচ দৃষ্টিতে দেখিতেছেন—ইহার কারণ কি? শ্রীনিবাস আচার্য্য মহাপ্রভুর অংশ, কলা বা শক্তিরূপে অধিষ্ঠিত না হইলেও, তিনি ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। তথাপি প্রেমবিলাস গ্রন্থকর্ত্তা তাঁহাকে স্বজাতির কাছে অত তুচ্ছ তাচ্ছিল্যরূপে ব্যবহার করিয়াছেন কেন—তাহা কিছু বুঝা যায় না।"

"আমার মতে শ্রীনিবাসের সহিত শ্রীনরহরি ঠাকুরের সাক্ষাৎ হওয়ারই সম্ভাবনা নাই, কারণ শ্রীনিবাস শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের প্রায় একশত বৎসর পরে প্রকট হইয়াছিলেন (?)। ততদিন পর্য্যন্ত শ্রীনরহরি ঠাকুর শ্রীনিবাসকে দেখা দিবার জন্য প্রকট ছিলেন ইহা বিশ্বাস হইতে পারে না। যদি তাঁহার প্রকট থাকাই সত্য হয় তবে শ্রীনিবাসের সহিত শ্রীনরহরি ঠাকুরের

সাক্ষাৎ হওয়া ৩ শত বৎসরের অধিক কাল হওয়াই সম্ভাবনা। কিন্তু এই সময় এখনকার মত ব্রাহ্মণজাতির এত গৌরব নষ্ট হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না, এইরূপ ক্ষেত্রে এইরূপ অনুমান করা যায় যে, স্বজাতির গৌরববৃদ্ধির জন্যই প্রেমবিলাস গ্রন্থকর্ত্তা ইহা স্বকপোল কল্পিত করিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন।"

"শ্রীনরহরি ঠাকুর মহাশয় শ্রীনিবাসকে শ্রীমহাপ্রভুর শক্তিবিশিষ্ট জানা সত্ত্বেও এইরূপ দুর্ব্বিনীত ব্যবহার করিবেন ইহা কোনরূপে বিশ্বাস করা যায় না।"

ইতিপূর্ব্বে প্রেমবিলাসের যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতে শ্রীনরহরি ঠাকুর মহাশয় শ্রীনিবাসকে কোথায় দাসত্ব করাইলেন বা দাস হইতেও নীচ দৃষ্টিতে দেখিলেন বা দুর্ব্বিনীত ব্যবহার করিলেন ইহা পাঠকগণ স্থির করুন।

"দয়া করি অঙ্গেতে শ্রীহস্ত বুলাইলা"

এমন বোধ শক্তি বিবর্জ্জিত কে আছে যে, এই দয়া কথাটীর অর্থ এখানে স্নেহ বা মমতাসূচক ভিন্ন অন্য মনে করিবেন—আর বাস্তবিক দেখিতে গেলে দয়া-তেই বা দোষ কি?

ইহা ছাড়া শ্রীনিবাসের নরহরিকে প্রণামাদি করাই যদি দাসত্বের কারণ হয় তাহা হইলেও বলিতে বাধ্য হই লেখক মহাশয় যতই পক্ক বুদ্ধির ভাণ করুন না কেন, ভিতরে লাল রং ধরে নাই। সাধারণতঃ বয়ঃবৃদ্ধি প্রবীণ ব্যক্তিকে প্রণাম বন্দনা করা বিনয়াদিগুণের লক্ষণ, ইহার উপর শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয় বৈষ্ণবকুলচূড়ামণি শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিয় বৃন্দাবনের রাধাপ্রাণসখী মধুমতী। শ্রীনিবাসাচার্য্য তৎস্থলে উপমঞ্জরী মাত্র। প্রেমরাজ্যে সত্য বলিতে শ্রীনিবাসা-চার্য্যের শিক্ষাগুরু।

শ্রীনিবাস শ্রীমন্নরহরিকে প্রণাম করিয়া ঠিকই করিয়াছেন—বৈষ্ণবের উপ-যুক্ত কার্য্যই হইয়াছে—নতুবা ব্রাহ্মণ্যাভিমানবশতঃ তাহা না করিলে লেখকের মত দাম্ভিকতার পরিচয় দিতেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তৃণাদপি সুনীচেন প্রভৃতি ধর্ম্মের মূলমন্ত্র—শ্রীগৌরাঙ্গের সেই বিনয়ের ধর্ম্ম প্রেমের ধর্ম্ম জগতে প্রচার করিবার ভার লইয়া—শ্রীনিবাস প্রভৃতি পরবর্ত্তী মহাশয়গণ সেই ধর্ম্ম সর্ব্বাংশে রক্ষাই করিয়াছিলেন।

যাহা হউক এ বিষয়ে আর অধিক না বলিয়া আমরা শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর মন্ত্রশিষ্য শ্রীকর্ণপুর কবিরাজ মহাশয়ের "গুণলেশ সূচকের" একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি। ইহাতে দেখা যাইবে শুধু নরহরিকে কেন, শ্রীরঘুনন্দনের

চরণেও শ্রীনিবাস প্রণত হইয়াছিলেন এবং ইহা প্রকৃত ব্যাপার বলিয়াই—কর্ণপুর মহাশয় স্বীয় ইষ্টদেব শ্রীনিবাসের এই প্রণতি ব্যাপারও বর্ণনা করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই।

গুণলেশ সূচকে—

গচ্ছন্ যঃ পথি খণ্ডসংজ্ঞ নগরে চৈতন্যচন্দ্রপ্রিয়ং
নত্বা শ্রীসরকারঠক্কুরবরং নীত্বা তদাজ্ঞাং তথা।
তৎপশ্চাদ্রঘুনন্দনস্য চরণং নত্বা গতো যত্তরন্
সোঽয়ং মে করুণানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ॥

শুধু ইহাই নহে, শ্রীনিবাসের নিজকৃত নরহরি অষ্টক যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন শ্রীনিবাস শ্রীনরহরিকে কিরূপ চক্ষে দেখিতেন।

যথা—

প্রেমাধারং মধুর বিকারং
শ্রীচৈতন্যাঙ্ঘ্রি জলজসারম্।
শ্রীখণ্ডাখ্যে বিহিত নিবাসং
বন্দে শ্রীল নরহরি দাসম্॥

যস্যোৎসঙ্গে নিহিত নিজাঙ্গো
গৌরাঙ্গোঽভূৎ পৃথু পুলকাঙ্গ।
তং প্রাণস্থং বিহিত বিলাসং
বন্দে শ্রীল নরহরি দাসম্॥

বৃন্দারণ্যে ব্রজ রমণীনাং
মধ্যে খ্যাতা হি মধুমতী যা।
তং শ্রীগৌরপ্রিয়তমশেষং
বন্দে শ্রীল নরহরি দাসম্॥ ইত্যাদি।

বৈষ্ণবজগতে জাতিকুল বিচার নাই। সমগ্র বৈষ্ণবশাস্ত্র মুক্তকণ্ঠে পুনঃ পুনঃ একথা বলিতেছেন।

"বিপ্রাদ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ।
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম॥"
"দ্বাদশ গুণযুক্ত বিপ্র শ্রীচরণে বিরূপ।
শ্বপচ হইতে নীচ শাস্ত্র অনুরূপ॥"

বৈষ্ণব দেখিয়া যেবা জাতি বুদ্ধি করে।
তাহার সমান পাপী নাহিক সংসারে॥
নরকে তাহার বাস জানিহ নিশ্চয়।
ফুকারি ফুকারি ইহা সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥”

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি প্রেমবিলাসকার যাহা সত্য বলিয়া জানিতেন তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন এবং শ্রীলোচনদাস ঠাকুরও অতিরঞ্জিত বা মিথ্যা লিপিবদ্ধ করেন নাই একথা নিজেরাই বলিয়াছেন। যদি তাহা না হইত তবে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ঠাকুরাণীর অনুমোদিত শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থের বা প্রেমবিলাস গ্রন্থের বৈষ্ণবজগতে এত সম্মান বা পবিত্রতা আজ পর্য্যন্তও অক্ষয় অটুট থাকিত না। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীজীবগোস্বামী প্রমুখ মহানুভব সর্ব্বতত্ত্ববেত্তা বৈষ্ণবাচার্য্যগণ লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলে অসত্য ঘটনার সমাবেশ দেখিলে কখনই আদর করিতেন না বা এইজন্য শ্রীচৈতন্য ভাগবতের নামকরণও প্রয়োজন হইত না।

প্রেমবিলাস তৎসমসাময়িক ঘটনাপূর্ণ বৈষ্ণব ইতিহাস। হায়। যদি তাঁহারা কৃপা করিয়া আমাদের মত হতভাগ্য অবিশ্বাসী জীবগণের উদ্ধারের নিমিত্তএই সমস্ত গ্রন্থ না লিখিতেন তবে আমরা শ্রীনিবাস-আচার্য্যের, প্রভু বীরভদ্রের বা শ্রীমন্নিত্যানন্দের পরবর্ত্তী বৈষ্ণব মহাত্মাগণের বা নরোত্তম, রামচন্দ্র ও শ্রীরঘুনন্দন প্রভৃতি বৈষ্ণবগণের বৃত্তান্ত কতটুকু জানিতে পারিতাম। শ্রীবৃন্দাবন দাসঠাকুরের অসম্পূর্ণ চৈতন্য লীলা বর্ণনব্যতীত সম্পূর্ণ গৌরাঙ্গলীলা অবগতির জন্য আজ আমরা একমাত্র অম্বষ্ঠ কুলোদ্ভব শ্রীকবিকর্ণপুর, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীমুরারি গুপ্ত শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর, শ্রীলোচনদাস ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ দাস, শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ প্রভৃতি মহানুভবগণের নিকটেই সমধিক ঋণী। শ্রীল রূপ সনাতন প্রভৃতি আচার্য্যগণ ব্রজলীলা এবং বৈষ্ণব দর্শন প্রভৃতি বর্ণনাতেই নিযুক্ত ছিলেন সুতরাং গৌরাঙ্গলীলা আমরা ইঁহাদের নিকট পাই নাই।

হায়। স্বার্থান্ধ লেখক কোন্ স্বার্থসিদ্ধির জন্য বৈষ্ণববেশে এত অসত্যের অবতারণা করিতেছ, যাহাতে শ্রীনিবাসাচার্য্যকে মহাপ্রভুর অপ্রকটের একশত বৎসর পরে অবতীর্ণ করাইলে? যদি তাহাই হইত তবে বৃন্দাবনে ছয় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর (১৫০০ শকে অপ্রকট) নিকট শ্রীনিবাসের দীক্ষা গ্রহণ কেমন করিয়া সম্ভব হয়? এবং কেমন করিয়াই বা শ্রীজীব গোস্বামী প্রেরিত গ্রন্থরাজি গোস্বামীগণের জীবদ্দশাতে বীর হাম্বীর কর্ত্তৃক অপহৃত হয়।

পুনরায় ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থকে আধুনিক করিয়া নিজমত ঠিক রাখিতে ১৩০ বৎসর বয়স্ক করিয়াছেন। প্রথম যুক্তি হইতেছে "যেহেতু ভক্তিরত্নাকর প্রণেতার জন্মভূমি মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুরের নিকট পানিশালা গ্রাম।" দ্বিতীয়তঃ "অত্রস্থ, বহরমপুর সাকিনের শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্র নারায়ণ মৈত্র মহাশয়ের পিতা ৺আনন্দ ভাগবতভূষণ মহাশয় ভক্তিরত্নাকর প্রণেতা শ্রীনরহরি দাসের জীবনী লিখিয়াছেন; তজ্জন্যই বোধ হয় নরহরি দাস অধিক দিনের লোক নহেন।

আহা কি চমৎকার যুক্তি। একেবারে সঙ্গে সঙ্গেই অনুমান ও উপলব্ধি যেন মূর্ত্তিমান ইউক্লিড্। যেহেতু আনন্দভূষণ মৈত্র মহাশয় অধিক দিনের লোক নহেন এবং তিনি যখন নরহরির জীবনী লিখিয়াছেন—সুতরাং নরহরিও আধুনিক। তাহা হইলে শ্রীযুক্ত শিশির কুমার ঘোষ মহাশয় "অমিয় নিমাই চরিত" লিখিয়াছেন বলিয়া তিনিই বা শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর সমসাময়িক কেন না হইবেন বা মহাপ্রভুই কেন না আধুনিক হইবেন? "অত্রস্থ" কথা হইতে যিনি এতটা পর্য্যন্ত অর্থ টানিয়া বাহির করিতে পারেন সকলই তাঁহার সাধ্য।

শ্রীচৈতন্য ভাগবতও শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর শুনিয়া লিখিয়াছিলেন। এবং শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতও কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভৃতির মুখে শুনিয়া লিখিয়াছেন—সুতরাং নরহরি দাসও যে ভক্তিরত্নাকর ঐরূপ শুনিয়া বর্ণন করিয়াছেন ও লিখিয়াছেন, তাই বলিয়াই কি প্রমাণ হইল যে উহা ১৩০ বৎসরের গ্রন্থ। যুক্তিপূর্ণ কথা বটে।

যে গৌরাঙ্গ পার্ষদগণ "ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে" সেই শ্রীনরহরি প্রভৃতির প্রতি দুর্ব্বিনীত ভাষাপ্রয়োগ কতদূর নিন্দনীয় তাহা পাঠকগণই অনুভব করিতেছেন। লেখক শ্রীনৃসিংহ প্রসাদ গোস্বামী যতই জল ঘোলা করিতে চেষ্টা করুন উপরের জল—বৈষ্ণব জগৎ নির্ম্মল ও স্থির আছে। লেখকের হৃদয় গৃহে অগ্নি লাগিয়াছে—টানিয়া বাহির করিয়া যাহা বাঁচাইতে পারেন এখন সেই চেষ্টাই প্রথম দেখিতেছি। নতুবা নরহরি-সঙ্কট হইতে পরিত্রাণের অন্য উপায় নাই। শ্রীনিবাসাচার্য্যকে মহাপ্রভুর অপ্রকটের ১০০ বৎসর পরে টানিয়া আনিয়াছেন, প্রেমবিলাসকে দুইশত বৎসর পশ্চাৎবর্ত্তী করিয়াছেন সকল গ্রন্থই আধুনিক ও অপ্রামাণ্য বা বাজে বলিতে ভীত হয়েন নাই। এখন শ্রীনিবাসাচার্য্যের দীক্ষাগুরু ছয় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীকে তাহা হইলে ব্রজভূমি হইতে উড়াইতে হইবে। যজ্ঞগৃহে ইন্দ্রজিতের অবস্থা—সপ্তরথী সপ্ত দিক হইতে নরহরি নরহরি টঙ্কার করিতেছে এখন অস্ত্রাভাবে

কোষাকুষি শঙ্খঘণ্টা ছাই ভস্ম প্রক্ষেপ অথবা পলাইয়া প্রাণরক্ষা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। বিষ্ণুচক্র দুর্ব্বাসার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছিল—অম্বরীষের ন্যায় এখন নৃসিংহপ্রসাদের শ্রীনরহরি পদাম্বুজ শরণ ভিন্ন নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।—

শ্রীহরিজীবন গোস্বামী

জীবন-সঙ্গিনী

জীবন কোনও এক ধনাঢ্য সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণের একমাত্র পুত্র। বয়ঃক্রম অনুমান পঁচিশ বৎসর। সে বাল্যকাল হইতেই সংসারে নির্লিপ্ত; কিন্তু বিদ্যাভ্যাস ও গুরুজনগণের আদেশ প্রতিপালনে অতিশয় তৎপর। আঠারো বৎসরের পূর্ব্বেই জীবন দেশ প্রচলিত সকল বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করে। প্রত্যেক পরীক্ষাতেই সে বিশেষ প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া, বিনয়, নম্র ও সুশীলতাদি গুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। অতি অল্পকালের মধ্যেই তাহার বিদ্যা, বুদ্ধি ও সৎগুণ সমূহের খ্যাতি চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই সমস্ত গুণে আকৃষ্ট হইয়া বহুদেশ হইতে বহু বহু কুবের সদৃশ ধনবান ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ জীবনকে নিজ নিজ গুণবতী সুন্দরী কন্যা সম্প্রদান করিবার মানসে তাহার পিতার সহিত বৈবাহিক প্রস্তাবের সূচনা করে। জীবনের পিতাও জীবনের বাল্যকাল হইতে সংসারে নির্লিপ্তভাব অবলোকন করিয়া পাছে সে সংসারত্যাগ করিয়া উদাসীন হয়, এই ভয়ে শীঘ্রই উহাকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিবার কল্পনায় যত্নবান হন। জীবনের বয়স্যদিগের দ্বারা বিবাহ সম্বন্ধে মনোগত ভাব জানিতে ইচ্ছুক হইলে তাহারা বলে যে, জীবন সংসারে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছুক নহে; কিন্তু সংসার মোচনের প্রকৃত সহায়কারিণী সহধর্ম্মিণী প্রাপ্ত হইলে তাহার বিবাহ করিতে কোন আপত্তি নাই। অতএব যে কোন স্থানেই সম্বন্ধ স্থির করা হউক না কেন, পাত্রী পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাকে যেন অনুমতি দেওয়া হয়। জীবনের পিতা জীবনের মনোগত ভাব অনুমোদন করিয়া বিবাহের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। জীবনও এই সময়ে মাসিক দুইশত পঞ্চাশ টাকা বেতনে এক রাজকর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত হইল।

জীবনের পিতা প্রায় শতাধিক স্থানে নয়ন মনোহরা পাত্রী স্থির করিয়া, পরীক্ষার নিমিত্ত জীবনের বয়স্যদিগের দ্বারা তাহাকে জানাইলেন। জীবনও পরীক্ষার প্রশ্ন সুচতুরা বাহিকা দ্বারা লিপি মধ্যে প্রেরণ করিতে লাগিল। তিন

চারি বৎসর ধরিয়া এইরূপ পরীক্ষা চলিতে লাগিল। প্রশ্নের উত্তর বহু স্থান হইতে আসিল, কিন্তু কোনটীই প্রকৃত উত্তর বলিয়া জীবনের মনোনীত হইল না। দূরদেশ বলিয়া একটী স্থান অবশিষ্ট ছিল; সে স্থানেও ঐরূপ ভাবে প্রশ্ন পাঠান হইল। প্রশ্নের উত্তর এইবার ঠিক হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল; কারণ এই স্থানেই জীবনের বিবাহ স্থির হইয়া গেল। আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশী প্রতিবেশিনী সকলেরই আনন্দের আর সীমা রহিল না। আমোদ আহ্লাদও যাহাতে সীমা অতিক্রম করিয়া গড়াইয়া যায়, তাহার জন্য প্রস্তাব ও অনুরোধ, উপরোধাদি চলিতে লাগিল।

সংসারে অল্পবিস্তর পরিমাণে এমন লোক সকল স্থানেই আছে যাহাদের অন্তর নিরন্তর পরশ্রীকাতরতায় পরিপূর্ণ; কিন্তু বাহ্যিক আত্মীয়তা ও হিতৈষিতায় লোককে মুগ্ধ ও বশীভূত করিতে এমন পটু যে, যাঁহারা সরল প্রকৃতির লোক, তাঁহারা সহজেই তাহাদের পরামর্শ ও অভিসন্ধি অনুযায়িক চলিতে চলিতে নিতান্তই বাধ্য হইয়া পড়েন। জীবনের সরল স্বভাব পিতাও ঐ প্রকার হিতৈষী মহাত্মাগণের বিধি ব্যবস্থা অনুসারে পুত্রনিধির বিবাহবিধি সম্পাদনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ সরল স্বভাব, বিশেষতঃ সাধ আহ্লাদটাই বুঝেন ভাল। আয়, ব্যয় ও স্থিতির দিকে লক্ষ্য মোটেই থাকে না। সুতরাং জীবনের মাতাও স্বামী যাহা করেন তাহাই শিরোধার্য্যজ্ঞানে হিতৈষী আত্মীয়গণের পরামর্শে পরিচালিত পতির মতেরই অনুগামিনী হইলেন। অর্থাৎ পুত্রের বিবাহে দান ভোজন, আমোদ আহ্লাদ ও তত্ত্ব তল্লাসাদি যাহাতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও চূড়ান্ত হয়, তাহারই ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত হইলেন। জীবন কিন্তু এই সমস্ত ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিরোধী। সে সাধ্যমত পিতা মাতাকে যতদূর বুঝাইতে হয় বুঝাইল এবং ঐ পরশ্রীকাতর হিতৈষীগণের অভিসন্ধি ও উহার পরিণাম ফল প্রকৃষ্টরূপে উহাদের হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য বিবিধ প্রকারের উপায় উদ্ভাবন করিয়াও যখন কৃতকার্য্য হইতে পারিল না, তখন—"বেহা-বেহা সবকোই কহে, মেরা মনমে এহি ভায়ে। চড় খাটোলি ধো ধো লগ্ড়া, জেহেল পর লে যাওয়ে॥" অর্থাৎ সকলেই হর্ষে বিবাহ বিবাহ বলে, কিন্তু যখন পাত্রকে চৌদোলায় চড়াইয়া বাজনা বাজাইতে বাজাইতে লইয়া যায়, তখন আমার মনে এইরূপ ভাবের উদয় হয়, যেন এই ব্যক্তিকে আজন্ম আবদ্ধ করিবার জন্য প্রথম কারাগারেরঞ্চলে যাইতেছে। মহাত্মা তুলসীদাসের এই সারগর্ভ উপদেশবার্ত্তা শুনাইয়া, রবির হইরনরিব বলিয়া উহাদিগকে ভীতি প্র দর্শন করাইতে লাগিল অবশ্য হোইক

জীবনের পিতা মাতা ভয় প্রযুক্ত ব্যয়ের পরিমাণ ন্যূন করিতে তাহার নিকট স্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু আনন্দের প্রবল বেগ রোধ করিতে অসমর্থ হওয়ায় "জীবনকে গোপন ক'রয়া করিব" এই ভাব মনে মনে রাখিয়া দিলেন। জীবনের বিবাহ উভয় পক্ষ হইতেই স্থিরীকৃত হইল। কন্যাপক্ষ হইতে পাত্র ও পাত্রের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত শুল্ক লইবার সর্ব্বস্বান্তকর এক ভীষণ প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু জীবন ঐ কুপ্রথা রহিত করিবার নিমিত্ত পিতাকে অতি বিনীত ভাবে শুল্ক গ্রহণ করা যে বিধিবিরুদ্ধ তাহা বিশেষরূপে বুঝাইয়া কন্যাকর্ত্তাকে শুল্কভার হইতে অব্যাহতি দেওয়াইল। কন্যাকর্ত্তা সঙ্গতিহীন লোক নহেন, তিনি ঐ শুল্ক বাবদের অর্থ বর সজ্জাদিতে পূরণ করিয়া দিতে মনস্থ করিলেন।

বিবাহ দূর দেশস্থ এক পল্লীগ্রামে। তথায় রেলে যাইতে হয়, ষ্টেশন হইতে বিবাহের স্থান প্রায় তিন ক্রোশ ব্যবধান। ঐ ব্যবধান স্থানের পথ পার্শ্বদ্বয় বিবিধ প্রকারের আলোক, বাদ্য ও আতসবাজীর ধুমধামে সুসজ্জিত এবং বর ও বর-যাত্রীগণের শ্রান্তি ও ক্ষুৎপিপাসাদি নিবারণার্থ ঐ ষ্টেশনের নিকটই একটি সুবিস্তৃত ও সুসজ্জিত বিশ্রামাগার, জীবনের পিতা অতি যত্নে ও বহু অর্থ ব্যয়ে নির্ম্মিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। বলাবাহুল্য এ সমস্ত জীবনের অজ্ঞাতসারেই হইয়াছিল।

বিবাহের দিন বর ও বরপক্ষীয় ব্যক্তিবর্গ বেলা ১ টার সময় রেলে আরোহণ করিলেন। বহুস্থান অতিক্রম করিয়া বেলা প্রায় একটার সময় যখন গাড়ী একটা ষ্টেশনে উপস্থিত হইল, তখন জীবনের কোন একটী বয়স্য তাঁহার ঘড়ীর সময় মিলাইবার জন্য গাড়ীর প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তিকেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—"মহাশয়। আপনার ঘঁড়ীতে সময় কত? এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতে করিতে মনে পড়িল বরের নিকট বহু মূল্যের ভাল ঘড়ি আছে। যেমন মনে হওয়া অমনি বরকে জিজ্ঞাসা করা "জীবনের কত সময়?" অর্থাৎ জীবন তোমার ঘড়ীতে কত সময়? জীবন ভাবুক লোক। সাংসারিক ব্যাপার তাহার চক্ষে শূন্যবৎ বোধ হয়। বয়স্যের মুখে অকস্মাৎ "জীবনের কত সময়" এই ভাবপূর্ণ প্রশ্ন শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন ও ভাবে গদগদ হইয়া পড়িল এবং ভাবিতে লাগিল ইনি কি জগৎগুরু! বয়স্যরূপে আবির্ভূত হইয়া আমার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। যাহা হউক আকস্মিক ভাব ও নেত্রাগত ভাবাশ্রু মুহূর্ত্ত মধ্যেই সংবরণ করিয়া তাহার বয়স্যের প্রশ্নের উত্তর দানে প্রবৃত্ত

হইল। অতি মৃদু ও মধুর স্বরে কহিল "জীবনের কত সময়" তাহা আমি জানি না, সুতরাং বলিতে পারিলাম না। আপনি যদ্যপি অনুগ্রহ করিয়া আমার জীবনের কত সময় অতীত হইয়াছে ও কত সময় অবশিষ্ট আছে বলিয়া দেন তাহা হইলে বিশেষ উপকৃত হই এবং আপনাকে প্রকৃত উপদেষ্টা বলিয়া জ্ঞান করি। অতএব অনুগ্রহ করিয়া বলুন জীবনের সময় কত।

জীবনের বয়স্য জীবনের এই সমস্ত তত্ত্বপূর্ণ বাক্যে মনোযোগ না দিয়া, তাহার পকেট হইতে ঘড়িটী তুলিয়া লইয়া সময় দেখিয়া লইলেন ও নিজের ঘড়িটী মিলাইয়া জীবনের ঘড়ি জীবনের পকেটে ও নিজের ঘড়ি নিজের পকেটে রাখিয়া দিলেন। তদনন্তর ঈষৎ হাস্য সহকারে নর্ম্ম বাক্যে জীবনের কথা ও ভাবকে আবরণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। জীবন কিন্তু বয়স্যের নর্ম্ম বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া জীবনের পরিণাম কি হইবে কেবল তাহাই ভাবিতে লাগিল।

ক্রমশঃ সন্ধ্যা আগত প্রায় হইল। দেখিতে দেখিতে বাষ্পীয় যানও নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া পৌঁছিল। বর ও বরযাত্রীগণ যান পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্দ্ধারিত বিশ্রামাগারে প্রবেশ করিলেন। বরযাত্রীগণ স্ব স্ব অভিলষিত স্থানে উপবেশন পূর্ব্বক শ্রান্তি দূর করণানন্তর ইপ্সিত ভোজন পানাদি দ্বারা ক্ষুৎ পিপাসা নিবারন করিতে ব্যস্ত হইলেন। জীবন ইত্যবসরে সুযোগ পাইয়া, সকলের অজ্ঞাতসারে ঐ বিশ্রামাগার পরিত্যাগ করিল।

এদিকে ষ্টেশন হইতে বিবাহের স্থান পর্য্যন্ত সুসজ্জিত বর্ত্মের দুই পার্শ্ব বিবিধ প্রকারের আলোকে আলোকিত করা হইল। বাদ্য যন্ত্রাদি বাদিত করিবার উপক্রম হইতে লাগিল। পথি পার্শ্বে স্থাপিত আতস বাজীতে অগ্নি সংযোগ করিবার আদেশ প্রচার হইল। সুশোভিত ও মনোহর আলোকদাম-বিরাজিত বরমঞ্চ বিশ্রামাগারের সম্মুখ ভাগে স্থাপিত হইল এবং বরযাত্রীগণের যাইবার জন্য যান সমূহ শ্রেণীবদ্ধ করা হইল। ব্যবস্থা ও বন্দোবস্তের কোন ত্রুটীই লক্ষিত হইল না। পরন্তু বর কোথায়? "বর কোথায়" "বর কোথায়" এই কোলাহলের সহিত বিশ্রামাগার ও ষ্টেশনের চারিদিকে বহুলোক আলোক হস্তে লইয়া সতর্কতা সহকারে অনুসন্ধান করিতে লাগিল। প্রায় দুই ঘণ্টা ধরিয়া ঐরূপ অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। ক্রমেই হৈ চৈ ও সকলের চিত্ত-চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বরকে অনুসন্ধানে পাওয়া যাইতেছে না; এই ভীষণ ও হৃদয় বিদারক সংবাদ ক্রমশঃ কন্যাকর্ত্তার নিকট পৌঁছিল। কন্যাকর্ত্তার

নিকট হইতে কন্যাকর্ত্তার অন্তঃপুরে; অন্তঃপুর হইতে মৃদু মৃদু স্বরে কন্যার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল, তখন কুলিশ-পাতের কঠোর ধ্বনিতে যেমন জীবের জীবন সংজ্ঞা বিহীন হয়; তদ্রূপ কন্যার জীবনও ক্ষণে ক্ষণে সংজ্ঞা বিহীন হইতে লাগিল। তখন সে ভাবিতে লাগিল—জীবন বহির্গত হইলেই ত দেহ শবে পরিণত হয়। আমার জীবনাপেক্ষাও প্রিয় "জীবন" যখন আমায় ঘৃণা করিয়া বহির্গত হইয়াছে, তখন এই শবের ন্যায় দেহকে গৃহে রাখিয়া কুলটার ন্যায় অন্য পুরুষকে গ্রহণ করিবার আর আবশ্যক কি; আজ জীবনের যে গতি, জীবন-সঙ্গিনীরও সেই গতি। সদাগতি যেমন পবন ছাড়া কখনই থাকিতে পারে না, আজ সঙ্গিনীও সেইরূপ "জীবন" ছাড়া কখনই থাকিতে পারিবেনা এই ভাবিয়া, দুঃসংবাদ ঘোষণায় স্ব স্ব ব্যস্ত ও অন্যমনস্ক স্বজনগণের অলক্ষিত ভাবে অলঙ্কারাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক একবসনা হইয়া ভাবী জীবন-সঙ্গিনী কক্ষান্তরে প্রবেশ করিল। তথা হইতে জীবনের হস্তাক্ষর লিখিত প্রশ্ন লিপিখানিকে অবলম্বন জ্ঞানে নিজ কুন্তল-করবী মধ্যে অতিযত্নে স্থাপন পূর্ব্বক অতি গোপনে গোপন-দ্বার দিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইল।

হর্ষ ও বিষাদের ভীষণ সংঘর্ষণ সম্ভূত প্রবল দুঃখানলে বরের পিতা ও কন্যার পিতা উভয়েই দগ্ধ হইয়া বক্ষ ও মস্তক তাড়ন করিতে করিতে এককালে জীবনহীন শবের ন্যায় হইয়া পড়িলেন। আত্মীয় স্বজনগণ যাহারা নিকটে ছিলেন—ব্যজন ও জল সিঞ্চনদ্বারা উহাদের শুশ্রূষায় নিযুক্ত রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে কন্যার পিতা কিঞ্চিৎ চৈতন্য লাভ করিয়া জাতিকুল রক্ষার নিমিত্ত অর্থাৎ কেমন করিয়া কন্যাকে এই রজনী মধ্যেই অপর একটি সৎপাত্রে সম্প্রদান করিতে সক্ষম হইবেন তাহাই গভীর গবেষণার সহিত চিন্তা করিতে লাগিলেন। ইহা ব্যতিত আরও একটি বিশেষ চিন্তার বিষয় হইল এই যে, বহুদূর-দেশ হইতে আগত বরযাত্রী সমূহকে ও জীবনের শোক সন্তপ্ত পিতাকে নিজ বাটীতে আনাইয়া, তাহাদিগের ভোজনার্থ প্রস্তুত দ্রব্য সামগ্রী তাহাদিগকে নিবেদন পূর্ব্বক কেমন করিয়া কৃতার্থ হইবেন। তিনি তাঁহার এই মনোগত ভাব সমাগত বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য ভদ্রমহোদয়গণের নিকট প্রকাশ করিলে পর; কতিপয় দক্ষ ব্যক্তি জীবনের পিতাকে ও বরযাত্রী সমূহকে অতি সমাদরের সহিত আনয়নার্থ কৃতসংকল্প হইয়া ষ্টেশনাভিমুখে যানারোহণে যাত্রা করিলেন

সেই রজনী মধ্যে কন্যার বিবাহ ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ মণ্ডলী কন্যার পিতাকে কহিলেন—"আপনার কন্যা নিতান্ত বালিকা নহে, বিদ্যা, গুণ ও

শীলতাতেও সাধারণ কন্যাগণের ন্যায় অজ্ঞান সম্পন্না নহে। সর্ব্বগুণে গুণবতী ও অতি বুদ্ধিমতী। অতএব পাত্রান্তরে বিবাহ স্থির করিবার পূর্ব্বে তাহার সম্মতি গ্রহণ করা আবশ্যক। কারণ যাহার সুখ স্বচ্ছন্দতার দিকে লক্ষ রাখিয়া পিতা অকাতরে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া ও প্রাণপন কষ্ট স্বীকার করিয়া সৎ-পাত্রের অনুসন্ধান করিয়াছেন, উপস্থিত ব্যাপারে সেই কন্যার অমতে পাত্রান্তর স্থির করিয়া শুভ বিবাহ সম্পন্ন করিলে যদি কন্যার মনোনীত না হয়, তাহা হইলে এই শুভ কার্য্য যে কি অশুভ ফল প্রদান করিবে ও তাহার পরিণাম যে কতদূর শোচনীয় হইয়া উঠিবে, তাহা প্রকাশ করিয়া বলা যায় না। অত-এব তাহার (কন্যার) অভিন্নভাবাপন্না সঙ্গিনী কোন বালিকা যদ্যপি থাকে, তবে তাহার দ্বারা গৃহিনীদিগের উপদেশানুসারে আপনার কন্যার মনের ভাবগ্রহণ করুন। অন্য পাত্রের অভিলাষিনী হইলে, পাত্রের অভাবনাই। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পাত্র স্থির করিয়া শুভকার্য্য সম্পাদন করা যাইবে। তজ্জন্য কোন চিন্তা নাই।

এ স্থলে আর যে একটি ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল তাহা উল্লেখ যোগ্য না হইলেও কেবল ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার জন্য অতৃপ্ত সংসার বাসনা ও বহু অর্থ সত্ত্বেও অর্থলোলুপতার পরিচায়ক বলিয়া সংক্ষেপে ঘটনাটী বর্ণনা করিতে বাধ্য হইলাম। ঘটনাটী এইযে, উপস্থিত বিবাহের পাত্র প্রস্থান করিয়াছে শুনিয়া সপ্ততি বৎসরের একটি বৃদ্ধ পঞ্চমবার দার পরিগ্রহার্থ ঐ কন্যাটীর পানিগ্রহণ লালসায় ঐ বিবাহের জনৈক কর্ত্তৃপক্ষকে সহস্র মুদ্রা উৎকোচ প্রদান করিয়া এক ষড়যন্ত্র করেন। ষড়যন্ত্রকারীদিগের নেতা ঐ কর্ত্তৃপক্ষ কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় কন্যার পিতাকে কৌশল জালে আবদ্ধ করিয়া, জাতি কুল রক্ষার্থ, ঐ পাত্রেই কন্যা সম্প্রদান করিতে সম্মত করান। সুতরাং বরও বর সজ্জায় সজ্জিত হইয়া ঐ পাত্রীর পাণিগ্রহণ মানসে বিবাহস্থলে আগমন করেন। কিন্তু পরে পাত্রীকে পাওয়া যাইতেছে না শুনিয়া উচ্চাশায় জলাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক লজ্জায় মস্তক নত করিয়া বিবাহ সভা হইতে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন। তদনন্তর ঐ বৃদ্ধটি উৎকোচ গ্রহণ কারীর নামে ঐ টাকা ও মানহানির দাবীতে বিচারালয়ে এক অভিযোগ আনয়ন করেন। বিচার পতি প্রমাণাদি দ্বারা উভয়েরই ধৃষ্ট স্বভাবের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া স্বভাব পরিবর্ত্তনের জন্য এক বৎসরের সময় দিয়া উভয়েই স্বাক্ষর লইয়া উভয়কেব পৃথক্ পথক্ করার পত্রে আবদ্ধ করেন আর উৎ-

কোচের টাকা দারিদ্র-দুঃখ দূর করনের অভিলাষে দরিদ্র ভাণ্ডারের হিসাব ভুক্ত করিয়া দেন। বলা বাহুল্য এই অভিযোগ সূত্রে উহাদের উভয়কেই অপমান ও লাঞ্ছনা যথেষ্ট পরিমানেই ভোগ করিতে হইয়াছিল। আর ঐ দৃষ্টান্তে ঐ শ্রেণীর অনেকের শিক্ষাও হইয়া ছিল।

এদিকে কন্যার পিতা অন্তঃপুরে গিয়া সঙ্গিনী প্রেরণ করিয়া কন্যার মতামত জানিবার জন্য অপেক্ষা করিতে ছিলেন। সঙ্গিনী অন্তঃপুর মধ্যে তাহার অনুসন্ধান না পাইয়া উহার পিতামাতাকে জানাইলেন যে, "কন্যা অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিয়াছে" ক্রমশঃ সকলেই যত্নসহকারে অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিল। বহুক্ষণ অনুসন্ধানের পর বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি কন্যার ক্রীড়া গৃহের একটী নিভৃত স্থানে দেখিতে পাইলেন। ইহাতে সকলেই অনুমান করিলেন যে, কন্যাটী তাহার শুভ পরিণয়ের অশুভ সংবাদ শ্রবণ করিয়া নিশ্চয়ই 'জীবনের' জন্য জীবনে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছে। কন্যার পিতা শোকে উন্মত্তের ন্যায় হইয়া কেবল বক্ষে ও ললাটে করাঘাত করিতে লাগিলেন আত্মিয়গণের যত্নে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে পর কন্যার পিতা কাঁদিতে কাঁদিতে বাহিরে আসিলেন। বাহিরে আসিলে সকলেই তাহাকে সুমধুর প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। এবং কন্যার অনুসন্ধানর্থ চারিদিকেই উপযুক্ত লোক সকল প্রেরণ করিলেন। প্রেরিত লোক বহুদূর পর্য্যন্ত বন, উপবন, পথ, ঘাট ও গুপ্ত স্থানাদি বিস্তর যত্নে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। নিকটস্থ পুষ্করিণী সমূহও জালাকর্ষণাদি দ্বারা আলোড়িত করা হইল; কিন্তু কিছুতেই সন্ধান মিলিল না। তখন অন্য একদল লোক স্থানীয় থানায় সংবাদ প্রদান করিল, থানাধ্যক্ষ সমস্ত বিবরণ থানার নির্দ্দিষ্ট পুস্তকে নিয়মানুসারে লিখিয়া লইয়া, দুইজন সুদক্ষ শান্তি রক্ষককে বিশেষ রূপ অনুসন্ধানের ভারার্পণ করিয়া বলিয়াদিলেন যে, এই রজনী মধ্যেই আমি তদন্তের ফলাফল জানিতে ইচ্ছা করি। ইহার অন্যথা হইলে, উচ্চ কর্ম্মচারীর নিকট কর্ত্তব্যকার্য্যের ত্রুটী জানাইয়া আবেদন করিতে বাধ্য হইব। এই বলিয়া উহাদিগকে বিদায় দিয়া তাহার এলাকার অন্যান্য থানায় অনুসন্ধানার্থ বিশেষ বিবরণ সহ বিজ্ঞাপন প্রহরীগণ দ্বারা পাঠাইতে লাগিলেন। ইত্যবসরে ষ্টেশনের নিকটস্থ থানা হইতে একখানা বিজ্ঞাপন আসিয়া উপস্থিত হইল। বিজ্ঞাপনের মর্ম্ম এই যে, "এই পাত্রীর পাত্রও ষ্টেশন হইতে কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়াছেন বিশেষ অনুসন্ধান আবশ্যক।" এইরূপ ঐ রাত্রি হইতেই চারিদিকে

তুমুল তদন্তের ঘটা বিবাহের মহতী ঘটাকে পরাস্ত করিয়া চলিতে লাগিল। গুপ্ত অনুসন্ধান ও বিশেষ দক্ষতার সহিত পরিচালন জন্য অনেক সুদক্ষ লোকের উপর থানাধ্যক্ষগণ ভার অর্পণ করিলেন।

এদিকে কন্যার পিতার প্রেরিত লোক ঘোরতর বিষাদ-মণ্ডিত জীবনের পিতা ও বরযাত্রীগণকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া সম্মানের সহিত কন্যাকর্ত্তার গৃহে আনয়ন করিলেন। উহারা যখন আসিয়া পৌছিলেন তখন কন্যার পিতা অতি কষ্টে, উহাদিগকে দর্শন জনিত নবজাত প্রবল শোকবেগ, সংবরণ করিয়া জীবনের পিতাকে নমস্কার ও আলিঙ্গন পূর্ব্বক বিষাদ বাক্যে কন্যার নিরুদ্দেশ বার্ত্তা ঘোষণা করিলে জীবনের পিতা ও উপস্থিত বরযাত্রীগণ সকলকেই যার পর নাই দুঃখিত হৃদয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক যথেষ্ট বিলাপ ও অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দুইপক্ষেরই দুঃসহ দুঃখ বার্ত্তা চলিতে লাগিল। রজনী প্রায় শেষ হইয়াছে এমন সময়ে আহারের বিপুল আয়োজন পত্রে পাত্রে পরিবেশিত হইল, সকলেই দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন—আহা। আজ কি আশা তরুই উন্মুলিত হইল ! কি আনন্দই নিরানন্দে পর্য্যবসিত হইল ॥ এইরূপ দুঃখ করিতে করিতে উভয় পক্ষের সকলেই অতি বিষাদের সহিত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভোজন করিয়া উঠিলেন ও আচমনান্তে আবার ঐ দুঃখের কথা তুলিয়া অতিদুঃখে ও কষ্টে রজনীর অবশিষ্টভাগ যাপন করিলেন। জীবনের পিতা মিষ্টান্ন পাত্র স্পর্শ করিয়া রোদন করিতে করিতে কন্যার পিতার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন—মহাশয়। আমি পুত্রের বিবাহ দিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু বিবাহের লগ্ন ও রজনী পর্য্যন্ত শেষ হইয়া গেল, তথাপি আপনাকে আমি একবারও বৈবাহিক বলিয়া সম্বোধন করিতে পারিলাম না এবং আপনিও আমাকে একবারও বৈবাহিক বলিয়া সম্বোধন করিতে পারিলেন না. ইহা কি আমাদের অল্প পরিতাপের বিষয় ! এখন, জীবনকে বিসর্জ্জন দিয়া কেমন করিয়া এই জীবন হীন দেহ লইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিব আমাকে তাহা বলিয়া দিন। পুত্র ও পুত্রবধূ উভয়ই হারাইলাম। কি লইয়া যাইব ও কেমন করিয়া এই কলঙ্ক কালিমা ভূষিত মুখ দেখাইব। এই বলিতে বলিতে কেবল রোদন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে অন্তঃপুর হইতে ভীষণ রোদন ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। রজনী প্রভাতা দেখিয়া জীবনের পিতা ও বরযাত্রীগণ কন্যার রোরুদ্যমান পিতার নিকট হইতে বহু কষ্টে বিদায় লইয়া ষ্টেশনাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ষ্টেশন হইতে সন্ধ্যার সময় বাটীতে আসিয়া পৌঁছিলেন ; বাটীতে রজনীতেই তারযোগে সংবাদ পাঠান হইয়াছিল। বাটীর লোক সংশয়চিত্তে এতক্ষণ কালাতিপাত করিতেছিল, এখন বর ও বধূ না দেখিয়া ও সকলের বিষন্ন ভাব অবলোকন করিয়া সকলেই উচৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিল। জীবনের পিতাও ধরাতলে পতিত হইয়া রোদন করিতে করিতে সংজ্ঞাবিহীন হইয়া পড়িলেন। জীবনের মাতারও সংজ্ঞা নাই। ক্রমশঃ সংজ্ঞা লাভ করিয়া বিলাপ করিতে করিতে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। এদিকে ব্যক্ত ও গুপ্ত অনুসন্ধান প্রবল ভাবেই চলিতে লাগিল।

এই অদ্ভুত ব্যাপারের তত্ত্ব পুরুষমণ্ডলী কেহ কিছুই নিরূপণ করিতে সমর্থ হইলেন না ; কিন্তু অঘটন-ঘটন-পটীয়সী স্ত্রীমণ্ডলী হইতে দুই একটী কল্পিত অদ্ভুত রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়িল। এই রহস্য উদ্ভাবন ও আলোচনার স্থান হইতেছে স্ত্রীলোকদিগের স্নানের ঘাট। এই ঘাটে স্নান উপলক্ষে মহিলা-মণ্ডলী প্রত্যহই সমবেত হইয়া থাকেন এবং পরচর্চ্চা ও পর গ্লানির চূড়ান্ত অভিনয় দেখাইয়া পরমানন্দ লাভ করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মহিলা সভার সভাপতির আসন ঠান্‌দিদি সম্বন্ধীয়া বৃদ্ধাগণই প্রায় গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই অভিনব ও অত্যাশ্চর্য্য বিবাহ বিভ্রাটের মন্তব্য পাত্রীপক্ষের মহিলাসভা হইতে যাহা প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাই অগ্রে বক্তব্য। পরে বর পক্ষের সভার মন্তব্য প্রকাশ করিব। এই অপূর্ব্ব ঘটনার পরদিনই মহিলা মণ্ডলী ঘাটে সমবেত হইলেন। ঠান্‌দিদি একটু পরে আসিলেন। ঠান্‌দিদিকে দেখিয়া মহিলা মণ্ডলীর আনন্দের সীমা রহিল না। নমস্কার ও অভিবাদনাদি দ্বারা ঠান্‌দিদিকে আপ্যায়িত করিয়া কোন একটী বয়স্থা মহিলা জিজ্ঞাসা করিলেন—ঠান্‌দিদি! বিয়ে বাড়ীর ব্যাপারটা কি বলুনদেখি? ঠান্‌দিদি তোলো মুখখানি ভালকরিয়া ফুলাইয়া ও চক্ষের ভঙ্গি বক্তৃতার ভাবে বাগাইয়া গুল্‌ভরা স্বরে বলিয়া উঠিলেন—বড়বাড়ীর বড়কথা ভাই; আমরা গরীব লোক ; আমাদের ও সব কথায় দরকার কি ? বয়স্থা মহিলা—দরকার কিছুই নাই, তবে ঘটনাটা অসম্ভব ও বিস্ময়কর বলিয়াই ভাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। ঠান্‌দিদি—অসম্ভবই বা কি, আর বিস্ময়করইবা কি? মেয়ে ধেড়ে হইলে বংশের কি কখনও মঙ্গল হয়। মেয়ে ধেড়ে করে রাখা আর কলঙ্কের গাছ রোপন করা একই কথা। তায় আবার ওমেয়ে লেখাপড়া শিখেছে ; চিঠিপত্র লিখতে ও পড়তে পারে। হয়ত কাউকে কিছু না ব'লে

ভিতরে ভিতরে কাহারও সঙ্গে লেখা লেখি ক'রে বিয়ের একটা ঠিক ঠাক ক'রে রেখেছিল। এখন বাপের পেরাপিরী দেখে, গোপনে স'রে পড়লো। যেন রুক্মিণী হরণের মত কতকটা আভাস আসে, নয়? বয়স্থা মহিলা—আচ্ছা ঠান্‌দিদি তা হ'লে অত টাকার গয়না ও ভাল দামী দামী কাপড় জামা গুলো ফেলে গেল কেন? ঠান্‌দিদি—আ-ম'লো, তা জানিস্ নি, ওরা কি তোদের মতন বোকা যে, কতকগুলো গয়না প'রে গা ভারি ক'রবে আর সকাল থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত গুএ গোবরে খেটে খেটে শ্বশুর শাশুড়ীর মন যোগাবে। ওরা শিক্ষিত মেয়ে, ওরাকি গয়না গাটী চায়, না শ্বশুর শাশুড়ী চায়; না সমস্ত দিন গাধার মত খাটতে চায়। ওরা চায় আজকালের দশ আনা ছয় আনা হিসাবের চুল ছাঁটা ও টেরী কাটা আধা বাঙ্গালী ও আধা ফিরিঙ্গী গোছের নব্য ভর্ত্তা, আর নায়ক নায়িকার রহস্য পূর্ণ নব নব নাটকের অভিনয় ও বার্ত্তা। দ্বিতীয়া বয়স্থা মহিলা—ঠিক্ ঠিক্; ঠান্‌দিদি যা বল্‌ছেন তাই ঠিক; আমি ইতিমধ্যে একদিন শুনে ছিনু যে, কোথাকার একজন বর ঐ মেয়েটিকে বিয়ে কর্‌বে বলে, ঐ মেয়েটিকেই একখানি পত্র লিখেছিল। ঐ মেয়েটীও নাকি সেই বরকে বিয়ে করবার বড় ইচ্ছা। ঠান্ দিদি অমনি কাল ঠোঁটের হাসিতে ঘাট অন্ধকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—ঐ, ঐ ঐ বটে; ষড়যন্ত্রকরে সেই বরই ঐ মেয়েটাকে নিয়ে গেছে। এই মন্তব্যই স্থির হইয়া গেল। সকলেই ঠান্‌দিদিকে সাবাস্ দিতে দিতে জল পূর্ণ কলসী কক্ষে লইয়া স্ব স্ব গৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। এইত গেল কন্যা পক্ষের মহিলা সভার মন্তব্য। এখন বর পক্ষের মহিলা সভার মন্তব্যটা কি দেখা যাউক।

ক্রমশঃ

শ্রীভূপতিচরণ বসু।

সদাচার

কি ঐহিক, কি পারত্রিক, যে কোন মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যে কার্য্য করিতে হইলেই আমাদিগকে দীর্ঘায়ু হইতে হইবে। কেবল দীর্ঘায়ু হইলেও চলিবে না, সঙ্গে সঙ্গে সবল ও সুস্থ দেহও আবশ্যক। শরীর ও মনের পরস্পর অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ—একের কার্য্যকারিতার অভাবে অন্যেও নিস্তেজ ও দুর্ব্বল হইয়া

পড়ে। নিস্তেজ ও দুর্ব্বল মন লইয়া সংসারে কোন কাজই করা যায় না। মনীষিগণ বলিয়াছেন—

"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুত্তমম্।"

স্বাস্থ্যই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের প্রকৃষ্ট সহায়। এই স্বাস্থ্য লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে সদাচারী হইতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ের তথা কথিত বিশ্বপ্রেমিক হইলে চলিবে না। সত্য বটে কালের সঙ্গে সঙ্গে আচার ও বিধির পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু প্রাচীন ঋষিবাক্যকে শুধু প্রাচীন বলিয়াই উড়াইয়া দিলে চলিবে না। পরিবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, যে যুক্তি ও তর্কের উপর প্রতিষ্ঠা করিয়া এই পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে উহা কতদূর বিচারসহ। আপাতঃ রমণীয় বিষয়গুলি লোকের হৃদয়গ্রাহী ও মনোহারী হইলেও, পরিণামে উহা সুরস কি বিরসপ্রদ উহার বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। বিচার করিবার সময় শুধু নিজের বুদ্ধির উপর বিশ্বাস করিলেই চলিবে না, সুচিন্তিত ঋষিবাক্যের উপরও শ্রদ্ধা রাখা প্রয়োজন। আমরা শুধু ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পক্ষপাত করিয়াই একথা বলিতেছিনা, বহুদৃষ্টফল ও অভিজ্ঞতাই আমাদিগকে ইহা বলিতে বাধ্য করিতেছে। দুই দিন পূর্ব্বে যে কথা আমরা উন্মত্তের প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছি, পশ্চিমের প্রতিধ্বনি পাইয়া আজ আমরা তাহাকেই পরম সত্য বলিয়া মানিয়া লইতেছি। কালে এমনও হইতে পারে যে, ঋষি কথিত সমুদায় বাক্যই বর্ত্তমান সভ্য জগৎ সত্য বলিয়া লইতে পারে। যাক্ অবান্তর কথা পরিত্যাগ করিয়া এখন প্রকৃতের অনুসরণ করা যাউক।

ঋষিগণ ত্রিকালদর্শী ছিলেন, তাই তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন যুগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন। সেই বিধিব্যবস্থা অনুসারে কার্য্য করিলে বোধ হয়, অধুনা এই সমাজ ও ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইত না। অতএব আমরা সংস্কারকদিগকে অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা যেন সংস্কার করিবার পূর্ব্বে ভূতপূর্ব্ব ইমারতখানা একবার বিশেষ সতর্কভাবে পরীক্ষা করিয়া লন। পরার্থপর ঋষিগণ নিজের সমুদায় স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া, এমন কি লোকালয় পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া, বিজন অরণ্যবাসী হইয়া শুধু জগতের উপকার চিন্তায় নিরত থাকিতেন। তাঁহাদের কেহ শত্রু বা কেহ মিত্র ছিল না, সকলকেই তাঁহারা সমান চক্ষে দেখিতেন। তাই মনীষী মনু বলিয়াছেন—"মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে।" ঋষিগণের মতে শৌচাভ্যাসই চিত্তশুদ্ধির প্রধান উপায়।

শৌচ প্রধানতঃ দুই প্রকার—বাহ্যশৌচ ও আভ্যন্তর শৌচ, বাহ্যশৌচ মৃদ্বারি সাপেক্ষ এবং আভ্যন্তর শৌচ ভাবশুদ্ধির দ্বারা সাধিত হয়। এই ভাবশুদ্ধি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে ও বিশুদ্ধ চিত্তে নির্ম্মল জ্ঞানের অভ্যুদয় হয়। মন শুদ্ধ না হইলে পরমানন্দ লাভের আশা থাকে না, তাই শ্রুতি বলিতেছেন—

"মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধ মোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়া সক্তং মুক্তৈ নির্ব্বিষয়ং স্মৃতম্॥"

ভগবান মনু এই শৌচকে ধর্ম্মের স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন—

"অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
এতং সামাসিকং ধর্ম্মং চাতুর্ব্বর্ণেহব্রবীন্মনু॥"

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সংযতেন্দ্রিয় হইয়া অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, শৌচ এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহের অভ্যাস করিলেই তাঁহাদের সাধারণ ধর্ম্মাচরণ হইয়া থাকে। মুনি যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—সত্য, অস্তেয়, অক্রোধ, পাপে জুগুপ্সা, শৌচ, সৎকার্য্যে বুদ্ধি, সন্তোষ, দম ও সংযতেন্দ্রিয়তাই সমুদায় ধর্ম্মের মূল। ইহাদের পালনেই বাস্তবিক ধর্ম্ম প্রতিপালিত হইয়া থাকে। দক্ষও স্বীয় সংহিতায় বলিতেছেন যে, দ্বিজাতিগণ সর্ব্বদাই শৌচবিষয়ে তৎপর হইবেন, দ্বিজত্ব শৌচের উপরই নির্ভর করে। শৌচাচার বর্জ্জিত দ্বিজাতির সমস্ত ক্রিয়াই নিস্ফল। এই শৌচ প্রধানতঃ সদাচারের উপরই নির্ভর করে।

এখন কথা হইতেছে এই সদাচার কি? স্বয়ম্ভু মনু সদাচার এইরূপে বিবৃত করিয়াছেন—

"সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেব নির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥
তস্মিন্ দেশে য আচার পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ।
বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে॥"

বিমলসলিলা ও পুণ্যতোয়া সরস্বতী এবং দৃষদ্বতী নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ভূমিভাগ ব্রহ্মাবর্ত্ত বলিয়া কথিত হয়। সেই শিষ্টবহুল ব্রহ্মাবর্ত্তে পরম্পরা ক্রমে আগত ব্রাহ্মণাদি বর্ণ হইতে অন্তরাল বা সঙ্কীর্ণ জাতি পর্য্যন্তের যে আচার তাহাই

সদাচার বলিয়া অভিহিত। অতএব আধুনিক আচার বা সংহিতা বিরুদ্ধ আচার সদাচার বলিয়া কথিত হইতে পারে না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান কাল প্রচলিত আচার শিষ্টাচার বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না বরং শিষ্ট বিগর্হিত; দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত মাতুলকন্যা বিবাহাদি ও সদাচার বলিয়া গ্রাহ্য নহে। যে আচার শ্রৌত বা স্মার্ত্ত তাহাই বাস্তবিক সদাচার। স্মৃতিও বলিতেছেন—

"আচারঃ পরমোধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্ত স্মার্ত্ত এব চ।
তস্মাদস্মিন্ সদাযুক্তঃ নিত্যংস্যাদাত্মবান্ দ্বিজ॥"

আত্মবান লইতে হইলে সদাচার নিরত হইতে হইবে। আর আত্মবান্ না হইলে প্রকৃত সুখ লাভও করা যায় না। শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—

"সর্ব্বং পরবশং দুঃখম্ সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্।

মহর্ষি মনু আচারকেই পরম তপস্যা ও ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অন্যান্য ধর্ম্ম সংহিতাকারগণও মনুমতের প্রামাণ্য অবলম্বন করিয়া আচারের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। মনু বলিতেছেন—মুনিগণ আচার দ্বারা ধর্ম্মের প্রাপ্তি অবগত হইয়া আচারকেই সকল তপস্যার প্রধান কারণ গ্রহণ করিয়াছেন। (১।১১০)। কল্প ও রহস্য সহিত সমুদায় বেদ, বেদবিদ্‌গণের ধর্ম্মসংহিতা ও ব্রহ্মণ্যতাদিরূপশীল সাধুদিগের আচার এবং বিকল্প বিষয়ে মনের সম্প্রসাদ ধর্ম্মের মূল (২।৬)। সমগ্র বেদ, স্মৃতি সদাচার এবং আত্মতুষ্টি সাক্ষাৎ ধর্ম্মের লক্ষণ (২।১২)। আচার হইতে আয়ুঃ লাভ হয়, আচার হইতে ঈপ্সিত প্রজা প্রাপ্তি হইয়া থাকে। আচার হইতে অক্ষয় ধনলাভ হয় এবং আচারই সমুদায় অলক্ষণ বিনাশ করিয়া থাকে (৪।১৫৬)। সকল লক্ষণহীন হইয়াও সদাচার সম্পন্ন, শ্রদ্ধালু ও অসূয়া বর্জ্জিত মানব শতবর্ষ জীবনধারণ করিয়া থাকে (৪।১৫৮) গুরু শিষ্যকে উপনীত করিয়া প্রথমেই শৌচ, আচার, অগ্নিকার্য্য এবং সন্ধ্যোপাসনা শিক্ষা দিবেন (২।৬৯)। আচারহীন বিপ্র বেদফল ভোগ করিতে পারে না। কিন্তু আচারের সহিত যুক্ত হইলে সম্পূর্ণ ফলভাগী হয় (১।১০৯)। দুরাচার মানব এই পৃথিবীতে নিন্দিত হইয়া থাকে। তাহারা সর্ব্বদা দুঃখভাগী রোগগ্রস্ত ও অল্পায়ু হয় (৪।১৫৭)। মহর্ষি বশিষ্ঠও স্বসংহিতাতে বলিতেছেন—ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের সকলেরই আচার পরমধর্ম্ম। হীনাচার পুরুষ ইহকাল ও পরকাল, উভয়কালেই বিনষ্ট হইয়া থাকে। তপস্যা, বেদপাঠ, অগ্নিহোত্র বা ভূরি দক্ষিণা

হীনাচারযুক্ত ভ্রষ্ট মানবকে এই সংসার সাগর হইতে তরাইতে পারেনা। ষড়-ঙ্গের সহিত অধীতবেদও আচারহীনকে পবিত্র করিতে পারে না; জাতপক্ষ বিহঙ্গমের কুলায় ত্যাগের স্থায় বেদসকল পর্য্যন্ত ইহাকে মৃত্যুকালে পরিত্যাগ করে। সকলেই দুরাচার পুরুষের নিন্দা করিয়া থাকে, সে সর্ব্বদাই কষ্টভোগ করিয়া থাকে ও ব্যাধিগ্রস্ত হয় এবং অকালে জীবনলীলা সংবরণ করে। আচার হইতেই ধর্ম্ম, ধন ও লক্ষ্মীলাভ হইয়া থাকে, আচারই সমুদই অলক্ষণ বিনাশ করে। ইত্যাদি ইত্যাদি (৬ষ্ঠ অধ্যায়)। বিষ্ণুও বলিতেছেন—ধর্ম্মকাম মানব জিতেন্দ্রিয় হইয়া শ্রুতিস্মৃতি বিহিত ও সাধুদিগের দ্বারা সেবিত আচারের অনুশীলন করিবেন। আচার হইতেই আয়ু ও ঈপ্সিত গতিলাভ হইয়া থাকে। কাশীখণ্ডেও উক্ত হইয়াছে—সমুদায় লক্ষণ বর্জ্জিত হইলেও সদাচারী মানব শত-বর্ষ পরমায়ু লাভ করিয়া থাকে। দুরাচার রত মানব এই পৃথিবীতে নিন্দনীয় ও ব্যাধিপীড়িত হইয়া অকালে প্রাণত্যাগ করে। আচারই পরমধর্ম্ম, আচারের স্থায় তপস্যা আর নাই। আচার হইতেই আয়ু বর্দ্ধিত হয়, এবং পাপরাশি অগ্নিসংযোগে তুলারাশির ন্যায় ভস্মীভূত হইয়া যায়। (৩৬।২৫—২৭)।

বাস্তব জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও ঋষিবাক্যের ব্যভিচার লক্ষিত হয় না। সদাচারসম্পন্ন, ধর্ম্মনিরত ব্যক্তিগণকে প্রায়ই দীর্ঘায়ু হইতে দেখা যায়। স্মৃতিকারগণ শয্যাত্যাগ হইতে আরম্ভ করিয়া শয়ন পর্য্যন্ত যে যে কার্য্য বিনির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই সকলের সম্যক্ পালন করিলে যে দীর্ঘায়ঃ লাভ করিতে পারা যায় তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই। বর্ত্তমানে সমুদায় নিয়মপালন সুকঠিন হইলেও অন্ততঃ কতকগুলিও পালন করা যাইতে পারে, এবং ঐ সকলের পালন দ্বারাও শরীর সবল ও সুস্থ হইতে পারে। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া ইষ্ট-দেবের ধ্যান, পৃথিবী প্রণতি, মাঙ্গল্য দ্রব্য দর্শন, বিন্মূত্র ত্যাগ, শৌচাচরণ প্রাতঃস্নান ও সন্ধ্যাবন্দনাদি প্রভৃতি প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে দিনকৃত্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। দেবগৃহ মার্জ্জনাদি, গুরু ও মঙ্গলদ্রব্য দর্শন, কেশপ্রসাধন, দর্পণে মুখদর্শন, পুষ্পাদিচয়ন প্রভৃতি প্রথম যামার্দ্ধের * অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় যামার্দ্ধে বেদাভ্যাস, তৃতীয়ে অর্থসাধন এবং চতুর্থে তৈলমর্দ্দন, মধ্যাহ্ন স্নান ও তর্পণাদি।

---

* দিনমানকে ও রাত্রিমানকে আট ভাগ করিলে তাহার এক এক ভাগকে এক এক যামার্দ্ধ বলে। ঋতু বিশেষে দিবা রাত্রির পরিমাণভেদ হয় বলিয়া যামার্দ্ধের একটা নির্দ্দিষ্ট সময় দেওয়া যায় না তবে দিবারাত্রির পরিমাণ সমান ধরিয়া এবং ৬টায় উদয় ও ৬টায় অস্ত ধরিয়া প্রতি ১॥ ঘণ্টার এক এক যামার্দ্ধ মোটামুটি রূপে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

অনন্তর মধ্যাহ্নকৃত্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। পঞ্চম যামার্দ্ধে নিত্য হোম, বৈশ্বদেব-ক্রিয়া, বলিপ্রদান, অতিথিসৎকার, নিত্যশ্রাদ্ধ, গোগ্রাস দান ও ভোজন প্রভৃতি ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয়। তদনন্তর অপরাহ্ণ ও সায়াহ্নকৃত্য করিতে হয়। আহারের পর ষষ্ঠ ও সপ্তম যামার্দ্ধে ধর্ম্ম ও জ্ঞানের বৃদ্ধিকর এবং চিত্তের প্রসাদ জনক কার্য্য সমূহের অনুষ্ঠান করিতে হয়। দিবা নিদ্রা ও স্ত্রীসংসর্গ আয়ুঃক্ষয়-কারী, অতএব আহারান্তে কখনও দিবা নিদ্রা যাইবে না, তবে অসুস্থ শরীরের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। ভোজনান্তে ইতিহাস, পুরাণ ও অন্যান্য শাস্ত্রের চর্চ্চা করিবে। বৃথা বাক্য, কলহ ও পরীবাদ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিবে। অবশেষে অষ্টম যামার্দ্ধে শিষ্টব্যক্তি ও বন্ধুবর্গের সহিত বসিয়া সদালাপে সময় অতিবাহন করিবে। সূর্য্যাস্তের একদণ্ড পূর্ব্বে সায়ং সন্ধ্যায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। অনন্তর রাত্রিকৃত্য আরম্ভ হয়। রাত্রির প্রথমযামে অতন্দ্রিত হইয়া দিবাকৃত্য সমূহের আলোচনা করিতে হয় এবং প্রমাদবশতঃ যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান হয় নাই তাহারও চিন্তা করিতে হয়। দ্বিতীয় যামে নৈশ ভোজন ও তৎপূর্ব্বকৃত্য এবং তৃতীয় যামে শয়ন বিধেয়। এই সকলের বিস্তৃত বিবরণ আহ্নিক কৃত্যে দ্রষ্টব্য, আমরা প্রবন্ধ বিস্তারের ভয়ে শুধু সংক্ষেপে উল্লেখমাত্র করিয়া গেলাম।

আচার পালন ব্যাপারে শাস্ত্রকারগণ ভোজন বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইতে বলিয়াছেন। হস্ত, পদ ও মুখ ধৌত করিয়া, পবিত্র আসনে উপবেশন পূর্ব্বক পূর্ব্বাস্য হইয়া আহার করিবে। অধিক আহার এবং রজঃ ও তমোগুণ বৃদ্ধিকারী আহার পরিত্যাগ করিবে। তিথ্যাদি ভেদে নিষিদ্ধ দ্রব্য কখনও ভোজন করিবে না। আহারের দোষগুণে যে মানব-স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয় তাহা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ। আহারের দোষগুণ পুরুষ হইতে পুরুষান্তরে সংক্রামিত হইয়া থাকে, এই জন্যই আর্য্যঋষিগণ পতিত, ব্যভিচারিণী, বার্দ্ধুষিক, মত্ত, ক্রূর, পিশুন, শত্রু, মিথ্যাবাদী প্রভৃতির সংসর্গ করণ ও অন্নগ্রহণ নিষেধ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত অশৌচান্ন ও অপবিত্র অন্নভক্ষণাদিও করিতে নাই। ছোঁয়াচে রোগীর সংস্পর্শ যেরূপ শারীর চিকিৎসকগণ বর্জ্জন করিতে উপদেশ করেন, মনের চিকিৎসকগণও সেই প্রকার দূষিত সংস্পর্শ ও দুষ্টান্ন ভোজন করিতে বারণ করিয়া থাকেন। রোগ মুক্তির কামনায় জননী সন্তানকে তিক্তরস প্রদান করিয়া থাকেন বলিয়া তিনি সন্তানের শত্রু নন। অতএব মানসিক বৈদ্যগণের উপর যে অধুনাতন অনেকে খড়্গহস্ত সে কেবল তাহাদের অনভিজ্ঞতার ও অদূর-দর্শিতারই ফল। তাহাদের মনে রাখা উচিত যে, সমাজ-শরীরের দূষিত পদার্থের

অপনয়নই তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাঁহারা স্বার্থ বা দুরভিসন্ধিমূলে কোন কার্য্য করেন না। মহাপ্রাণ মনু উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন যে, বেদের অনভ্যাস আচারের বর্জ্জন, আলস্য ও অন্নদোষ হইতেই মৃত্যু দ্বিজাতিকে হিংসা করিয়া থাকে (৫।৪)। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, আহার শুদ্ধি হইলে সত্ত্বশুদ্ধি হয়, সত্ত্বশুদ্ধি হইলে ধ্রুবস্মৃতি জন্মে এবং স্মৃতিলাভ হইলেই সমুদায় গ্রন্থীর মোক্ষণ হইয়া থাকে। অতএব এক লম্ফেই পরমহংস হইয়া বসিলে চলিবে না। শাস্ত্র বিহিত পন্থা অবলম্বন করিয়া শনৈঃ শনৈঃ তাহাতে আরোহণ করিতে হইবে, নতুবা পতন ও হস্ত পদাদির ভঙ্গ অবশ্যম্ভাবী। একাকারী হইতে হইলে প্রথমে তেজের সংগ্রহ করিতে হইবে, নতুবা শ্রেষ্ঠের অনুকরণ (অবশ্য তথাকথিত একাকারাদি বিষয়ে) করিতে যাইয়া অনেক সময়ই প্রতারিত ও লাঞ্ছিত হইতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলায় পরীক্ষিৎ যখন প্রশ্ন করিলেন যে, ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা ব্রহ্ম অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পরদারমর্ষণরূপ অন্যায় কার্য্য করিলেন কেন? তখন শুকদেব উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, সর্ব্বভোজী হইয়াও অগ্নি যে প্রকার অপবিত্র বা হীন হয় না, তেজস্বী পুরুষদিগের সম্বন্ধেও ধর্ম্মের ব্যতিক্রম ঘটিলে তাহা দোষের হয় না দেহাভিমানী ও অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি মনে মনেও এরূপ সংকল্প করিবে না। সমুদ্র মন্থনোত্থ হলাহল পানে একমাত্র মহাদেবই সমর্থ, অন্যে এরূপ আচরণ করিলে তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। এস্থানে সন্দেহ থাকিতে পারে যে, গীতায় ভগবান্ কৃষ্ণ নিজমুখেই বলিয়াছেন যে, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ পৃথিবীতে যাহা আচরণ করিয়া থাকেন অন্যলোক তাহাদেরই অনুবর্ত্তন করে; এস্থলে তাহা হইলে উহার ব্যভিচার লক্ষিত হইল। এই আশঙ্কা নিরাশের জন্য শুকদেব আবও বলিতেছেন যে, মহাপুরুষগণের বাক্যই সত্য, তাঁহারা যাহা করিতে বলিবেন সাধারণ লোক তাহাই করিবে এবং স্থলে স্থলে তাঁহাদেরন্যায় আচরণও করিবে অর্থাৎ তাঁহাদের যে কার্য্য উপদেশের অনুরূপ হইবে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহারও অনুসরণ করিবে। অতএব বিষয়ভোগে মন সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত রাখিয়া, স্বীয় শক্তির পরিমাণ না জানিয়া শুধু বাহবা লইবার আকাঙ্ক্ষায় ঋষিবাক্যের অবহেলা করিলে পরিণামে ঠকিতে হইবেই হইবে।

যদি কেহ ঋষিপ্রণীত ব্যবস্থাবলিকে কুসংস্কারাপন্ন মনে করেন বা তাহাতে আস্থা স্থাপন করিতে না চান, তবে আমরা তাহাদিগকে আয়ুর্ব্বেদোক্ত সদাচারের প্রতি লক্ষ্য করিতে অনুরোধ করি। চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি ঋষিগণ শুধু

যোগারোগ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই স্বীয় স্বীয় সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, ভক্ষ্যাভক্ষ বিচারের দিকে তাঁহাদের আদৌ লক্ষ্য ছিল না। যোগ আরোগ্যের জন্য তাঁহারা অনেক অভক্ষ্য গ্রহণেরও ব্যবস্থা করিয়াছেন। বর্ত্তমান শতাব্দীতে পর্য্যন্ত তাঁহাদের মত অনুসৃত ও আদৃত হইতেছে। এই সকল ঋষিগণ অনাত্মেন্দ্রিয়ার্থসংযোগ, প্রজ্ঞাপরাধ ও পরিণামকে রোগের মূল কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা বিষয়ের অত্যন্ত বা মিথ্যা ভোগের নাম অনাত্মেন্দ্রিয়ার্থসংযোগ। বুদ্ধি, সন্তোষ ও স্মৃতি বিভ্রষ্ট হইয়া মানুষ যে অশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে তাহাই প্রজ্ঞাপরাধ, ইহা সমুদায় দোষের প্রকোপের কারণ। বিনয় ও আচারের পরিহার, পূজ্যগণের অবমাননা, ইন্দ্রিয়ের অযথাচার, সদ্‌বৃত্তের বর্জ্জন ; ঈর্ষা, মান, মদ, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ্য, ভ্রম বা এই সকল হইতে জাত ক্লিষ্ট কর্ম্ম প্রভৃতিকে শিষ্টগণ প্রজ্ঞাপরাধ বলিয়াছেন, ইহা ব্যাধির কারণ। ভ্রান্ত বিজ্ঞান বা বিষম কার্য্যের আরম্ভও প্রজ্ঞাপরাধ। কালেতে তদীয় লিঙ্গ বিপর্য্যয় অর্থাৎ গ্রীষ্মে শীত, শীতে গ্রীষ্ম প্রভৃতি পরিণাম বলিয়া পরিভাষিত ইহাও ব্যাধি উদ্ভবের অন্যতম কারণ।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, কি আর্য্যবিজ্ঞান, কি লৌকিকবিজ্ঞান, সকলে সদাচারকেই আরোগ্যের মূল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; সুতরাং সুস্থদেহে থাকিয়া ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গের অনুষ্ঠান করিতে হইলে সদাচার পালন অপরিহার্য্য।

শ্রীমাধবদাস শর্ম্মা।

(পুরস্কার প্রবন্ধ)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বস্ত্রহরণ ও রাস এই দুইটী লীলার পরস্পর সামঞ্জস্য রাখিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনার জন্য ভক্তি-ভাণ্ডার হইতে একটী পুরস্কার দেওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে। বলা বাহুল্য শ্রীমদ্ভাগবতের মতকেই মুখ্য ধরিয়া লইয়া কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিস্কার করিয়া প্রবন্ধ লিখিতে হইবে। ভক্তির আকারে ছাপিলে যাহাতে ১৬ পৃষ্ঠার বেশী না হয়, লেখকের সে বিষয়েও বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। আগামী ১লা মাঘ, ১৩২৮ বঙ্গাব্দের মধ্যে প্রবন্ধ আমাদের হস্তগত হওয়া চাই। "ভক্তি"-কার্য্যালয়ে ডাক-টিকিট সহ পত্র লিখিয়া বিশেষ বিবরণ অবগত হউন।

ভক্তি

16/2/22

(২০শ বর্ষ ৫ম সংখ্যা পৌষ মাস ১৩২৮ সাল)

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী ।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্ ॥"

গৌর-গীতিকা

তেমনি ক'রে আবার এসে ডাকাও গৌর প্রেমের বাণ ।
(তাতে) ভেসে যাবে ডুবে যাবে জীবের দারুণ অভিমান ॥
সেদিন যেমন জীবের তরে প্রেম-অমিয়া ক'রলে দান ।
তেমনি ক'রে আচণ্ডালে (গৌর) আবার এসে কর ত্রাণ ॥
সেদিন যেমন রূপের ছটায় কোটি শশী ক'রলে ম্লান ।
(তেমনি) ভুবনভুলানা রূপে আসি আকুল কর সবার প্রাণ ॥
(আমার) হয়নি জনম এলে যখন ওহে ত্রিজগতের প্রাণ ।
(এবার) অপূর্ণ সাধ পুরাইতে হৃদে তোমায় দিব স্থান ॥
সরস হবে হৃদয় মরু ছুট্‌বে হৃদে প্রেমের বাণ ।
প্রাণভ'রে সবাই মিলে গাইব মধুর গৌর নাম ॥

দীন—সেবক

কেবল কুবা

কোন সময়ে ভারতবর্ষের কোন পল্লীতে "কেবল কুবা" নামে এক পরম ভক্ত কুম্ভকার বাস করিতেন। তাঁহার চরিত্র অতি উদার ও মধুর ছিল। সর্ব্বদাই কৃষ্ণ প্রেমানন্দে ডগমগ। বিশেষতঃ বৈষ্ণব দেখিলে যেন হাতে চাঁদ পাইতেন। যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেন সমস্তই বৈষ্ণব সেবায় ব্যয় করিতেন।

এমন করিয়া কেবলকুবার দিন কাটিয়া যায়। একদিন হঠাৎ দুই তিন জন বৈষ্ণব আসিয়া উপস্থিত। ঘরে এমন কিছুই নাই যদ্বারা বৈষ্ণব সেবা করেন। অনেক চেষ্টা করিয়া অবশেষে বাজারে যাইয়া এক বণিকের নিকটে কিছু দ্রব্য চাহিলেন। বণিক বলিল যে, সে একটী কূপ খনন করাইতেছে, সেই কূপের মধ্য হইতে যদি মাটী উঠাইয়া দিতে পারে তবে সেই পারিশ্রমিকের পরিবর্ত্তে সে বৈষ্ণবসেবার সমস্ত দ্রব্য দিতে পারে। ভগবানে যাহার প্রীতি আছে, তিনি না করিতে পারেন কি? কেবলকুবাও তাহাতে স্বীকৃত হইয়া বৈষ্ণব সেবার দ্রব্যাদি আনিয়া মহাসুখে বৈষ্ণব সেবা করিলেন।

তৎপর দিন পূর্ব্ব কথানুযায়ী বণিকের কূপ হইতে মাটী উঠাইতে চলিলেন। সেখানে কূপের ভিতর নামিয়া মাটী কাটিতে কাটিতে হঠাৎ দুই দিক হইতে কূপ ধসিয়া পড়িল দেখিয়া সকলে হাহাকার করিয়া উঠিল। কেবল ত কূপের মধ্যেই মাটী চাপা পড়িয়া রহিলেন। কিন্তু তাঁহাকে উঠাইতে আর কেহই চেষ্টা করিল না। কূপ খনন করিতে আসিয়া যখন কূপে মানুষ মারা গেল, ইহা একটী অমঙ্গলের চিহ্ন বলিয়া বিঘোষিত হওয়ায়, অন্য সকলেও কূপ খনন ত্যাগ করিয়া বাড়ী চলিয়া গেল। কেবলের কিন্তু এ দিকে দৃক্‌পাতই নাই। এতবড় কাণ্ডটা হইয়া গেল ভগবান বুঝি তাঁহার ভক্তকে এ কথা বুঝিতেই দিলেন না। কেবল মাটির মধ্যে থাকিয়া দেখেন এ এক বিচিত্র স্থান। সংসারে শত সহস্র কণ্ঠের চীৎকারেও যাঁহার সাড়া পাওয়া যায় না এ স্থানে এক ডাকেই বুঝি তাঁর সাড়া পাওয়া যায়। কি সুন্দর স্থান! তিনি সেখানে তাঁহার প্রাণ বঁধুয়ার মধুর নাম গানে বিভোর হইয়া রহিলেন।

প্রায় এক মাস পরে এক ব্যক্তি কোন কার্য্যবশতঃ কূপের নিকট যাইয়া শুনিতে পাইল যে, কে যেন অতি মধুর স্বরে হরেকৃষ্ণ নাম গান করিতেছে। ইহা

শুনিয়া সে আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং এই কথা গ্রামে গিয়া সকলের নিকট প্রকাশ করিল, তখন সকলে আসিয়া মাটী কাটিয়া ফেলিয়া দেখে কেবল মুদ্রিত নেত্রে বসিয়া নাম গান করিতেছেন। তাঁহার বদন মণ্ডল কি এক অপূর্ব্ব-জ্যোতি মণ্ডিত। এতদিন যে মাটির নীচে রহিয়াছেন তাহাতে তাঁহার গায়ে একটুও মাটী পড়ে নাই বা কোনরূপ আঘাতও লাগে নাই। যেন দুইচালা ঘরে বসিয়া নাম জপ করিতেছেন। গৃহ সজ্জা দেখিয়া মনে হইল যেন তাঁহার এক অতি আপনার জন আছেন তিনিই তাঁহার আহারাদি যোগাইয়া থাকেন। কত মিষ্টান্ন, কত রকমের খাবার কত কি যে কেবলেব সম্মুখে স্তরে স্তরে সাজান আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সকলে তখন ধরাধরি করিয়া কেবলকে গৃহে লইয়া আসিল। চারিদিকে এ সংবাদ প্রচার হইলে দলে দলে লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিল। লোকে লোকারণ্য, কেহ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল, কেহবা পাদোদক পান করিল, কেহ বা কত স্তবস্তুতি কবিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে আর এক বিচিত্র ব্যাপার উপস্থিত হইল। ডুঙ্গরপুর গ্রাম হইতে এক ভাস্কর একটী শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি লইয়া বিক্রয়ের জন্য কেবল কুবার বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। ঐ মূর্ত্তি দেখিয়া কেবলের সেবা করিবার বড সাধ হইল। তাই বিগ্রহের মূল্য জিজ্ঞাসা কবিলে ভাস্কব সাধুর আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া বেশী মূল্য চাহিল। সাধু তাহা দিতে অসমর্থ তাই চুপ করিয়া রহিলেন। ভাস্কর তখন বিগ্রহ লইয়া রওনা দিবে, কিন্তু ঠাকুর আর উঠেন না। উঠেন না? না উঠেনই না। কত চেষ্টা করিল, সকলে একত্রে টানিতে লাগিল, কিন্তু লীলাময়ের কি লীলা কিছুতেই নড়িলেন না। তখন সকলে বুঝিলেন সাধুর নিকটেই ঠাকুরের থাকিবার ইচ্ছা। ভাস্করগণ তখন সাধুকে প্রণাম করিয়া বলিল, আমরা ভারবাহী পশুর মত কেবল বোঝা বহিয়াই বেড়াইলাম এখন তোমার ঠাকুর তুমি ঘরে লইয়া একমনে সেবা কর, আমরা মূল্যাদি কিছুই লইব না এই বলিয়া তাহারা নিজ নিজ আবাসে চলিয়া গেল।

সাধুও ভক্তির সহিত ঠাকুরের সেবা আরম্ভ কবিলেন, ঠাকুরও তাঁহার একান্ত বশীভূত হইয়া পড়িলেন। অনেক শিষ্য প্রশিষ্য হইল, গ্রামে সকলেই তাঁহাকে অতি ভক্তি করিতে লাগিল। কিন্তু কেবলের স্ত্রী নিতান্তই ভক্তিহীনা, সাধুকে অতি শান্ত প্রকৃতিব দেখিয়া তাঁহাকে আব গ্রাহ্যই করিত না। বুঝাইলেও বুঝিত না। একদিন তাহার ভাই প্রাকৃত কুমার এক গাধায় চড়িয়া ভগিনীর সহিত দেখা করিতে আসিল। সেও ভগিনীরই রকম, আচার ব্যবহার কিছুই

জানে না। কেবলের স্ত্রী ভাইয়ের জন্য অতি আদর ও পরিপাটীর সহিত এমন নানাপ্রকার মিষ্টান্ন ও ব্যঞ্জনাদির আয়োজন করিল যে, তাহা তাহার সাত পুরুষেও কোন দিন দেখে নাই। কেবল সাধু তাহা দেখিলেন, দেখিয়া স্থির করিলেন যে, কৃষ্ণভক্ত ভিন্ন অন্য কেহ এরূপ দ্রব্যাদি ভোগ করিবার অধিকারী হইতে পারে না। তাই তিনি এক ছল করিয়া স্ত্রীকে কার্য্যান্তরে পাঠাইয়া সমস্ত ভাল ভাল দ্রব্য বৈষ্ণবদিগকে খাওয়াইতে লাগিলেন। এমন সময় স্ত্রী আসিয়া ঐ ব্যাপার দেখিল, দেখিয়াই একেবারে ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিল। বৈষ্ণবগণকে নানা প্রকার কটুক্তি কবিয়া গালি দিতে লাগিল। এতদিন কেবল সমস্ত নীরবে সহ্য করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু আজ প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় বৈষ্ণবগণের প্রতি এরূপ ব্যবহার দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। বৈষ্ণবনিন্দা তাঁহার নিকট অসহ্য হইয়া উঠিল। তখন তিনি স্ত্রীকে বাড়ী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

তারপর ভক্ত কেবলের পত্নী পবিত্র জীবন-তরণীকে যে পথে চালিত করিল দীন লেখক তাহা লিপিবদ্ধ করিতে অক্ষম। কিছুদিন পরে এমন দারুণ দুর্ভিক্ষ আসিয়া উপস্থিত হইল যে, কেহই অন্ন পায় না। ভক্ত চূড়ামণি কেবলের বাটীতে কিন্তু নিত্যই মহোৎসব। কতশত লোক নিত্য প্রসাদ পাইয়া ঐহিক ও পারত্রিক সুখশান্তি উপার্জ্জন করিতে লাগিল। একদিন কেবল কুবার সেই পত্নীও পুত্রকন্যাদিগকে সঙ্গে করিয়া কেবলেব দ্বারে আসিয়া উপস্থিত। কেবল কুবার এক শিষ্য গিয়া গুরুদেবকে নিবেদন করিল, আমার গুরুমাতা আসিয়া দ্বারেতে অপেক্ষা কবিতেছেন। তদুত্তরে কেবল বলিলেন 'সে তোমার গুরুমাতা নয় তাহাকে ত আমি বহুদিন ত্যাগ কবিয়াছি। তবে দুঃখে পড়িয়া আসিয়াছে তাহাকে কিছু প্রসাদ দাও।' আকাল পর্য্যন্ত এইরূপভাবে তাহাদের ভরণপোষণ চালাইয়া বিদায় দিলেন। বিদায়কালে দুইটি কথা বলিয়া দিলেন। প্রথম কথা বলিলেন, এখন ত আকাল গিয়াছে, এখন ঘবে ঘরে ভিক্ষা করিয়া খাও গিয়া। দ্বিতীয় কথা, আচ্ছা বল দেখি, যাহাব তুমি এতদিন সেবা করিলে সেই ভর্ত্তা আজ দুর্ভিক্ষকালে তোমাকে এক মুষ্টি অন্ন দিতে সমর্থ হইলেন না, আর দেখদেখি আমার স্বামী—যিনি ব্রহ্মাণ্ডেবও স্বামী, স্বয়ং লক্ষ্মী হ'লেন যাহার স্ত্রী। তিনি আমাকে, আমার পরিবার বর্গকে, আরও কত হাজার হাজার লোককে পালন করিতেছেন। কেবলপত্নী কেবলের মুখে একথা শুনিতেছেন, আর তাঁহার হৃদয় যেন দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। ভক্ত কেবলের এই ভক্তিভরা উপদেশ

গাথা স্ত্রীর কর্ণের ভিতর দিয়া মরমে গিয়া প্রবেশ করিল। এতদিন সঙ্গ পাইয়া যাহা হয় নাই আজ দারিদ্র্যের সাহচর্য্যে ঐ এক মুহুর্ত্তকালের উপদেশেই তাহা হইল। ভূতপূর্ব্ব কেবল পত্নী তখন প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মমন সমর্পণ করিয়া ধন্য হইল।

যাঁহার মুহূর্ত্ত কালে উপদেশে ব্যভিচারিণীবও টনক নড়িল, এবং সমস্ত ব্যভিচার ভুলিয়া শ্রীকৃষ্ণ পদে আশ্রয় লাভ কবিল, সেই ভক্তপ্রবব কুম্ভকার কেবল কুবার চরণে কোটি কোটি প্রণাম করিয়া আমরা অদ্য বিদায় লইলাম।

শ্রীনগেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত।

গুহরাজ

শ্রীভগবানে আত্যন্তিক ভালবাসা অর্থাৎ অহৈতুকী রতির-নামই প্রেম। কারণ ভগবান নিত্যবস্তু, নিত্যবস্তুতে যে ভালবাসা তাহাও নিত্য, আর প্রেমও নিত্য, অকপট চিত্তে তাঁহাকে ভালবাসার নামই প্রেম। অনিত্যবস্তুতে ভাল-বাসার নাম প্রেম নয় উহাকে কাম বলে, কাম দুঃখ দায়ক অনিত্য, এবং ভগবদ্ভক্তির অন্তরায়।এই প্রেম জাগতিক পদার্থে সম্ভবেনা, আমবা স্ত্রী পুত্র বন্ধু বান্ধবাদিকে ভালবাসিয়া থাকি,কিন্তু ইহা যথার্থ প্রেম নয়। কারণ আমরা অনিত্য বস্তুতে মোহের বশে বা স্বার্থ-পরতার দাস হইয়া ভালবাসিয়া থাকি। কাহারও রূপ দেখিয়া বা কোন দ্রব্য মিষ্ট লাগে বলিয়া, তাহাকে ভালবাসি, তাহা হইলে রূপ, বস, গন্ধ, স্পর্শাদিতে মোহিত হইয়া ভালবাসি, উহাদের প্রকৃত নিত্য সত্ত্বা বুঝিয়া ভালবাসি না, সেই জন্য স্বার্থলাভ ছুটিলেই, মোহ ভাঙ্গিলেই সেই ভালবাসাও পলায়। নিঃস্বার্থ ভালবাসা গোপ গোপীদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি, এই ভালবাসার নামই প্রেম। কারণ শ্রীকৃষ্ণ নিত্য বস্তু তাঁহার প্রতি যে অনুরাগ তাহাই প্রেম। এ ভালবাসা বা অনুরাগে স্বার্থপরতা নাই, ইহার দেহের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। গোপ 'গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব ভুলিয়া' তাঁহাকে যে কিরূপ অপূর্ব্ব ভাবে ভালবাসিত, তাহা তাহারাই জানে। ঐরূপ প্রেম ক্ষুদ্র ও সীমা বদ্ধ নহে। ইহাতে কোনও সঙ্কুচিত ভাব নাই, ইহা জাগতিক বাধা মানে না। পবিত্র প্রেম বা ভালবাসা জাতিবিচারের অপেক্ষা করে না। ধন জনের আশায় বিক্ষিপ্ত হয় না, ইহা প্রত্যক্ষ দেখাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ না করিয়া ক্ষত্রিয়ের ঘরে জন্মগ্রহণ ও গোয়ালার

ঘরে অবস্থান করিয়া ছিলেন। "কারণ সেখানকার প্রেমের এমনি টান যে, তিনি কেবল যে নন্দালয়ে আসিয়াছিলেন তাহা নহে, শ্রীনন্দের বাধাও মাথায় করিয়া বহিয়াছিলেন। জাতি বা কুলের বিচার ভগবদ্ভজনে নাই বৈষ্ণব কবি গাহিয়াছেন :—

(ভাইরে) কি করে বরণ কুল।

যে কোন কুলেতে জনম হউক না কেবল ভকতি মূল॥
কপিকুলে ধন্য বীর হনুমান শ্রীরাম ভকতরাজ।
রাক্ষস হইয়া বিভীষণ বৈসে ঈশ্বর সভার মাঝ॥
দৈত্যের ঔরসে প্রহ্লাদ জনমি ভুবনে যাহার যশ।
স্ফটিকস্তম্ভেতে প্রকট নরহরি হইয়া যাহার বশ॥
দেখনা কি কুল বিদুরের ছিল খাইল যাহার ঘরে।
চণ্ডাল হইয়া মিতালি করিল গুহক চণ্ডাল বরে॥
দেখ না কিবা সাধনা করিল গোকুলে গোপের নারী।
জাতি কুলাচার কি করিবে তার সে হরি যে ভজে তারি॥

কিন্তু ইহা নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে যে, শ্রীভগবানে এইরূপ প্রেম অনেক জন্মের প্রার্থনা, উপাসনা ও সাধনার ফল। আজ যদি আমার কোন আত্মীয়কে বলা যায় যে, আমার এই উপকার করিলে আমি কোন ভয়ানক যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার হই, পরন্তু তোমাকে ঐ যন্ত্রণার কিয়দংশ ভোগ করিতে হইবে, তাহা হইলে তিনি কখনই তাহা করিতে স্বীকৃত হইবেন না। কারণ তাহার ভালবাসায় স্বার্থমাখা রহিয়াছে। নিঃস্বার্থ ভাবে জীবের প্রতি মহাপুরুষগণ দয়া করিয়া প্রেমের প্রত্যক্ষ প্রমান দেখাইয়াছেন, বাইবেলে লিখিত আছে—যখন মহাপুরুষ যীশুখ্রীষ্টকে তাঁহার শত্রুরা ক্রুশেবিদ্ধ করিতে যায় তখন তিনি প্রার্থনা করিয়াছিলেন,"হে ভগবন্। ইহারা কি করিতেছে তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। আপনি দয়া করিয়া ইহাদিগকে রক্ষা করুন।" এইরূপ ভালবাসার নামই প্রেম। কলিযুগপাবন শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ছোটবড় না বাছিয়া মার খাইয়াও জীবকে চিরদুঃখ, চির অশান্তি ও চির হাহুতাশ হইতে উদ্ধার করিবার মানসে কোল দিতেন। ইহারই নাম প্রেম। আমরা বলিয়া থাকি প্রেমডোরে ভগবানকে বাঁধা যায়,—কিন্তু যথার্থ প্রেম হইলে তবেই তাঁহাকে বাঁধিতে পারা যায়। গুহরাজ যে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে কিরূপে ভাল বাসিয়াছিলেন, এবং চণ্ডাল হইলেও তাঁহার যে ভগবানে কত প্রেমছিল, শ্রীরামচন্দ্র একরূপ তাহার

প্রেমে মুগ্ধ ও আত্মহারা হইয়া জগতে নির্ম্মল ভালবাসার উজ্জ্বল মূর্ত্তি-দেখাইয়াছিলেন তাহাই আমাদের অদ্যকার আলোচ্য বিষয়।

গুহরাজ নামক কোনও এক চণ্ডাল ভীল দেশের রাজা ছিলেন, চণ্ডাল হইলেও তাঁহার শ্রীভগবানে অত্যন্ত প্রেম বা ভালবাসা ছিল শ্রীরামচন্দ্র পিতৃ আজ্ঞা পালনার্থে পতিপ্রাণা সীতা ও অনুজ লক্ষ্মণের সহিত বন গমনকালে গুহরাজের বাটীরনিকট দিয়া গমন করিতে ছিলেন। তিনি তাঁহাদের রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং আনন্দের সহিত দৌড়াইয়া তাঁহার শ্রীচরণে পতিত হইলেন। শ্রীরামচন্দ্র তাহাকে মৈত্র বলিয়া সম্বোধন করিয়া আলিঙ্গন করিলে গুহরাজ তাঁহাদিগকে সাদরে আগ্রহের সহিত বাটীতে আনিলেন ও তাঁহাদের প্রীতিসাধনের জন্য যত্নবান হইলেন, কোথা হইতে কোন দ্রব্য আনিয়া যে তাঁহাদিগকে আহার করাইবেন সেজন্য ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন মৈত্র! আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে চৌদ্দবৎসর ফল মূলাদি ভিন্ন আর কিছু আহার করিব না। তখন তিনি নানাবিধ ফলাদি আয়োজন করিয়া প্রেমের সহিত তাঁহাদিগকে খাওয়াইলেন। পরন্তু শ্রীরামচন্দ্রের মুখে তাঁহার বনগমনের আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত অস্থির হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বলিলেন মৈত্র। আমি তোমাকে বনে যাইতে দিব না, রাজ্যাদি সকলই তোমার চরণে অর্পণ করিলাম। তুমি এইখানেই থাকিয়া মা জানকীর সহিত রাজত্ব কর। ইহা দেখিলেই আমি চিরসুখী হইব, কিন্তু যখন দেখিলেন যে কিছুতেই রামচন্দ্র থাকিবেন না তখন একবার ভরতের উপর ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে,আমি এখনই সসৈন্যে ভরতের রাজ্যঅধিকার করিয়া তোমাকে তথায় বসাইব। কিন্তু জানকী-নাথ শ্রীরামচন্দ্র তাহাকে নানাপ্রকার বুঝাইলেন যে ইহাতে ভ্রাতা ভরত বা পিতামাতার কাহারও দোষ নাই, যাহা দৈবের ঘটনা তাহাই হইয়াছে। হে মৈত্র! মনুষ্যের সুখ ও দুঃখ সকলই যখন দৈবের অধীন, ইচ্ছা হইলেই জীব যখন আপন সুখ ভোগ করিতে পারে না তখন অনিশ্চিত সুখ-ভোগের বাসনায় ধর্ম্মপথ ও গুরুজনের আজ্ঞা লঙ্ঘন করা কোনও মতেই বিধেয় নয়; মিত্রবর। তুমি দুঃখিত হইও না আমার প্রতি তোমার নির্ম্মল ও অকৃত্রিম ভালবাসা আমি বেশ বুঝিয়াছি আমি তোমার প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছি জীবনে কখনও তোমার বন্ধুতা ভুলিতে পারিব না। মিত্র! পিতৃআজ্ঞা পালনার্থ বন গমনে আমার কোনই কষ্ট হইবে না তুমি স্থির হও নতুবা আমি দুঃখিত হইব। রামচন্দ্র এইরূপে তাঁহাকে কথঞ্চিৎ শান্তনা করিয়া বনাভিমুখে যাত্রা

করিলেন। কিন্তু—গুহরাজের প্রেম অসীম, তিনি ভগবানের বিচ্ছেদে অস্থির হইয়া সকল সুখ জলাঞ্জলি দিলেন সেই দিন হইতে চৌদ্দবৎস পর্য্যন্ত সামান্ত ফলমূলাহার, মৃত্তিকাদিতে শয়ন ও অবিশ্রাম অশ্রুবর্ষণ করিয়া কাটাইতে লাগিলেন। শ্রীরামচন্দ্র যাইবার সময় তাঁহাকে বলিয়া গিয়াছিলেন যে, চৌদ্দবৎসর পূর্ণ হইলেই তিনি তাঁহাকে দর্শন দিবেন, কেবল সেই আশাতেই প্রাণধারণ করিয়াছিলেন। পাঠকবৃন্দ দেখুন নির্ম্মল ভালবাসার কিঅপূর্ব্ব শক্তি। জাতিকুল মানে না, বিদ্যা বুদ্ধির অপেক্ষা করে না, রাজা প্রজার পার্থক্য বিচার করিতে দেয় না। নিঃস্বার্থ ভালবাসায় লোক আত্মসুখ ভূলিয়া যায়।

যে দিবস চৌদ্দবৎসর পূর্ণহইবে সেইদিন গুহরাজ আনন্দের সহিত সমস্ত রাজ্য সজ্জিত করিতে আদেশ করিলেন, কিন্তু যত বেলা হইতে লাগিল তাঁহার ততই উৎকণ্ঠা বাড়িতে লাগিল। শেষে যখন দেখিলেন যে তখনও শ্রীরামচন্দ্র আসিতেছেন না, তখন তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে আমার এ দেহে আর কাজ কি? ভগবান ছাড়া হইয়া দেহ না থাকাই ভাল সুতরাং ভৃত্যদিগকে চিতা সজ্জিত করিতে আদেশ করিলেন, এইরূপে চিতায় প্রবেশ করিবেন এমন সময়ে "জয় রাম জয় রাম," এইরূপ শব্দ তাঁহার কর্ণগোচর হইল, তখন কোথা হইতে এই শব্দ আসিল তাহার অনুসন্ধানার্থে চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাহারা কোথাও কাহাকেও দেখিতে পাইল না; পুনরায় "জয়রাম জয়রাম," শব্দ আরও নিকটে—ঊর্দ্ধদিক হইতে আসিতেছে শুনিতে পাইলেন, তখন ঊর্দ্ধদিকে দেখিলেন একটা প্রকাণ্ড জীব বিশেষ, মধুর "রাম" নামে দেশ প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে নামিয়া আসিতেছে। কিয়ৎক্ষণ মধ্যে এই জীব উপর হইতে নামিয়া যথায় গুহরাজ চিতার নিকট দণ্ডায়মান ছিলেন তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। ইনি আর কেহই নয়, সেই পরম ভক্ত শ্রীহনুমান। ভক্তমুখে শ্রীরামের নাম মধুর হইয়া নিঃসৃত হয়, তাহা নিতান্ত পাষণ্ড ইন্দ্রিয় পরতন্ত্র ও ভগবদ্বিরোধীর প্রাণকেও ক্ষণকালের নিমিত্ত টলাইতে পারে, ভক্তের নিকট ত অধিকতর মধুময় হইবেই তাই আজ হনুমানের মুখে"রাম" নাম শুনিয়া গুহরাজের প্রাণে পুলক আসিল, এবং নৈরাশ্য কোথায় চলিয়া গেল নেত্রে অশ্রু পাত হইল; দৌড়াইয়া হনুমানের সম্মুখে পড়িয়া গেলেন, হনুমান নানাপ্রকারে গুহরাজকে সান্ত্বনা করিলেন এবং আশ্বাসবাক্য দিয়া বলিলেন যে, প্রভু রামচন্দ্র, মা জানকী ও কনিষ্ঠ লক্ষ্মণের সহিত শীঘ্রই তাঁহার বাটীতে আসিতেছেন। তখন ভীলরাজ্য পুনরায় নব আনন্দে মাতিয়া উঠিল, সকল বাটিতেই আনন্দধ্বনী সূচক

দ্রব্যে সজ্জিত হইতে লাগিল। রাম-প্রেমে বিহ্বল গুহরাজ আজ বড়ই আনন্দিত। মণিহারা ফণীর মণিপ্রাপ্তির ন্যায়, মৃতদেহে পুনঃ প্রাণলাভের ন্যায়, দুঃখীর হারাধন প্রাপ্তির ন্যায়, চতুর্দ্দশবৎসরের পর প্রিয়তম শ্রীরামচন্দ্রকে পাইবেন বলিয়া জগৎ যেন তাহার নিকট শান্তিপূর্ণ বোধ হইতে লাগিল। রাজ্যের সকলেই আজ প্রফুল্ল। সজীব নির্জ্জীব সকলেই যেন পরমানন্দে বিহ্বল। রাজবাটী যেন শ্রীরামের আগমন প্রতিক্ষায় হাসিতে লাগিল। এমন সময়ে কতকগুলি লোক বলিয়া উঠিল, ওই রথের পতাকা দেখা যাইতেছে, সকলেই সেইদিকে চাহিয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে শ্রীভগবানের রথ ভীলরাজের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল, রথের উপর নবদুর্ব্বাদলশ্যাম শ্রীরাম, বামে অপূর্ব্ব কান্তি মা জানকী ও দক্ষিণ পার্শ্বে সুন্দর মূর্ত্তি লক্ষ্মণ, কি সুন্দর শোভাধারণ করিয়াছেন। হনুমান ছুটিয়া গিয়া পদতলে পড়িলেন। গুহরাজ এই সমস্ত দেখিয়া ভাবে বিভোর, কিছুক্ষণ কথা কহিবার শক্তি রহিল না স্থিরনেত্রে অপূর্ব্ব মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিলেন।

মন। তুমিও একবার স্থির হইয়া রথের উপর এই শ্রীমূর্ত্তি দেখিয়া লও, আর তোমার এ ভবসংসারে আসা যাওয়া থাকিবে না। একবার বদন ভরিয়া "জয়রাম শ্রীরাম" বলিয়া তোমার জীবন সার্থক কর। এই ছবিখানি হৃদয়পটে আঁকিয়া রাখো আর লুকাইয়া লুকাইয়া মনের সাধে দেখ, তাহা হইলে মায়ামোহ, আর তোমায় সংসার সমুদ্রে ডুবাইতে পারিবে না। রাম নামের গুণে অনায়াসে ভবের কূলে গিয়া উঠিতে পারিবে। গুহরাজ শ্রীরামচন্দ্রের স্তব করিতে লাগিলেন, দুই নেত্র বহিয়া প্রেমাশ্রু পড়িতে লাগিল, কতক্ষণ অনিমিষে একদৃষ্টে সীতারামের যুগলমূর্ত্তি দেখিয়া পরমানন্দে ইহাকে নামাইয়া বাটিতে লইয়া গেলেন ও আদরে মনের সাধে নানাবিধ বসন ভূষণে তাঁহাদিগকে সাজাইলেন, তদনন্তর বহুদিনের সাধ মিটাইয়া মৈত্রকে নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করাইয়া খাওয়াইলেন ও আজ সেই চৌদ্দ বৎসর পরে নিজেও প্রসাদ পাইয়া কৃতার্থ হইলেন। শ্রীরামচন্দ্র কয়েক দিবস তথায় থাকিয়া তৎপরে মিত্র ও অন্যান্য সহচর সঙ্গে করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ধন্য গুহরাজ তুমিই ধন্য, তোমার প্রেম অনির্ব্বচনীয় তোমার প্রাণের ভিতর ভালবাসা যে কত প্রশস্ত পরিমাণে রহিয়াছে তাহা আমার ন্যায় ক্ষুদ্র চেতা কিরূপে অনুভব করিবে? তুমি চণ্ডাল কিন্তু কে তোমাকে চণ্ডাল বলিয়া নরকের দ্বার পরিষ্কার করিবে? তুমি সাধু হইতেও সাধু। আমি তোমার চরণে কোটি

কোটি প্রণাম করি। আমি বড়ই অধম ও নীচ, আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার কণামাত্র প্রেম পাইয়াও শ্রীগুরুর চরণে আমার মতি স্থির রাখিতে পারি— আমায় আশীর্ব্বাদ কর তুমি যেমন রামচন্দ্রকে ভালবাসিলে আমি যেন সেইভাবে শ্রীভগবানকে ভালবাসিয়া কৃতার্থ হইতে পারি। তাহা হইলেই শ্রীগুরুর কৃপা পাইয়া আনন্দে জীবন যাপন করিতে পারিব।

শ্রীমতী—

জীবন-সঙ্গিনী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বরপক্ষের মহিলামণ্ডলীর ঠানদিদিটী বড় জম্‌কাল, কারণ ইনি জীবিত টাট্‌কা বস্তুতেও পোকা পড়াইতে পারেন। আর ইনি দেশী কথা বার্ত্তার বড় একটা আন্দোলন করেন না। বৈদেশিক কথা বার্ত্তাই ইঁহার প্রধান আলোচনা এবং সংবাদ পত্রের মতামতেই ইহাঁর ভরসার বেশী। তাই ইঁহার মতে জীবন নিশ্চয়ই বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। কিন্তু অন্য একটি মহিলা ইঁহার পোষকতা না করিয়া বলিয়া উঠিলেন—না ঠান্‌দিদি। এ কথা বিশ্বাস করিতে পারি না, কারণ বাল্যাবস্থা হইতেই, জীবনের হিন্দুধর্ম্মে খুব আস্থা, আর সেইজন্য সংসারেও তার বরাবর নির্লিপ্ত ভাব। ঠান্‌দিদি ঈষৎ ক্রুদ্ধা হইয়া বলিয়া উঠিলেন—আহা হা হা, তবে ত তুই সবই জানিস, আমার ভব-তারণের সঙ্গে তার (জীবনের) গলায় গলায় ভাব, তাই সে রেলে চ'ড়ে বে'কর্ত্তে যেতে যেতে আমার ভবতারণকে বলেছিল যে—দেখ ভাই! বাঙ্গা-লীর মেয়ে হাজার লেখা পড়াই শিখুক আর উপাধিই পাক, ইংরাজ মহিলার মত চালাক চোস্ত ও সভ্য ভব্য ভাবাপন্ন কিছুতেই হ'তে পারে না। তাই আমার ইচ্ছা আমি বিলাতে গিয়া ভাল ব্যারিষ্টার হব আর এই জাতি, কুল ও ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া একটী পরমাসুন্দরী বিলাতি বিদুষীর পাণিগ্রহণ কর্‌ব। অপর একটী মহিলা এই কথা শুনিয়া বলিলেন—এ কথা জীবনের মুখ থেকে বেরুবে বলিয়া আমার ত মনে লাগে না ভাই। ঠান্‌দিদি পূর্ব্বা-পেক্ষা আরও একটু ক্রুদ্ধা হইয়া ও চক্ষু রাঙ্গাইয়া বলিলেন—আ মরন্, আমরা

কথা গুলো কি তবে সবই মিথ্যা। আমি স্বচক্ষে দেখেছি জীবন বোম্বাই সহর হইতে জাহাজে চড়িয়া বিলাত যাত্রা করিয়াছে। ঠান্‌দিদির কথা শুনিয়া আর একটী মহিলা বলিলেন—আচ্ছা ঠান্‌দিদি! আপনি সে সময়ে বোম্বাই সহরে ছিলেন না এখানে ছিলেন? ঠান্‌দিদি বলিলেন—কেন, বোম্বাই সহরে থাক্‌লেই স্বচক্ষে দেখা যায়, আর এখানথেকে বুঝি দেখা যায় না? বিজ্ঞান জানা থাক্‌লে জগতের সকল জিনিসই এক জায়গায় থাকিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমামহিলা বলিলেন—ঠান্‌দিদি! শুনেছি বিজ্ঞান জানিলে নাকি উনুনজ্বেলে রাঁধ্তে হয় না? ঠান্‌দিদি—আহা বিজ্ঞানের গুণ যে কত তা তোরা জান্‌বি কি ক'রে। বিজ্ঞান জানলে বাট্‌না বাট্‌তে হয় না, কুট্‌নো কুট্‌তে হয় না, উনুনজ্বেলে রাঁধ্তে হয় না, পরিবেষণ ক'রে কাউকে খাওয়াতে হয় না, কেবল চোক্ বুজে ব'সে থাক্‌লেই বিজ্ঞানের জোরে আপনা আপনি সব হ'য়ে যায়। প্রথমামহিলা—তবে আমায় একটু বিজ্ঞান শিখিয়ে দিন্ না ঠান্‌দিদি! ঠান্‌দিদি—তুই অতি মূর্খ, লেখা পড়া শিখেছিস কি যে বিজ্ঞান শিখিয়ে দেবো? লিখ্‌তে পড়্‌তে শিখে সভা সমিতিতে ও থিয়েটার বায়স্কোপে না গেলে, খপরের কাগজ, নাটক নভেল না পড়্‌লে কি কখনও বিজ্ঞান শেখা যায়? এইরূপ কথোপকথন সময়ে অনতিদূরে আগত একটী অপরিচিতা নারীকে দেখিয়া ঠান্‌দিদি সকলকেই চোক্ টিপিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন "চুপ কর চুপ কর" ঐ বুঝি গোয়েন্দা আস্‌ছে। এইরূপে সকলকে সাবধান হইতে বলিয়াই একটী অল্প বয়স্কা মহিলার অঞ্চল ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন—ওলো ও নাত বৌ। সকল বাড়ীরই তরকারী ও খাওয়া দাওয়ার কথা শুনিলাম কিন্তু তুই কি কি রেঁধে কাল নাতিকে আমার কেমন ক'রে খাইয়েছিলি তা বল দেখি? না বল্লে তোকে আমিত আজ ছাড়বো না। সে (নাত বৌ) সবে নূতন ঘর কর্ত্তে এসেছে, ঠান্‌দিদির ঐ কথা শুনে, একহাতে ঘোম্‌টা টেনে দিয়ে লজ্জায় একেবারে জড় সড় হইয়া পড়িল এবং কোন গতিকে আঁচল ছাড়াইয়া পূর্ণ কলসীটী তাড়াতাড়ি কক্ষে স্থাপন পূর্ব্বক অন্যান্য মহিলাগণের সহিত প্রস্থান করিল। ঠান্‌দিদি তখন দন্ত বিহীন মুখ হাঁ করিয়া হো হো করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—"যা, তুই আমার সঙ্গে কথা কস্‌নি তা আর কি বল্‌বো।" মহিলামণ্ডলী চলিয়া গেলে; ঠান্‌দিদি স্নান করিতে ঘাটে নামিলেন। অপরিচিতা নারীটীও দুই এক পা করিয়া ঘাটের ধারে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঠান্‌দিদি একবুক জলে নামিয়া

কাপড় কাচিতে কাচিতে এক এক বার আড় নয়নে অপরিচিতা নারীটীকে দেখিতে লাগিলেন।

দেখিলেন উহার পরনে একখানি লালপাড় শাড়ী, মুখখানি অবগুণ্ঠনে আবৃত, দুই হাতে ঢাকাই শাঁকার বলয়, পায়ে মল। নারীটী ঘাটের উপরকার সোপানটীর একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া অবগুণ্ঠনাভ্যন্তর হইতে ঠান্‌দিদিকে জিজ্ঞাসা করিল হাঁদিদি! তুমি কি এই খানেই থাক। ঠানদিদি গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিল কেনগা, আমি কি হাঙ্গর, কুম্ভীর, না মাছ যে এখানে থাকিব। অপরিচিতা নারী—নানা তা নয়, বলি তোমার বাড়ী কোথায়? ঠান্‌দিদি কেন আমি কি খোঁড়া যে বাড়ী ধ'রে ধ'রে স্নান কর্ত্তে এসেছি। বাড়ীতো খঞ্জের অবলম্বন আর রাখাল ছেলেরা সঙ্গে নিয়ে যায় গরুবাছুর চরাতে। ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে বাড়ী কি গা. বাড়ী সঙ্গে থাকলে দুই এক ঘা দিয়ে আক্কেল দিয়ে দিতুম। অপরিচিতা নারী— তুমি কি রকম ভদ্রলোকের মেয়ে গা। আমি একটী কথা জিজ্ঞাসা ক'রেছি আর তুমি আমায় দশ কথা শুনিয়ে যাত্রা বল্‌ছো। তোমার ঘর কোথা বলত? জীবন তোমার বোনপোর বড় ভাবের লোক বল্‌ছিলে নয়? ঠান্‌দিদি এইবার পুকুরের চারিদিকে একবার চাহিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন তাইত, গতিক বড় ভাল দেখ্‌ছিনা, মেয়ে গুলো সব চলে গেল, আমি একলা; মাগীটার কথা গুলোয় যেন মিন্‌সে মিন্‌সে ব'লে বোধ হ'চ্ছে। যাইহ'ক আর বেশী কথায় কাজনাই স'রে পড়তে হ'ল। প্রকাশ্যে—আমার ঘর দেখবে, চল চ', স্নান ক'রেনিয়ে গিয়ে দেখাচ্ছি। এই বলিয়া একডুবে পুষ্করিণীর অপর পাড়ে উঠিয়া একেবারে ছুট। অপরিচিতা নারীটী দেখিয়া অবাক হইয়া রহিল এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিল তাইত বুড়ি মাগীত খুব চালাক, ডুব মেরে ফাঁকী দিয়ে চ'লে গেল। আসল কথার একটুও বার কর্ত্তে পারিলাম না। তবে আর কি হবে যাওয়া যাক, বলিয়া প্রস্থান করিল।

দিন, রাত্রি, সপ্তাহ, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন, বৎসর ক্রমশঃ গত হইয়া গেল। জীবন ও সঙ্গিনীর কোন খবরই কেহ দিতে পারিল না। পুলিশ অনুসন্ধানে অপারক হইয়া পুরস্কার ঘোষণা পূর্ব্বক সর্ব্বত্রই ইস্তাহার জারি করিলেন কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। উভয় পক্ষেরই দুঃখ দূর করিবার কোন উপায় কেহ করিতে পারিল না। দেখিতে দেখিতে প্রায় পাঁচ বৎসর কটিয়া গেল।

জীবনের পিতার সহিত সঙ্গিনীর পিতার পত্রদ্বারা খবরাখবর চলিত।

পাঁচ বৎসর অতীত হইবার দুই তিন মাস বাকী আছে এমন সময় উহারা উভয়েই পুত্র কন্যার আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরামর্শ করিলেন যে, আর গৃহে থাকা আমাদের উচিত নয়। কোন তীর্থস্থানে গিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল যাপন করাই আমাদের কর্ত্তব্য। এই স্থির করিয়া সঞ্চিত অর্থের অবশিষ্ট যাহা ছিল তাহাই লইয়া সস্ত্রীক শ্রীবৃন্দাবনধামে যাইবার স্থির করিলেন ও যাইবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। উহারা উভয়েই পুত্রকন্যার বিবাহ ব্যাপারে অপরিমিত অর্থ ব্যয় করিয়া এবং সঞ্চিত অর্থের প্রায় অধিকাংশ এই কএক বৎসর জীবিকা নির্ব্বাহার্থ ব্যয় করিয়া ছিলেন। কারণ এই ভয়ানক শোক সংঘর্ষণে ভগ্নহৃদয় হইয়া বিষয় সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণে অসমর্থ হওয়ায় বিষয়ের আয় একেবারেই হ্রাস প্রাপ্ত হয়। যাহা হউক উহারা শ্রীধামে যাত্রা করিবার একটি দিন স্থির করেন এবং স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির এইরূপ ব্যবস্থা করেন যে, যদ্যপি আমাদের পুত্র ও কন্যার অনুসন্ধান কখনও পাওয়া যায় বা তাহারা ফিরিয়া আসিয়া পৈত্রিক সম্পত্তি গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করে, তাহা হইলে তাহারাই এই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বলিয়া পরিগণিত হইবে। অন্যথা এই লিখনের দিবস হইতে পঞ্চাশ বৎসরের পর এই সম্পত্তি রাজকোষভুক্ত হইয়া যাইবে। এইরূপ বন্দোবস্ত হইলে পর, জীবনের পিতা সস্ত্রীক কেবল মাত্র সঙ্গে একটী পাচিকা ও একটী ভৃত্য লইয়া যাত্রা করিলেন। যে ষ্টেশনে জীবন নিরুদ্দেশ হয়, সেই ষ্টেশনে নামিয়া উহারা সঙ্গিনীর জনক জননীর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সঙ্গিনীর জনক জননী ঐ রজনীতে ঐ স্থানে আসিয়া জীবনের জনক জননীর সহিত মিলিত হইবেন এইরূপ বন্দোবস্ত পূর্ব্ব হইতেই হইয়াছিল। এই স্থানে জীবনের পিতা পত্নীর অনুরোধে যে বিশ্রামাগার হইতে জীবন নিরুদ্দেশ হইয়াছে, সেই স্থানটী দেখাইবার জন্য পত্নীকে সঙ্গে লইয়া যাইতেছেন। আশা যদি হারানিধিকে সেই স্থানে পাওয়া যায় বা আমরা জীবনের জন্য দেশ পরিত্যাগ করিয়া জনমের মতন যাইতেছি জানিয়া, যদি জীবন একবার দেখা দেয়। জীবনের পিতা দেখিলেন যেস্থানে বিশ্রামাগার হইয়াছিল সে স্থান এখন নিবীড় বনে পরিপূর্ণ ও মনুষ্য গতায়াতের সম্পূর্ণ অযোগ্য। সেই ভীষণ অরণ্য পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া জীবনের পিতা বলিলেন এই স্থানে আসিয়াই আমার জীবন সর্ব্বস্ব-ধন জীবনকে হারাইয়াছি। জীবনের মাতা এই কথা শুনিয়া চক্ষের জল অঞ্চলে মুছিতে মুছিতে সেই নিবীড় অরণ্যের দিকে

এক দৃষ্টে দৃষ্টিপাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, জীবনরে! তুই কোথায় আছিস, একবার তোর এই দুঃখিনী মাতাকে দেখা দিয়া, একটীবার মা বলিয়া ডাক। আমি জন্মের মতন তোর চাঁদ মুখের "মা" কথা শুনিয়া যাই। জীবনের মাতার এই করুণ বাক্য শেষ হইতে না হইতেই সেই নিবীড় অরণ্য ভেদ করিয়া প্রতিধ্বনি হইল "মা"। জীবনের জননী এই মা কথা শুনিয়া আর থাকিতে পারিলেন না। বাৎসল্য স্নেহে অধীরা হইয়া সেই অরণ্যের দিকে ধাবমান হইলেন। জীবনের পিতাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। অতি নিকট হইতেই দ্বিতীয় বার শব্দ আসিল "মা" এই শব্দ লক্ষ্য করিয়া যাইতে যাইতে সম্মুখে একটী অপূর্ব্ব জ্যোতি জীবনের জনক জননীর দৃষ্টিগোচর হইল। সেই জ্যোতি লক্ষ্য করিয়া যাইতে যাইতে দেখিলেন একটী বৃক্ষ মূলে একটী সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন তাঁহার জ্যোতিতে বনভাগ আলোকিত হইয়াছে আর তাহার সম্মুখে একটী পুরুষ ও একটী স্ত্রী ধরাতল জানু দ্বারা স্পর্শ করিয়া যুক্ত করে ও মৃদুস্বরে যেন কি প্রার্থনা করিতেছেন। জীবনের জনক জননী ঐ জ্যোতির্ম্ময় সন্ন্যাসীর সমীপবর্ত্তী হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া ভক্তি গদগদ বাক্যে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই ঐ সন্ন্যাসী অতি করুণ ও মধুর স্বরে বলিলেন আপনারা জীবনের আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংসার বাসনা বিসর্জ্জন দিয়া জীবনের অবশিষ্ট সময় তীর্থ ক্ষেত্রে (শ্রীবৃন্দাবন ধামে) অতিবাহিত করিবেন বলিয়া গমন করিতেছেন; কিন্তু এখনও দেখিতেছি আপনারা সন্তানের মায়া অতিক্রম করিতে পারেন নাই। মায়া সঙ্গে লইয়া তীর্থক্ষেত্রে যাওয়া আর গৃহে থাকা, এ দুইয়ের ফলই এক প্রকার। আমার মতে এরূপ মায়া জড়িত অবস্থায় তীর্থাদি পর্য্যটনে বাহির না হইয়া গৃহে থাকাই শ্রেয়। কারণ গৃহে থাকিলে অকারণ অর্থব্যয়, পথশ্রম ও সন্তানাদির চিন্তা এই ত্রিবিধ বন্ধন হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। অতএব তীর্থ গমনের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া গৃহে ফিরিয়া যান। আর দুই মাস পরে আপনারা আপনাদের জীবন সর্ব্বস্বধন একমাত্র পুত্র জীবনকে পুনঃ প্রাপ্ত হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। আপনাদের জীবন এবং (অঙ্গুলী নির্দ্দেশ দ্বারা ঐ করযোড়ে উপবিষ্ট পুরুষ ও স্ত্রীটীকে দেখাইয়া) উহাদের সঙ্গিনী নাম্নী কন্যা ইহারা দুই জনেই একত্র মিলিত হইয়া আমার প্রভুর আশ্রমে ব্রহ্মচার্য্যাবলম্বনে কালাতিপাত করিতেছেন। তাঁহাদের ব্রহ্মচর্য্যার কাল আর দুইমাস হইলেই পূর্ণ হইবে। ব্রহ্মচর্য্যের সময় পূর্ণ হইলেই

তাঁহারা পুনরায় সংসারাশ্রমে ফিরিয়া আসিবেন ও পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইয়া নির্লিপ্ত ভাবে বহুকাল সংসারধর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া আমার প্রভুর কৃপায় পুনরাবৃত্তিশূন্য কোন এক পুণ্যধামে গমন করিবেন। সুতরাং আপনারা এক্ষণে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক জীবনের ও সঙ্গিনীর আগমন বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া গৃহাদির সংস্কার ও সুসজ্জার আয়োজনে প্রবৃত্ত হউন। আগামী বর্ষের পাঁচই বৈশাখ রবিবার অতিশুভ দিন। ঐ দিনে আপনারা উভয়েই উভয়ের বাটীর সম্মুখে এক একটি মহতী সভা গঠনের আয়োজন করিবেন এবং যাহাতে প্রত্যেক সভাতেই বহু লোকের সমাগম হয় পূর্ব্ব হইতেই তাহার বিশেষ চেষ্টা করিবেন। দেখিবেন ঐ শুভদিনে আমার প্রভুর তপস্যার বলে সভাস্থ সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া-ভূগর্ভ হইতে আপনার সভায় জীবন ও (সঙ্গিনীর পিতাকে লক্ষ করিয়া) আপনার সভায় সঙ্গিনী প্রকাশ হইবেন। পরে যোগদ্বারা আমার প্রভু দুই সভাকে একত্রিত করিয়া একটি বিরাট সভায় পরিণত করিবেন এবং ঐ সভা মধ্যেই আমি আমার প্রভুর আদেশে উহাদের নিরুদ্দেশ বৃত্তান্ত বর্ণনান্তর শুভ পরিণয় কার্য্য সুসম্পন্ন করিব, আপনারা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবেন। এখন আপনাদের মধ্যে যদি কাহারও কিছু জিজ্ঞাসা করিবার অভিলাষ থাকে ত বলুন। আমি আর অধিকক্ষণ এ স্থানে থাকিতে পারিব না শীঘ্রই আমায় আমার প্রভুর সেবায় নিযুক্ত হইতে হইবে। আমিই জ্যোতির্ম্ময়ী সঙ্গিনীর মূর্ত্তিতে সঙ্গিনীর পিতা মাতাকে এবং "মা" "মা" শব্দে এই বনমধ্যে-আমার প্রভুর আদেশ পালনার্থ আপনাদিগকে আকৃষ্ট করিয়া এই সংবাদ প্রদান করিলাম।

এই সময় জীবন ও সঙ্গিনীর মাতা জীবন ও সঙ্গিনীকে একবার দেখিতে ইচ্ছা করিলে পর, সন্ন্যাসী উহাদের সকলের গাত্রে কমণ্ডলুর জল সিঞ্চন করিয়া কহিলেন ঐ দেখুন জীবন গুরুপূজা শেষ করিয়া বসিয়া আছেন আর সঙ্গিনী জীবনের বদন-সুধাকরের সুধাপানে নয়ন চকোরকে নিযুক্ত রাখিয়া নিজ করপদ্মে জীবনের পাদপদ্ম সংবাহন করিতেছেন। উহারা জীবন ও সঙ্গিনীর স্বভাব সৌন্দর্য্য বিশিষ্ট অপরূপরূপরাশি ও অকৃত্রিম দাম্পত্য সৌহার্দ্দের পরাকাষ্ঠা পরিদর্শন করিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং শ্রীবৃন্দাবন ধামের অপূর্ব্ব ভাব ও শোভাদর্শন করিয়া জীবন সফল করিবেন বলিয়া যে আশা করিয়াছিলেন-"জীবন সঙ্গিনীর" এই অপূর্ব্ব ভাব ও শোভা দেখিয়া-তাহা এইখানেই শেষ করিলেন। অর্থাৎ শ্রীধামের অপূর্ব্ব ভাব ও শোভা উহারা এই স্থানেই

দেখিতে পাইলেন। সন্ন্যাসী উহাদের আশা পূর্ণ হইয়াছে জানিয়া উহাদিগকে গৃহে গমন করিতে আদেশ করিলেন। উহারাও তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করণান্তর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক ঐ বন হইতে বাহির হইয়া ষ্টেশনে আগমন করিলেন।

সঙ্গিনীর পিতা মাতা জীবনের পিতা মাতাকে পাচিকা ও ভৃত্যের সহিত স্বদেশে যাইতে না দিয়া রাত্রে নিজ বাটীতে লইয়া গেলেন এবং বিশেষ যত্নের সহিত উহাদের পরিচর্য্যা ও আহারাদির বন্দোবস্ত করিলেন। উহারা উহাদের যত্নাতিশয়ে ও পবিত্র ভাবে প্রস্তুত অতি উপাদেয় আহারাদিতে যার পর নাই পরিতৃপ্ত হইয়া পরম সুখে রজনী যাপন পূর্ব্বক পরদিন স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। উভয়েই "জীবন ও সঙ্গিনী আর দুই মাস পরে আসিবে" পরমানন্দের সহিত ঐ শুভ সংবাদ ঘোষণা করিয়া সন্ন্যাসীর আদেশ অনুসারে গৃহাদির সংস্কার ও সাজ সজ্জায় প্রবৃত্ত হইলেন।

এদিকে জীবন ও সঙ্গিনীর ব্রহ্মচর্য্যব্রত প্রায় শেষ হইয়া আসিল। আশ্রম দেবতা অন্তরে অবস্থিত থাকিয়া উহাদের অন্তরের ভাব অর্থাৎ উভয়ের অকপট সৌহার্দ্দ্য,অসাধারণ ইন্দ্রিয়-সংযম,ধর্ম্মে অবিচলিত নিষ্ঠা ও সংসারাশ্রমের যোগ্যতা পরীক্ষা করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলেন এবং উহাদিগকে স্ব স্ব পিতা মাতার হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। পরদিন জীবনের গুরুপূজা ও সঙ্গিনীর দেব পূজা শেষ হইলে ঐ আশ্রম দেবতা বরদ মূর্ত্তিতে উহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া, উহাদিগকে বলিলেন "দেখ আমি তোমাদের অমানুষিক সৌহার্দ্দ্য, ইন্দ্রিয় বিজয় ও ধর্ম্ম নিষ্ঠায় পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি এবং বুঝিয়াছি যে তোমরা এক্ষণে সংসারাশ্রম প্রতিপালন ও নির্ব্বাহের সম্পূর্ণ ক্ষমতা লাভ করিয়াছ। অতএব আগামী কল্য তোমাদের শুভ কার্য্য সম্পাদন ও তোমাদিগকে সংসারাশ্রমে সংস্থাপন পূর্ব্বক আমি সফল মনোরথ হইতে বাসনা করিয়াছি। এক্ষণে তোমরা যদি কোন অভিলষিত বর প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা কর, তবে অকুণ্ঠিত ভাবে আমার নিকট প্রার্থনা কর"। জীবন ও সঙ্গিনী উভয়েই এককালে অবনীলুণ্ঠিত মস্তকে ঐ আশ্রম দেবতা বা গুরুদেব চরণে প্রণাম করিয়া কহিলেন দেব। আপনি যাহা স্থির করিয়াছেন তাহার অন্যথা করিবার সাধ্য কাহারও নাই; সুতরাং আপনার আদেশ শিরোধার্য্য জ্ঞানে স্বীকার করিলাম, কিন্তু আমাদের অভিলষিত প্রার্থনা এই যে আমরা পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইয়া সংসারাশ্রমের অঘটন-ঘটন-পটীয়সী আপনার মায়ায় যেন বিমুগ্ধ না হই, আপনার

পাদপদ্মে অবিচলিত ভক্তির যেন হানি না হয় আর সংসারের কর্তব্য সুচারুরূপে প্রতিপালন ও তদ্বারা আপনার প্রীতি উৎপাদন করিয়া যেন আমরা ব্যসন পরিপূর্ণ, ভয় সঙ্কুল সুদুস্তর সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারি। গুরুদেব "তথাস্তু" বলিয়া জ্যোতির্ম্ময় নামক শিষ্যকে আহ্বান পূর্ব্বক জীবন ও সঙ্গিনীর দেহ সংস্কার ও পরিণয়োপযোগী বহুমূল্য বসন ভূষণে উহাদিগকে সুসজ্জিত করিতে আদেশ প্রদান করিলেন এবং সংসারাশ্রমের আবশ্যকীয় শিক্ষা সমূহ প্রদান করিতে বলিলেন। এই আশ্রমে প্রবেশ করিবার সময় উহারা যে যে বস্ত্র ও অলঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া কৌপীন ধারণ করিয়াছিলেন, তাহাও, উহাদিগকে প্রত্যার্পণ করিবার নিমিত্ত বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। প্রভুর আদেশ অনুসারে জীবন ও সঙ্গিনীর দেহ সংস্কার বিচিত্র ও বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারের সজ্জা সংসারাশ্রমের উপযোগী শিক্ষা ও পরিত্যক্ত বসন ভূষণের সংগ্রহাদি কার্য্য সকলই হইতে লাগিল।

পরদিন আশ্রমদেবতা সেই মহাপুরুষ অতি প্রত্যুষে স্নান ও প্রাতঃকৃত্যাদি করিয়া জীবন ও সঙ্গিনীর নিকট আগমন করিলেন এবং পূর্ব্বদিন যাহা যাহা করিতে আদেশ করিয়াছিলেন তাহা সুচারুরূপে প্রতিপালিত হইয়াছে দেখিয়া পরমানন্দিত হইলেন। জীবন ও সঙ্গিনী গুরুদেবকে আগত দেখিয়া অকৃত্রিম ভক্তি সহকারে প্রণাম ও স্তোত্রাদিদ্বারা তাঁহার অভিনন্দন ও চরণ প্রক্ষালন করিয়া দিয়া, একখানি বিচিত্র সিংহাসনে গুরুদেবকে উপবেশন করাইয়া মনের সাধে পত্রপুষ্প ফল জলাদি দ্বারা তাঁহার চরণ পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। বহুক্ষণের পর চরণ সেবা শেষ হইলে, আহৃত অতি উপাদেয় ও সুপক্ক বহুবিধ ফল ভোজনের নিমিত্ত উহারা গুরুদেবকে নিবেদন করিলেন। গুরুদেব ভক্তের নিবেদিত ফল ও জল অতি সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং ভোজনাবশিষ্ট প্রসাদ উহাদিগকে খাওয়াইয়া পরমানন্দে পুলকিত হইয়া উঠিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই শিষ্যকে তিনি দুইখানা সিংহাসন আনয়ন করিতে বলিলেন। সিংহাসন আনীত হইলে দুইটী কুশ পাদুকা ঐ দুইটী সিংহাসনের পৃষ্ঠদেশস্থ চূড়ায় তিনি স্বহস্তে আবদ্ধ করিয়াদিলেন। আবদ্ধ করিয়া দিয়া উহাদিগকে বলিয়াদিলেন দেখ, এই দুইখানি সিংহাসনে বসিয়াই তোমরা সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিবে। প্রত্যহ সংসারিক কার্য্য সমাপন করিয়া এই কুশ পাদুকা দ্বয়কে প্রণাম পূর্ব্বক তোমরা এই সিংহাসনে উপবেশন করিবে। সিংহাসনে উপবেশন করিলেই আমাকে এই আশ্রম

মধ্যে দেখিতে পাইবে। এই বলিয়া সেই মহাপুরুষ যেন উঁহাদের কল্যাণের জন্যই সমাধিস্থ হইলেন।

এখানে জীবনের পিতা ও সঙ্গিনীর পিতা সেই জ্যোতীর্ম্ময় নামক সন্ন্যাসীর আজ্ঞানুসারে আজ "আজ পাঁচই বৈশাখ আমরা আমাদের জীবন স্বরূপ হারানিধি পুনঃপ্রাপ্ত হইব" মনে করিয়া অপার আনন্দের সহিত সকল কার্য্য সমাধা করিয়া রাখিলেন ও প্রতি মুহূর্ত্তেই আহুত সভ্য মণ্ডলীর আগমন প্রতিক্ষা করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে সভা আশাতীত সভ্যগণে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সকলেই সতৃষ্ণ নয়নে এই বিস্ময় জনক ব্যাপার দেখিবার জন্য উদগ্রীব ও ব্যস্ত হইয়া চারিদিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ একটি অদ্ভুত ঘটনা উপস্থিত হইল। সভাস্থ সকলেরই মনে হইতে লাগিল যেন আর একটী জনতাপূর্ণ অভিনব সভাকে এই সভার শোভা সংবর্দ্ধন করিবার জন্য কোন এক অনির্ব্বচনীয় শক্তি বলে এই সভার সমীপবর্ত্তিনী করা হইতেছে। পরক্ষণেই আবার মনে হইতে লাগিল যেন এই সভাকেই ঐ শক্তি বলে ঐ সভারই সমীপবর্ত্তিনী করিয়া ঐ সভারই শোভা সংবর্দ্ধন করা হইতেছে। যাহা হউক দুই সভাই যখন একত্রিত হইল তখন উভয় সভার সভ্যগণই পরস্পর পরিচয়াদি দ্বারা বুঝিতে পারিলেন একটী সভা জীবনের পিতা কর্ত্তৃক আহূত ও আর একটী সভা সঙ্গিনীর পিতা কর্তৃকআহূত। এখন জীবনের পিতা অতি বিনয়পূর্ণ ও সম্মান সূচক বাক্যে সঙ্গিনীর পিতাকে ও তাঁহার সভাস্থ সভ্যমহোদয় গণকে সমাগম সময়োচিত আদর অভ্যর্থনাদিতে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। সঙ্গিনীর পিতা জীবনের পিতাকে ও তাঁহার সভাস্থ সভ্যমহোদয়গণকে ঐ রূপ বাক্যাদি দ্বারা যথাযোগ্য আদর অভ্যর্থনা ও অভিনন্দনাদি করিতে কোন অংশেই ক্রুটী করিলেন না। উভয় সভার সভ্যগণই অদৃষ্ট পূর্ব্ব সমাগম, বিস্ময়কর কাণ্ড ও সভাদ্বয়ের মন নয়ন তৃপ্তিকর শ্রীসন্দর্শনে যুগপৎ অপার আনন্দ ও বিস্ময়ে ভাসমান হইতে লাগিলেন। পরন্তু জীবনের পিতা ও সঙ্গিনীর পিতা এই সমস্ত ব্যাপারে কিছুমাত্র বিস্মিত বা আনন্দিত না হইয়া, কতক্ষণে তাঁহাদের হারানিধি পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন মনে মনে কেবল তাহাই আন্দোলন ও চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীভূপতিচরণ বসু

আমার শক্তি

প্রকৃতির দিকে যখন চাই ভাবময় সব দেখিতে পাই
অনন্ত অসীম ! দর্পণের মত প্রতিবিম্ব পড়ে মনে।
আকাশ, তপন, তারকাশশী, ভূধর, সাগর, আলোক রাশি,
সকলই যেন নীরব ভাষায় কথা কয় সঙ্গোপনে ॥
আমিত্ব আমার জগতে বিস্তার যেদিকে নেহারি সকলি আমার
আমারি মনেতে করে অধিকার জগতের যত সৃষ্টি।
লক্ষ যোজনের পথটী নয়নে বাঁধা থাকে যেন সুদৃঢ় বন্ধনে
গাঁথাথাকে যেন মরমে মরমে পড়িলে পলকে দৃষ্টি ॥
যতকিছু রস, যতকিছু রূপ, যত কিছু গুণ, ভাব অপরূপ,
কোথা থাকে তাহা কে পারে বুঝিতে আমর শক্তি বিহনে।
আমি যদি হারা জগৎময় জগৎ কোথায় পড়িয়া রয়
আমি আছি তাই সকলই আছে আমারে আজ্ঞা বহনে ॥
আমারি নয়নে দৃষ্টি ফুটায়ে আমিই আমার দিতেছি ছুটায়ে
আমারি শ্রবণে তন্ত্রী বাজায়ে আমিশুনি সেই গান।
ভাবে ভোলা আমি আমারে লইয়া অনন্তজীবন আমার হইয়া
তবু কেন আমি না পারি বুঝিতে আমার কোথায় প্রাণ ॥
কি যেন গভীর আমারি ভ্রান্তি আমিই আমারে দেই অশান্তি
আমারি মায়ায় বিজড়িত আমি থাকিতে সকলি, নিস্ব।
চক্ষু থাকিতে অন্ধ হ'য়েছি আপনার দোষে আপনি ম'জেছি
নেশাঘোরে হায় ! দেখিয়া কেবল মায়া মদিরার দৃশ্য ॥

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

শ্রীগৌর-কথা

"যার মনে লেগেছে যারে তারে ভজুক তারা গো।
মোর মনে লেগেছে কেবল শচীর দুলাল গোরা গো॥"

আহা। 'শ্রীগৌরাঙ্গ' এই নামটীতে যে কত মধু লুকান আছে তাহা আর কি বলিব। প্রেম-অবতার নিমাই চাঁদের নামে সত্যই প্রেমোদয় হয়। জগতে কতরূপে কতবার তিনি আসিয়াছেন, কত দেশের উপর দিয়া ভক্তির বন্যা বহাইয়াছেন। যে দেশ তাঁহার জন্য যে ভাবে প্রস্তুত হইয়াছিল, তিনি তথায় সেই ভাবেই উদিত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধ, ইস্‌লাম, খ্রীষ্টান প্রভৃতি ধর্ম্ম, রাজ-সাহায্যে প্রচারিত। অন্ততঃ তৎকালীন রাজাদের চেষ্টাতেই বহু দূর বিস্তৃত হইতে পারিয়াছিল। ইস্‌লাম ধর্ম্মকে প্রেমের পুষ্প-বিকীর্ণ পথের পরিবর্ত্তে রাজ-শক্তির রক্ত রঞ্জিত পথে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। তাহা আপনারা সকলেই অবগত আছেন। প্রেমের পথ সতঃ প্রসারিত। উহা প্রবল উচ্ছ্বাসে দুকূল প্লাবিত করিয়া ছুটীয়া যায়। ইহার নিমিত্ত আর কোন সাহায্যের আবশ্যক করে না। এই অনন্ত প্রবাহিণীর প্রেমবন্যা এক দিন শান্তিপুর ডুবু ডুবু করিয়া নদীয়া ভাসাইয়া নর নারীর চিত্তকে যুগপৎ প্রেমভক্তি মিশ্রিত অনুরাগের বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল। কাহারও কোন সাহায্যের আবশ্যক হয় নাই।

কনক হিমাচল ভেদিয়া প্রেম মন্দাকিনী যখন তর তর বেগে ছুটীয়া আসিতেছে, তখন পরিমিত বল মাতঙ্গ আর তাহার গতিরোধ করিয়া কি করিবে।

যে মহান্ ও সর্ব্বোচ্চ সমাজে পবিত্র জাতির মধ্যে আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি সেই হিন্দুজাতি প্রতিমুহূর্ত্তে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া জীবিত আছে। ধর্ম্ম ছাড়িয়া আমরা চলচ্ছক্তি হীন। আমরা নানা ভাবে এই ধর্ম্মকে ধারণ করিয়া বর্দ্ধিত হইতেছি।

মানব সমাজ যে ভাবে যখন প্রস্তুত হইয়াছে শ্রীভগবান তখন সেই ভাবে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মমত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। বুদ্ধদেবের উপদেশ পৃথিবীর বহুলোকে গ্রহণ করিয়াছে বটে কিন্তু তাহা কেবল বৈরাগ্য মূলক। গার্হস্থ জীবনের সহিত উহার সংস্রব নাই। বুদ্ধদেবের উপদেশে শ্রীভগবানের কোন

উল্লেখ নাই। সুতরাং বুদ্ধ-গীতিকে আমরা অদার্শনিক ও অবৈজ্ঞানিক বলিতে পারি। যেহেতু বর্ত্তমানে বিজ্ঞান ও ঈশ্বর শক্তি স্বীকার করিয়াছে।

শ্রীবুদ্ধদেবের পর আমরা শ্রীকৃষ্ণাবতারের কথা ধরিব। জগতে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের ন্যায় এমন সারগর্ভ, বহুবিষয়ক ও চূড়ান্ত তথ্য নির্ণায়ক উপদেশ আর নাই। শ্রীভাগবতে তাঁহার প্রেম লীলা-কাহিনীর যে বর্ণনা আছে শ্রীগৌরাঙ্গ এই কলিহত জীবের সমক্ষে তাহাই জীবন্ত করিয়া ধরিতে আগমন করিলেন। আর মহাপ্রভুর সে চেষ্টা বিশাল বৈষ্ণব সাহিত্যের অগন্য কবিগণ শত শত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই বৈষ্ণব সাহিত্যের মত রসমাধুর্য্যপূর্ণ শ্রেষ্টতম সাহিত্য জগতে বিরল। এই সাহিত্যের সহায়েই বৈষ্ণব গণ প্রেমভক্তির মধুময় রাজ্যের সন্ধান পান। ভগবৎ কথাই বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রাণ, শ্রীভগবান ও মহাভাব স্বরূপিণী হ্লাদিনী মহাশক্তিই এই কাব্যের নায়ক নায়িকা, যে ভাগ্যবান অমৃত পূরিত এই সাহিত্য সাগরে ডুব দিতে পারিয়াছেন সর্ব্বসন্তপ্ত চিত্ত তাহার সুশীতল হইয়াছে। যিনি প্রকৃত কাব্যরসের অনুসন্ধিৎসু তিনি তাহা এই সাহিত্যের অন্তরালে অনুসন্ধান করুন। শ্রুতির "রসো বৈ সঃ" সাহিত্যদর্পণকার বেদান্তের "স্পর্শ শূন্যং ব্রহ্মস্বাদ সহোদরম্" এই রসসিন্ধুর অপরিস্ফুট ব্যঞ্জনামাত্র। এই রসে রসিক হইবার কৌশল স্বয়ং মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপ গোস্বামীকে শিক্ষা দিবার ছলে বলিতেছেন —

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব
গুরু কৃষ্ণপ্রসাদে পায় ভক্তি লতা বীজ ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপন।
শ্রবণ-কীর্ত্তন জলে করায় সেচন ॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্যোম পায় ॥
তবে যায় তদুপরি গোলক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণ চরণ কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ ॥
তাহা বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেমফল।
ইঁহা মালী সেচে নিত্য শ্রবণাদি জল ॥
যদি বৈষ্ণব অপরাধ উঠে হাতী মাতা।
উপাড়ে বা ছিঁড়ে তার শুকি যায় পাতা ॥

এই বিশ্বে আসিয়া জীব স্বীয় কর্ম্ম-ফলে কত লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণের কৃপা হইলে তখন সে সদগুরু রূপ কৃষ্ণের চরণ আশ্রয় করিয়া ভক্তি-লতার বীজ প্রাপ্ত হয়। এইরূপে জীবের পুরুষকার আরম্ভ হইলে গোস্বামী শাস্ত্রের উপদেশ মত শ্রবণ কীর্ত্তন করিতে হইবে। আর নিজকে সংযত রাখিতে হইবে যে কোন প্রকার অপরাধ না জন্মে। ভুক্তি ও মুক্তিবাঞ্ছা প্রভৃতি বহু প্রকার অপরাধ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ সংক্ষেপে ইহা বলিতে পারা যায় যে—নিরপরাধ লইয়া শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে পারিলে জীবের পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমভক্তি লাভ হয়।

'হরি-প্রেম-রস' সঙ্গীতে মূর্ত্তিমান হইয়া উঠে। আর শব্দ ব্রহ্মের সাধন অতি সহজ, তাই দয়াল প্রভু আমার শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তনের উপদেশ দিয়াছেন। নামঃ চিন্তামনিঃ কৃষ্ণঃ—নাম নামীর ভেদ নাই। স্বকর্ম্ম ফল ধ্বংস করিয়া যাহাতে আমরা প্রকৃত সুখের পথের সন্ধান পাই প্রেমের ঠাকুর আমাদের তাহাই চিনাইয়া দিয়া গেলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে ধ্যান, যজ্ঞ ও সেবায় যাহা লব্ধ হইয়াছে, বর্ত্তমান যুগে শ্রীনামসংকীর্ত্তন তাহা দিতে সমর্থ। তাই দয়াল ঠাকুর নিজে আসিয়া বলিয়া গেলেন—কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।"

শ্রীচরিতামৃত অন্ত্যলীলায় শ্রীমুখের বাণী উক্ত হইয়াছে—

"হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ রাম রায়।
নাম সঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥
সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ আরাধন।
সেইত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥
নাম সঙ্কীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ নাশ।
সর্ব্ব শুভোদয় কৃষ্ণে পরম উল্লাস॥
কৃষ্ণ প্রেমোদ্গম প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন॥"

প্রভু এই কথা বলিয়া একে একে "চেতো দর্পণ মার্জ্জনং" ইত্যাদি আটটি শ্লোক পাঠ করিলেন। এই শ্লোক আটটি ভক্তগণের কণ্ঠহার স্বরূপ। *

---

* এই স্থানে আমরা উল্লেখ না করিয়াথাকিতে পারিলাম না যে, পূজনীয় ভক্তি সম্পাদক মহাশয়ের সম্পাদিত "শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকম্" গ্রন্থে এই শ্লোকাষ্টকের যেরূপ সুন্দর ব্যাখ্যা পাঠ করিয়াছি তাহাতে আমরা যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়াছি ও ধন্য হইয়াছি।—লেখক।

প্রায় সার্দ্ধ চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে শ্রীগৌরাঙ্গ বঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সাধুগণকে অসাধু ব্যক্তি তাড়না হইতে নিস্কৃতি দিবার জন্য ও ধর্ম্মকে যখন নিম্নস্তর হইতে উচ্চস্তরে লইয়া যাইবার প্রয়োজন হয় তখনই ভগবান এই জীব সমাজে আইসেন। রঙ্গিয়া ঠাকুর একাকী আসিলেন না—তাঁহার নিত্য পার্ষদ-গণকে সঙ্গে লইয়া সাঙ্গোপাঙ্গসঙ্গে অবতীর্ণ হন। তাই তিনি অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে তাঁহার পার্ষদগণ জন্মগ্রহণ করিলেন। প্রভু জীবকে খেলার ছলে হরিনাম দিতে মনস্থ করিলেন। তাহার ক্রীড়া ক্ষেত্র হইল শ্রীবাসের আঙ্গিনা। আর সেই আঙ্গিনাভ্যন্তরে তাঁহার ক্রীড়া কৌতুক এমনই জমাট বাঁধিয়া গেল যে, সেই তরঙ্গে পড়িয়া ভাগ্যবান দর্শকবৃন্দ আপনাদিগকে সামলাইতে পারেন নাই গৃহে ফিরিবার সময়ে তাঁহাদের "চলিতে চরণ নাহি চলে।" এবং "মুখে ফেন পুলকাঙ্গ নেত্রে অশ্রুঝরে।" আর তাঁহারা—

কচিদ্রুদন্ত্যচ্যুত চিন্তয়া কচিদ্
হসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকা।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং
ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতা॥

কেহবা তাঁহাকে চিন্তা করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, কেহ হাসিতে লাগিলেন, কাহারও বা হৃদয়ে আনন্দ ধরে না—নৃত্য করিতে লাগিলেন, কেহ বা তাঁহার ধ্যানে চিত্ত স্থির করিয়া তূষ্ণী ভাব অবলম্বন করিলেন।

জ্ঞানের হাট যে নবদ্বীপ তাহা প্রেমের হাটে পরিণত হইল। তখন তাহাদের হৃদয় বীণা এই অপূর্ব্ব সুরে বাজিয়া উঠিল, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত শ্রীমৎ প্রকাশানন্দ সরস্বতীর ভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয়—

"এমন প্রেমে মাখা হরিনাম নিমাই কোথা হ'তে পেয়েছে।
এ নাম একবার শুনে আমার হৃদয় বাণে আপনি বেজে উঠেছে॥

কতদিন ত শ্রবণে শুনেছি এ নাম
কভুত এমন করেনি পরাণ
আজ কি যেন কি এক নব ভাবের উদয়
আমার হৃদয় মাঝে হ'তেছে।

কেটে গেছে বিষম নয়নের ঘোর
গ'লে গেছে কঠিন হৃদয় মোর
আজ কি যেন কি এক উজ্জ্বল জগতে
আমায় নিয়ে চলেছে ॥

(আবার) কে যেন কহিছে মোর কাণে কাণে
তোদের পারের উপায় হ'ল এতদিনে।
(ঐ দেখ) প্রেমের পসরা লয়ে নিজ শিরে
প্রেমের ঠাকুর এসেছে ॥

আজ হ'তে নিমাই তোমার সঙ্গেরব
জ্ঞানের গরব আর কভু না কবিব
এখন সব ছেড়ে ফেলে গৌর হরি ব'লে
আমার নাচিতে বাসনা হ'য়েছে ॥”

এই প্রেমের হাটে পড়িয়া নাস্তিক অভক্তগণও ভক্ত হইল, শুষ্ক ও অফল শাস্ত্র চর্চ্চাকারী পণ্ডিত গণের হৃদয় সরস হইল আর তখনই প্রকৃত স্বর্গ হইতে প্রেমমন্দাকিনী ধারা নামিয়া আসিয়াছে। ধন্য শ্রীগৌরাঙ্গ, ধন্য তোমার ধর্ম্ম আর ধন্য এই কলির জীব, যাহারা তাহা আস্বাদন করিতে পাইয়াছে।

শ্রীভোলানাথ ঘোষবর্ম্মা

ভক্তি

(২০শ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা মাঘ মাস ১৩২৮ সাল)

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥"

ইন্দ্রিয় পঞ্চক

কুরঙ্গ ব্যাধের বংশীরব শুনে ধায়।
পাশেতে আবদ্ধ হ'য়ে জীবন হারায়॥
পরশ সুখের লাগি ত্যজি নিজ সঙ্গ।
আবদ্ধ হইয়া মরে অবোধ মাতঙ্গ॥
পতঙ্গ মজিয়া রূপে জলন্ত অনলে।
বিসর্জ্জন দেয় প্রাণ জানহ সকলে॥
ভৃঙ্গ মুগ্ধ হ'য়ে গন্ধে আপনা পাশরে।
আবদ্ধ হইয়া পড়ে নলিনী অন্তরে॥
মীন টোপ লোভে প্রাণ হারায় বড়িশে।
দেখিয়া মানব চিত্তে জ্ঞান না আইসে॥
মজিয়া পাঁচের দোষে জনম কোয়ায়।
কাল পাশে বদ্ধ হ'য়ে করে হায় হায়॥
ভূপতি-বুঝহ তত্ত্ব করিয়া বিশেষ।
এই পাঁচ গুরু হ'তে ল'য়ে উপদেশ॥

শ্রীভূপতিচরণ বসু

শ্রীশ্রীসরস্বতী-আবাহন

শারদা শারদাম্ভোজ বদনা বদনাম্বুজে
সর্ব্বদা সর্ব্বদাস্মাকং সন্নিধিং সন্নিধিং ক্রিয়াৎ ॥

সম্বৎসরের পর আজ মোহ, পাপ, তাপ বিদূরিত করিয়া পূর্ব্বাকাশে বসন্ত-পঞ্চমীর শান্তোজ্জ্বল উষালোকে দাঁড়াইয়া কে তুমি মা দেশময় অপূর্ব্ব মাধুরী বিলাইতেছ? এ কি অপূর্ব্ব শোভাসমাবেশ মা? উষার কিরণে কোটি শশাঙ্ককান্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে, নিম্নে শ্বেতশতদল সাদরে শশাঙ্ককান্তি বুকে ধরিয়াছে, উর্দ্ধে জ্যোতির্ম্ময় কিরীট অনন্তরাজ্যে অনন্ত আলোক বিকীরণ করিতেছে, অরুণ-কিরণের সঙ্গে কৌমুদী হাসিতেছে, স্ফুট-চন্দ্র তারকা পূর্ণিমাবিভাবরী আজ প্রভাতী সুষমার কণ্ঠবেষ্টন করিয়াছে, মা তোমার বরাঙ্গকান্তি শিশিরস্নাত বসুধার অঙ্গে চৌষট্টিকলায় পড়িয়াছে, শুক্লাম্বরধরা শুক্লবর্ণা শুক্লপদ্মসমাসীনা সর্ব্বশুক্লা কে তুমি মা আজ নবভাবে জগৎ মাতাইয়া তুলিয়াছ? নিখিল দিগঙ্গনা তোমারই জন্য বাসন্তী সুষমার অপূর্ব্ব উপহারে অর্ঘ্য সাজাইয়া তোমার সংবর্দ্ধনা করিতেছে, উর্দ্ধে, অধে, সম্মুখে, পশ্চাতে যে দিকে চক্ষু ফিরাই, যতদূর দৃষ্টিশক্তি চলে, ততদূর মা তোমারই মহিমায় পরিপূর্ণ। তাই বলি, ভাবের দেবতা, প্রাণময়ী শক্তি, আশার মোহিনীমূর্ত্তি, হৃদয়ময়ী ভক্তি, প্রেমের পূর্ণপ্রতিষ্ঠা, দয়ার মন্দাকিনী, দুঃখদৈন্যহারিণী, বিশ্বমানসমোহিনী, বীণাবিনোদিনী কে তুমি মা?

পরিমলান্ধ অলিদলের মত নিখিল ছন্দ তোমার পাদপদ্ম চুম্বন করিতেছে। ভুবনমোহন দেহলতিকায় বেদবেদাঙ্গ ও বেদান্তের বিমল-জ্যোতির সহিত রাগ-সম্মিলিত ষট্‌ত্রিংশৎ রাগিণীর মধুর মহিমা অভিব্যক্ত হইতেছে। করগত সপ্ত তন্ত্রীর মধুর ঝঙ্কারে সপ্তলোক মুগ্ধ হইতেছে। শাস্ত্রে শুনিয়াছি, এরূপ মূর্ত্তি মা বীণাপানির, তাই বলিতেছি, মা তুমি সরস্বতী, আজ উষালোকে কমলাসনা তুমি কমলাসন পাতিয়া আপন প্রিয়তম ভারতের শ্রীঅঙ্গ নিরীক্ষণ করিতেছ। সকলবিভবসিদ্ধিদায়িনী মা, তুমি মধুরবচনে কর্ম্মভূমি ভারতে পুণ্যকর্ম্মময়ী মহা সাধনার উদ্বোধনমন্ত্র শুনাইতে আসিয়াছ। এই ত' মা তোমার নিরভ্র আকাশে পূর্ণিমা-যৌবনের মত অমলধবল উজ্জ্বলরূপ, যে চারিযুগে তাপসের আশ্রম, রাজেন্দ্রের হর্ম্ম্যমালা, কুলপতির বহুশিষ্যশোভিত মঠ, গৃহস্থের ধর্ম্মানুমোদিত মধুর সংসার সমভাবে আলোকিত হইয়াছিল।

এস মা, বেদান্তবাদিনী, বিদ্যাবিনোদিনী, জ্যোতিষকিরীটধারিণী, এস,

সেইরূপে আসমুদ্র ভারতের শ্যামল অঙ্গ আলোকিত কর। এস মা জ্যোতির্ম্ময়ী ভারতি, আবার ভারতীরূপে ভারতের অদৃষ্টগগনের ঘোর তিমিরাবরণ বিদূরিত কর। তোমার ভারতীরূপের অপূর্ব্বচ্ছটায় দশদিক্ হাসিয়া উঠুক। মোহনিশার অবসানে ভারত চক্ষু উন্মীলন করিয়া আপন সত্তা উপলব্ধি করুক। এ যে ঘোর তিমির, এ যে মোহমদিরার চুরপনেয় আবেশ, এ যে নিশীথের গভীর স্বপ্ন। সংখ্যাতীত দীপমালা, দ্বাদশসূর্য্যের প্রভাজাল, এ তিমির দূর করিতে পারিবে না। সঞ্জীবকরণীর গন্ধমাদন আনিলে, অথবা নিখিলতন্ত্রমন্ত্র নিঃশেষিত করিলেও এ মোহ ঘুচিবে না। ব্যোমভেদী আর্ত্তনাদে বা শত বিপত্তি অশনির ভীম গর্জ্জনেও এ স্বপ্ন ভাঙ্গিবে না। সর্ব্বনাশের লেলিহান অগ্নিশিখা সংসারে সুখ শান্তির সমস্ত উপকরণ ভস্মীভূত করিতেছে, তবুও যখন স্বপ্ন ভাঙ্গিল না, তখন নিশ্চয় বোধ হইতেছে, এ স্বপ্ন সহজে ভাঙ্গিবে না।

তুমি মা ভারতী, ভারত তোমারই, ঐ যে যুগান্তসাক্ষী গিরিসম্রাটের পদতল হইতে দক্ষিণে বারিধির সুনীলসীমান্তলেখা অবধি সুবিস্তৃত ভূভাগ, উহা তোমারই পদার্পণে পৃথিবীতে প্রধান ও প্রথম তীর্থ, আর ঐ যে মোহতিমিরে অনন্ত দুর্দ্দশার কণ্টকশয্যায় শায়িত সংজ্ঞাশূন্য সন্তানগণ অহরহ চিন্তা করিতেছে—কঃ পন্থাঃ? উহারাও মা তোমারই, তুমি মা পুত্রস্নেহের আবেগভরা কণ্ঠে মধুর গভীর নিনাদে "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত" বলিয়া ডাক, "প্রাপ্যবরান্ নিবোধত" বলিয়া আশ্বস্ত কর। কোটিকণ্ঠের মাতৃসম্বোধন শূন্যধরাতল প্রতিধ্বনিত করুক; গিরিসম্রাটের হৃদয়কন্দর দ্বিগুণস্বরে ধ্বনিয়া উঠুক। তরঙ্গবিক্ষুব্ধ বারিধিবক্ষ আরও বিক্ষোভিত হইয়া উঠুক। সর্ব্বত্যাগী পরোপকারীর আজ্ঞায় প্রতিকূলতার বিন্ধ্যগিরি মস্তক নত করুক। দক্ষিণাপথে উত্তরাপথে প্রেমের আলোক সমভাবে প্রকাশিত হউক।

মা মঙ্গলময়ি ভারতি! তোমার প্রিয়তম কর্ম্মভূমি দেখিতে আসিয়া কি দেখিতেছ মা? ভারতের শ্রীঅঙ্গে মহাশ্মশানের ভস্ম বিকীর্ণ হইয়াছে। অনুপম সিদ্ধিক্ষেত্র ভারত, সর্ব্বত্যাগী শঙ্করের যোগভূমি ভারত, ঋষিগণসেবিত দেবেন্দ্র-বাঞ্ছিত অকুণ্ঠিত কর্ম্মীর বৈকুণ্ঠভূমি ভারত, মৃত্যুর পরপারে ও অমরত্ববাদী ভারত, আজ নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। শক্তি সমন্বিত একপঞ্চাশৎ মহাপীঠ রহিয়াছে, শক্তিশালী সাধক একজনও নাই। বিপদসঙ্কুল ঘোর অমাবস্যা নিশীথে শবপৃষ্ঠসমাসীন সাধককে মাভৈঃ রবে অভয়প্রদান করিবার উপযুক্ত উপসাধকও নাই।

প্রেমময়ী বৈষ্ণবীসাধনায় শ্রীপাঠসমূহ রহিয়াছে, বিশ্বমনোহর গৌরতনু হেলাইয়া, কনকচম্পকদামনিভ বাহুযুগল প্রসারিত করিয়া, বিশ্বজনীন প্রেমে আচণ্ডাল মানবে প্রেম বিলাইয়া আলিঙ্গন করিয়া ভক্তির আলোকে মুক্তির পথ দেখাইবার উপযুক্ত মহাপুরুষ আর শ্রীপাঠে নাই। গৃহে সদা শান্তিপুলকিত গৃহী নাই, গুরুগৃহে সৌম্য অন্তেবাসী নাই, জ্ঞানের প্রশান্ত মহাসাগর আচার্য্যও নাই, দীক্ষামণ্ডপে বরাভয়কর শান্ত গুরুমূর্ত্তি নাই, গুরুপদে বদ্ধদৃষ্টি স্থিরধী শিষ্যও নাই। সাধনার যে কল্পবৃক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফলপুষ্পে সুশোভিত হইয়া দশদিকে অসংখ্য শাখাবাহু প্রসারণপূর্ব্বক আর্য্যসমাজকে বহুবিধ তাপ হইতে রক্ষা করিয়াছিল, আজ তাহার চিহ্নমাত্রও নাই। তাই আজ, প্রিয় জনের অমৃতময়ী দৃষ্টি গরল বর্ষণ করিতেছে, প্রেমের জ্যোৎস্নালোকে মাৎসর্য্যের রাহুচ্ছায়া পড়িয়াছে, আনন্দের সম্মুখে বিষাদ বিকট ভ্রূভঙ্গী করিয়া দাঁড়াইয়াছে জাতীয়তার মহাপ্রসাদের চূড়া হইতে প্রীতির শ্বেতপতাকা ভূলুণ্ঠিত হইতেছে, চিরমধুর অপত্যমূর্ত্তি আজ কুভাবের মসীবর্ণ ধারণ করিয়াছে, সৌভ্রাত্রের মধুময় নিকেতনে আজ করাল দৃষ্টির বিনিময় অশান্তির অমাবস্যা সৃষ্টি করিয়াছে, অনুপম ভ্রাতৃস্নেহের লক্ষ্মণ ও একাগ্রতার একলব্য আজ স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত।

মা ভারতেশ্বরী ভারতি! ভারত বহুকাল তোমার প্রকৃত মূর্ত্তি দেখিতে পায় নাই, তোমার ধ্যানধারণা ভুলিয়া গিয়াছে। তাই আজ এত দুর্দ্দশা, এত মর্ম্মন্তুদ যাতনা। এস মা মঙ্গলময়ি, এস ত্রিতাপনাশিনি! একবার তোমার সেই দিব্য অব্যয়ধামের দ্বার উন্মুক্ত কর। বিমল আলোকমালায় কর্ম্মভূমি ভারতের কর্ম্মময় সহস্রপন্থা প্রকাশিত হউক। নিখিল হৃদয় সরোবরে সত্ত্বগুণের শ্বেতশতদল ফুটিয়া উঠুক আর তোমার জগদারাধ্য মোক্ষপ্রদ শ্রীচরণ তদুপরি সংস্থাপিত হউক।

শারদে বরদে জননি! বর চাই মা! "পুত্রান্ দেহি ধনং দেহি" নয়, "রূপং দেহি জয়ং দেহি" নয়, "সবলং মানসং দিব্যম্", চাই "সর্ব্বকর্ম্ম ক্ষমংবপুঃ" চাই "জ্ঞানংশুভফলপ্রদম্", দাও মা বর, জাগাও হৃদয়ে দুঃখ দৈন্যহারিণী কুলকুণ্ডলিনী শক্তি, কর প্রকাশিত ভুবনমোহিনী প্রতিভা, তান্ত্রিকের দারুণতা চাই না, বৈষ্ণবের উদাসীনতাও চাই না, চাই তান্ত্রিকের শক্তি, সাহস, একাগ্রতা, চাই বৈষ্ণবের তৃণাদপি সুনীচতা, চাই তরোরিব সহিষ্ণুতা, চাই তান্ত্রিকের শনিকুজদিনের অমাবস্যানিশীথে শত শবদেহ সঙ্কুল শ্মশানে অশঙ্কিত মন, অকম্পিত চরণ, চাই বৈষ্ণবের মদিরা

বিহ্বল প্রহারপরায়ণ অত্যাচারী অধমজনকে প্রেমালিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিবার ক্ষমতা। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের কঠোরতা চাই, বর্ণাশ্রমের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে থাকিয়াও সমপ্রাণতা, সহানুভূতি, সভক্তিপ্রণতি চাই, ব্যবধানেও অটুট প্রেম অনন্ত শ্রদ্ধা চাই।

মা সর্ব্বদে! ভারতের সমস্ত অভাব পূরণ করিয়া দাও। দগ্ধ ভোগবাসনার হোমীয় ভস্ম তিলক পড়াইয়া আমরণান্ত বিশ্বহিতব্রতে দীক্ষিত করিয়া জ্ঞানবিজ্ঞানভূষিত কনককান্তি ভূদেবগণকে আবার ভারতে প্রেরণ কর। তাহা হইলে আবার শান্তির মনোমোহিনী ছবি ফুটিয়া উঠিবে। সুখ প্রতিনিয়ত নব নব কমনীয়মূর্ত্তি প্রকাশ করিবে। আত্মহিতনিরত মৌনব্রত মুনি চাই না মা! চাই রামায়ণহস্তে বাল্মীকি, ভারতহস্তে দ্বৈপায়ন, চাই সমাজবারিধির বেলাভূমি সংহিতাহস্তে ঋষিকুল, চাই বহুশিষ্যসেবিত কুলপতি কণ্ব, চাই স্বভাবে শিশু, সুষমায় পূর্ণ যৌবন, মানবত্বের অফুরন্ত ভাণ্ডার তেজস্বী ব্রহ্মচারী শিষ্য, চাই "বজ্রাদপি কঠোর কুসুমাদপি মৃদু" সমুন্নত গুরুহৃদয়, চাই সর্ব্বদা পরহিতরত ধন্বন্তরির শান্তি মাখা রোগহারি রূপ, চাই মধুর কবিতা কুঞ্জে ভাববিভোর কালিদাস।

অসীম মহিমাময়ী মা! চির কল্যাণময়ি মা! এস, আবার বারিধি বিধৌত ভারতের শান্ত স্নিগ্ধ, প্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হও। ভারত তোমার পদপ্রান্তে কৃত সন্তানগণের নির্ম্মাল্যের মত মঙ্গল্য, রবিকিরণের মত পবিত্র ও প্রয়োজনীয় অধিষ্ঠান কামনা করে। যাঁহারা বিশ্বের মঙ্গলের জন্য আপনার অস্থি দিতে কুণ্ঠা বোধ করিবেন না। যাঁহাদের ধৈর্য্য আভিচার যাগে করাল মৃত্যুর রক্তদৃষ্টিতে, সাধনার অনন্ত অন্তরায়সঙ্কুলপথে হিমাদ্রির মত অচল অটল, যাঁহাদের জ্ঞান নেত্রের অগ্নিস্ফুলিঙ্গবর্ষিণী জ্যোতির্ম্মালায় পাপ, তাপ, আলস্য ভস্মীভূত হইবে, মোহমূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়া যাইবে। কৈ মা তোমার কথাশ্রমে শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত? যাঁহারা বীরকীর্ত্তি গৌরবমণ্ডিত সসাগর ধরাধীশ্বরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ন্যায়ভঙ্গের সময়ে অকুণ্ঠিত কণ্ঠের সুস্পষ্ট বচনে গৌরবোজ্জ্বল চন্দ্রবংশে বিনিপাতের আশঙ্কা জানাইতে পারিতেন। কৈ মা তোমার নৈমিষারণ্যের ষট্ত্রিংশৎ- ঋষিশোভিত নিখিলভারতের ধর্ম্মব্যবস্থাপক সভা? কোথায় ব্যাস বাল্মীকি সনক-সনাতন-বশিষ্ঠ প্রমুখ ঋষিগণ? আজ বদ্ধাঞ্জলি হইয়া তাহাদের চির কল্যাণময় বরেণ্য আবির্ভাব করিতেছি, চাই সর্ব্বঘটে

অক্ষয় অব্যয় মঙ্গলময় আবির্ভাব, চাই প্রবৃত্তি সংযত সুনীতি, শৃঙ্খলিত, সৌগত ধর্ম্মের মহাকলা চিরনিবৃত্তিও চাই না, শাক্তের প্রভূত কামনায় শোণিত-রঞ্জিত অনন্ত পিপাসাও চাই না, চাই সাধনার পথে আত্মানুভূতির উজ্জ্বল দীপ, চাই বিনয়শোভিত বিবেকের অমল শুভ্র জ্যোতিঃ, চাই দার্শনিকের সৃষ্টির সপ্তসমুদ্রপারগামিনী সূক্ষ্ম দৃষ্টি। জ্বালাও মা জ্ঞানের প্রফুল্ল আলোকমালা, সন্তানের নয়নে বিনয়ের তুলিকায় জ্ঞানের অঞ্জন পরাইয়া দাও যাহাতে মা আমরা বর্ত্তমান ভারতে প্রাচীন আশ্রমের বহু শিষ্য-শোভিত শান্তিময় প্রাঙ্গণ দেখিতে পাই, যেখানে জ্ঞানের হুতাশনশিখায় ত্যাগের স্বাহা মন্ত্রে ভোগবিলাস আহুতি প্রদান করা হইবে। আবার যেখানে লোকোত্তরচরিত গুরুর দৃষ্টিগোচর চরিত্রের ফুটন্ত গৌরব, স্বভাবের চারুসমুজ্জ্বল শিশুমূর্ত্তি শিষ্যগণ হাসিবে, খেলা করিবে, বেদ-বেদাঙ্গ পড়িবে, সুবৃত্তির অনুশীলন করিবে প্রভাতের কমলের মত ক্রমশঃ ফুটিবে, ক্রমশঃ উজ্জ্বল, উজ্জ্বলতর, উজ্জ্বলতম হইবে, ক্রমশঃ সদ্বৃত্তির সুগন্ধ দিগন্তে বিলাইবে; সংসারসমরাঙ্গণে মহারথীর যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে সর্ব্বপ্রযত্নে প্রয়াস পাইবে। গুরু দেখিবেন, আনন্দ পাইবেন, সাফল্যের পূর্ণাবয়ব দেখিয়া তপস্যা সার্থক মনে করিবেন।

কখনও স্নেহগর্ভশাসনের জনকমূর্ত্তি ধরিয়া শিষ্যগণের স্বৈরগতির অন্তরায় হইবেন, কখনওবা জননীর চির-শান্ত-শীতল জাহ্নবীমূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিয়া মাতৃস্নেহের চিরানন্দময় বৈজয়ন্তধাম দেখাইয়া শিষ্যগণের দুঃখ দৈন্য মলিন-আননে সরল হাসির জ্যোৎস্না ফুটাইবেন, লালনে, পালনে, শাসনে, বিদ্যাদানে, আহারে, বিহারে, সদাচারে, ব্যবহারে, কখনও কঠোরভাবে, কখনও কোমলভাবে আপনার জ্ঞানার্জ্জিত মহিমা প্রকাশ করিবেন। রাজেন্দ্রনন্দনে, দরিদ্র সন্তানে সমান আসনে, সমান বসনে, সমান ভূষণে রাখিয়া সম স্নেহের সৌম্যমূর্ত্তি দেখাইয়া বিভিন্ন ভবিষ্যতের উপযুক্ত শিক্ষা দীক্ষা প্রদান করিবেন। তাই বলি, এস মা জ্ঞানময়ী, প্রেমময়ী, ভক্তিময়ী, ত্রিতাপহারিণী, ভক্তি শ্রদ্ধা প্রীতির ত্রিবেণী সঙ্গমে ধর্ম্মদ্রবময়ী ভগবতি বাণি! জ্ঞানগঙ্গে! এস, প্রথমে মানবজীবনের প্রথম ও প্রধান তীর্থ গুরুকুলে অবতীর্ণ হও, ভোগলালসার বিষময় সংসার ত্যাগের পীযুষবর্ষী শিষ্যগণের মস্তকে বিজয় নির্ম্মাল্য অর্পণ করিয়া তোমার শ্রেষ্ঠ দানরূপে সমাজের হস্তে প্রদান কর। সমাজ আনন্দে অধীর হইবে, হৃদয়ে উৎসাহ শক্তির দশভুজা মূর্ত্তি দশবাহু বিস্তার করিয়া দাঁড়াইবে, বিশ্বের উচ্ছৃঙ্খল মহাসিংহ সেই শক্তির পদাঙ্গুলি স্পর্শে মস্তক

নত করিবে। তখন সমাজ দেখিবে, বামে কনককান্তি কমলা, দক্ষিণে বীণারঞ্জিত পুস্তকহস্তা তুমি মা ভারতী, রূপ দেখিয়া বিশ্ব চমকিত হইবে। ভারত নিখিল সিদ্ধির অমরবাঞ্ছিত সাফল্য লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে।

মা, নিখিল জগৎ সুখের অন্বেষণে ব্যস্ত; আনন্দের বাজারে অভীষ্ট বস্তু ক্রয় করিবার জন্য নিয়ত ব্যাকুল। এই বিষয়ের জন্য অনাদিকাল হইতে নানা জগতের নানা অংশে নানা পন্থা অবলম্বিত হইয়া থাকিলেও উদ্দেশ্য অভিন্ন। ভারতসন্তানগণও সেই নিয়মে অমৃতময়ী মা তোমার অমৃতময় স্পর্শে আনন্দ পাইবে, কৃতার্থ হইবে ভাবিয়া তৃষিত ব্যাকুল অন্তরে তোমার অন্বেষণে বাহির হইয়াছিল, পথিমধ্যে আপন ভাবিয়া যাঁহাকে তোমার মন্দিরে যাইবার পথ জিজ্ঞাসা করিল, দুর্ভাগ্যক্রমে আপনজন হইয়াও তিনি সম্পূর্ণ বিপরিত দিকে অঙ্গুলি হেলাইয়া বলিলেন—"যাও পশ্চিমদিকে"। প্রাচীদিগের গগনভরা তোমার বিশ্বরূপের ছটায় দিগন্ত আলোকিত হইতেছে। ভারতসন্তানগণ আপ্তবাক্য মনে করিয়া পাশ্চাত্যদিগাভিমুখে বহুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইল—বিপুল অট্টালিকাশীর্ষে তোমারই নামে লোহিত পতাকা উড়িতেছে। অভ্যন্তরের কক্ষে কক্ষে শুষ্ক জ্ঞানের পণ্যরাশি লইয়া এক এক জন বর্দ্ধিত বিলাসী বণিক শিরস্ত্রাণযুক্ত সুবর্ণ চসমাভূষিত গর্ব্বিত মস্তক উন্নত করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। সম্মুখে সমবেত সংখ্যাতীত মুগ্ধ বিস্মিত গ্রাহকদল হৃষ্টান্তঃকরণে নগদ মূল্যে জ্ঞানপণ্য ক্রয় করিতেছে। চতুষ্পার্শে ভিত্তিগাত্রে বিলাসের নানাবর্ণ চিত্রসমূহ গ্রাহকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। ভোগলালসা মনোরম কল্পনা, সুমধুর আশা, গ্রাহকগণের মনে প্রফুল্লতা আনয়ন করিতেছে। ভারতসন্তানগণ সেইখানে বহুকাল অপেক্ষা করিয়া দিনে দিনে পিতার আয়াসশতলব্ধ শোণিততুল্য অর্থরাশি জ্ঞানপণ্য বিক্রেতা বণিকসম্প্রদায়ের পাদপদ্মে ঢালিয়া দিয়াও সেই বিরাট অট্টালিকার মধ্যে কোথাও তোমার স্বরূপ দেখিতে পাইল না। কেবল স্থানে স্থানে দশাননাক্রান্ত বৈদেহির পরিত্যক্ত ছিন্নভিন্ন শোভাহীন আভরণের মত শোভাহীন রাশিকৃত পুস্তকমাত্র তোমার আভরণস্বরূপে দেখিতে পাইল। জ্ঞানপণ্য বণিক্‌সম্প্রদায় ঐ পুস্তকরাশির সাহায্যে গ্রাহকগণের নিকট হইতে বিপুল অর্থ আদায় করিতেছে। কিন্তু তোমার অমৃতময়ী মূর্ত্তি কোথাও দৃষ্টিগোচর হইল না।

আশ্রমের দেবতা তুমি, তোমায় অট্টালিকায় অন্বেষণ করিলে পাইবে কেন? বৈরাগ্যের প্রাণময়ী শক্তি তুমি, ভোগৈশ্বর্য্যের ভিতরে তোমার

প্রতিষ্ঠা হইবে কেন? ভোগবিলাসের আতিচারবাগে ত্যাগের মহামহিমময়ী দেবতার দর্শন লাভ কিরূপে সম্ভবপর হইবে? আজ্যাহুতিসুরভিত হোমাগ্নিশিখা শ্মশানে কোথায় মিলিবে?

জগতের চারিদিকে মা তোমার পুরাকালীন আশ্রমের ধ্বংসাবশিষ্ট চিহ্ন মাত্র লইয়া যে সমুদয় স্থান রহিয়াছে, তাহাতে ত্যাগ, সংযম বৈরাগ্য ও আত্মানুভূতির চিহ্ন পূর্ণপ্রকট না হইলেও লুপ্ত নহে। কিন্তু সে সমুদয় স্থানেও সবেমাত্র সাধনার আসন পাতিত হইয়াছে। আত্মশুদ্ধির মন্ত্র পঠিত হইতেছে মাত্র। সিদ্ধির সাফল্য সেখানেও ভবিষ্যতের তিমিরময় গর্ভে। উপসাধক এখনও সম্পূর্ণ প্রস্তুত নহেন। সুতরাং তোমাব অমৃতমূর্ত্তির দর্শন সেখানেও সম্পূর্ণ সম্ভব নহে।

বল মা, ভারতসন্তানগণ কোথায় দাঁড়াইয়া তোমার দর্শনলাভ করিবে। তাহারা অমৃত অন্বেষণ করিতে যাইয়া বিষভাণ্ড হাতে পাইয়াছে। মরীচিকা ভ্রমে আসিয়া মরুকান্তারে পতিত হইয়াছে। মঙ্গলময়ি মা। শুভপন্থা নির্দ্দেশ কর, কর্ণে কর্ণে দীক্ষার মোক্ষপ্রদ* মধুর মন্ত্র উচ্চারণ কর। গুরুকুল জাগ্রত কর। ভাতর পুর্ণ্যময় হউক্। ভারতীয় শিষ্যগণ জয়যুক্ত হউক্। জ্ঞানের সুরধুনীধারা শিষ্যগণের হৃদয়ে অসীম শক্তিসঞ্চার করুক্। এস মা এস।

শ্রীরজনীকান্ত কাব্য-পুরাণ-তীর্থ

জীবন-সঙ্গিনী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতেব পব)

দৈববলের যে কি অপার মহিমা তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইবার জন্যই যেন আজ অবাঙ্‌মনসোগোচর সর্ব্বশক্তিমান ভগবান বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। যাহার ইঙ্গিতে সৃষ্টি, স্থিতি, লয় হয়, সামান্য শক্তি সম্পন্ন নরগণের বিস্ময় উৎপাদন করা তাঁহার পক্ষে যে একটী গুরুতর কার্য্য তাহা যেন কেহ কখনও মনোমধ্যে ধারণা না করেন। কারণ তাঁহার মোহকরি মায়াতেই জগৎ মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে। ঐ দেখুন কোথা হইতে কেমন করিয়া কতচক্ষুর অগোচরে দুই সভার মধ্যস্থলে দুইটী সিংহাসনোপরি জীবন ও সঙ্গিনীকে আনিয়া

উপস্থিত করিয়াছেন। উঁহাদের অপরূপ রূপ-লাবণ্যের জ্যোতিতে ও মন নয়নের তৃপ্তিকর বসন ভূষণের প্রভাতে যেন সভাস্থল আলোকিত হইয়াছে। দেখিয়া সকলেরই আনন্দের সীমা নাই। কেবল জয়ধ্বনি আনন্দধ্বনিতে সভাস্থল মুহুর্মুহু প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। জীবনের পিতার ও সঙ্গিনীর পিতার আনন্দ সাগর এত বেগে উদ্বেলিত হইয়াছে যে, বোধ হইতেছে উঁহারা আনন্দের বেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া যেন চক্ষু হইতে দুইটি প্রবল ধারা বাহির করিয়া দিতেছেন আর ধারার বিরাম না হওয়ায় যেন উঁহাদের হারানিধির মনোহর রূপ মাধুরী দেখিবার বিশেষ ব্যাঘাত হইতেছে। এই সময় পূর্ব্বোক্ত সেই জ্যোতীর্ম্ময় নামক সন্ন্যাসী সভামধ্যে অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়া সভাস্থ সকলকে সম্বোধন পূর্ব্বক জীবন ও সঙ্গিনীর নিরুদ্দেশ বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে লাগিলেন।

তিনি কহিলেন "জীবন সেই বরযাত্রীগণের বিশ্রামাগার গোপনে পরিত্যাগ করিয়া অতি দ্রুতপদে প্রান্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। গমন করিতে করিতে সম্মুখে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী অবলোকন করিয়া তথায় নিজের সাজ সজ্জাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল মাত্র একখানি মুখমার্জ্জনী (যাহার এক কোনে তাহার প্রশ্নের সঙ্গিনীদত্ত উত্তর বদ্ধ করিয়াছিল) লইয়া কৌপীনরূপে পরিধান করতঃ ঐ পুষ্করিণীর ঘাটে উপবেশন করিয়া কেবল জীবন-তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন এই সময় যামিনী ঘোর তিমিরাবৃতা। এই অন্ধকারময়ী যামিনীতে ভক্তবৎসল ভগবান জীবনকে কৃতার্থ করিবার মানসে গুরুরূপে তাহার নিকট আসিয়া দর্শন দিলেন এবং জীবনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—জীবন! তুমি গার্হস্থ্য সুখের মূল স্বরূপ পরিণয় সূত্র ছিন্ন করিয়া একাকী এই অন্ধকারময়ী রজনীতে এখানে বসিয়া কি জীবনতত্ত্ব আলোচনা করিতেছ? বুঝিয়াছি "জীবনের কত সময়" এই তত্ত্ববাক্যে তোমার তত্ত্বানুসন্ধানী বুদ্ধি তোমাকে সৎপথে আনয়ন করিয়াছে। এক্ষণে তুমি কোন্ বিষয় জানিতে ইচ্ছা কর? জীবন সেই তিমিরাবৃতা যামিনীতে অপূর্ব্ব জ্যোতিপূর্ণ কলেবর সৌম্য মূর্ত্তি বিশিষ্ট সেই মহাপুরুষকে দর্শন করিয়া ভক্তিভাবে ভূতল-লুণ্ঠিত মস্তকে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। প্রণামান্তে যুক্তকর হইয়া অতি কাতর স্বরে কহিলেন—

—"প্রভো! দীনের প্রতি যদ্যপি দয়া হইয়া থাকে তবে অনুগ্রহ করিয়া বলুন কোন্ উপায়ে স্থূল বুদ্ধি বিনির্ম্মিত সামান্য ঘটীকা যন্ত্রের সময় নিরূপণের ন্যায় জীবনের অতি মূল্যবান সময় নিরূপণ করিতে পারা যায়।" সেই মহাপুরুষ বলিলেন বৎস! এই স্থূলদেহের অভ্যন্তরে একটি অতি সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্ম্মিত ঘটিকাযন্ত্র

রহিয়াছে। "বাহ্যদৃষ্টি" থাকিতে সেই যন্ত্রকে দেখিতে পাওয়া যায় না ; কিন্তু বাহ্য-দৃষ্টির লোপ হইয়া যখন জীবনের অন্তর্দৃষ্টি সঞ্চার হইতে থাকে তখন হইতেই ঐ সূক্ষ্ম যন্ত্রের গতিবিধি ও কার্য্যকলাপ জীবের দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে। ঐ সূক্ষ্ম শরীররূপ যন্ত্র ও তাহার যন্ত্রী আত্মাতে দৃষ্টি পড়িলেই জীবের আত্মজ্ঞান লাভ হয় আর আত্মজ্ঞান হইতেই জীবের সংসার মোচন হইয়া থাকে। অতএব বাহ্য দৃষ্টির লোপ ও অন্তর্দৃষ্টির সঞ্চার জন্য কঠোর সাধন-ভজন ও সাধন ভজনের সঙ্গে সঙ্গেই বাসনা বর্জ্জন করিতে হয়। বাসনা বর্জ্জিত হইতে পারিলেই সংসারে থাকিলেও সংসারবন্ধনের ভয় আর থাকিবে না। অতএব বৎস! তুমি যদ্যপি কএকটী মন্ত্র বা উপদেশ গ্রহণ করিয়া জীবদৃষ্টির অগোচর মদীয় আশ্রম বিশিষ্ট এই সুরম্য উপবনে প্রবেশ করিয়া এইরূপ কৌপীনধারী অবস্থাতেই নির্ভয়ে ও নিরাপদে সাধন ভজন করিতে পার তবে অবিলম্বেই তুমি তোমার ধর্ম্মের সহায়-তার নিমিত্ত একটী সঙ্গিনী প্রাপ্ত হইবে। এই বলিয়া সেই মহাপুরুষ অন্তর্দ্ধান হইলেন। দেখিতে দেখিতে সেই বৃহৎ পুষ্করিণীটীও এক অপূর্ব্ব আশ্রম বিশিষ্ট অতি সুন্দর এক উপবনে পরিণত হইল। ঐ উপবন দর্শনে জীবনের সাংসারিক ভাব ও যা কিছু চিন্তা বর্ত্তমান ছিল সকলই অন্তর হইতে অন্তর হইয়া গেল। কেবল সেই মহাপুরুষের উপদেশ বাক্য গুলিই অন্তরে জাগরূক রহিল।"

"এদিকে সঙ্গিনী গোপন দ্বার অবলম্বনে বহির্গতা হইয়া দেখিলেন ঘোর অন্ধকারে আবৃত বিস্তীর্ণ প্রান্তর ও সন্মুখে একটী সরোবর। সেই ঘোরা যামিনীতে কোথাও কোন দিকে যাইবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া সরোবর সোপানে উপবিষ্টা হইয়া কেবল অশ্রুপূর্ণ নয়নে জীবনকেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ পূর্ব্বোক্ত সেই মহাপুরুষ ঐ কন্যার নিকটস্থ হইয়া জীবন বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে লাগিলেন এবং "কেবল জীবনের সেবাই তোমার ধর্ম্ম" এই সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করিয়া বলিলেন—"এই স্থানে লোকদৃষ্টির অগোচরে আমার আশ্রম বিশিষ্ট একটী রমনীয় উপবন আছে। সেই উপবনে একটী যুবক একাকী বাস করিয়া সাধন ভজন ও বাসনা বর্জ্জন রূপ উপাসনা করিতেছেন। তুমি তাঁহার ধর্ম্মের সহায়তার নিমিত্ত তাঁহার নিকট গমন করিয়া তাঁহার ভাবানুরূপ সেবা শুশ্রূষা করিতে থাক। সাবিত্রীর ন্যায় খ্যাতি লাভ করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে।" এই বলিয়া তিনি অদৃশ্য হইলেন। দেখিতে দেখিতে ঐ সরোবরও স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় অপূর্ব্ব আশ্রম বিশিষ্ট উপবনে পরিণত হইল।

সঙ্গিনী বিস্ময়াপন্ন হইয়া নির্নিমেষ লোচনে ঐ রমনীয় আশ্রম ও উপবনের অপূর্ব্বশোভা নিরীক্ষণ করিতে করিতে সংসারিক ভাব ও বাসনা সমূহ বিস্মৃত হইতে লাগিলেন এবং নিঃশঙ্কচিত্তে ঐ আশ্রমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে দেখিলেন কৌপীন ধারী একটী সুন্দর পুরুষ আশ্রমের শোভা সম্পাদন করতঃ একটী বৃক্ষ মূলে উপবেশন করিয়া আছেন ও অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে যেন আন্তরিক কোন গূঢ় তত্ত্বের ভাবনা করিতেছেন! সঙ্গিনী ঐ যুবা পুরুষকে দর্শন করিবামত্রেই যেন নবজীবন প্রাপ্ত হইলেন এবং ইতি পূর্ব্বে যে সমস্ত ক্লেশ ভোগ করিতেছিলেন তাহার উপশম বোধ করিয়া যেন এক অভিনব আনন্দে নিমগ্না হইলেন। সঙ্গিনী উহাকে সেই মহাপুরুষোক্ত ব্যক্তি জ্ঞানে তাঁহার নিকটবর্ত্তিনী হইয়া ভক্তি গদগদস্বরে "ভগবন্! এই দীন হীনা দুঃখিনীকে সঙ্গিনী করুন" বলিয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। যুবক চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন যেন একটি বিদ্যুল্লতা তাহার সম্মুখে পতিত রহিয়াছে ও তাহার অলৌকিক প্রভায় উপবন আলোকিত হইয়াছে। তিনি স্বীয় কর দ্বারা উহার কর-কমল ধারণ পূর্ব্বক যখন উপবেশন করাইলেন তখন বোধ হইল যেন কোন অপ্সরী শ্রেষ্ঠা তাহার মোহ উৎপাদান করিবার অভিলাষে আগমন করিয়াছেন। যাহা হউক, ঐ অসূর্য্যম্পশ্যরূপিনী কামিনী কে? তাঁহার এখানে আসিবার কারণ ও উপায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে পর তিনি আদ্যোপান্ত সমস্তই বর্ণন করিতে লাগিলেন। বর্ণনা শেষ হইলে, ইনিই যে আমার পরিণয়ের পাত্রী ও মহাপুরুষ-উক্ত সঙ্গিনী, তাহা কতকটা বুঝিতে পারিলেন। বিশেষরূপে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত যুবকের মনোমধ্যে আলোকের ইচ্ছা আবির্ভূত হইল। যেমন ইচ্ছার আবির্ভাব অমনি বিদ্যুতালোকে আশ্রম আলোকিত হইল। যুবক তাহার কৌপীন প্রান্ত হইতে সঙ্গিনীর প্রেরিত ও স্বাক্ষরিত প্রশ্নোত্তরটী বাহির করিয়া কহিলেন—দেখ দেখি এইটী কি তোমার হস্তাক্ষর লিখিত উত্তর? সঙ্গিনী নিজহস্তাক্ষর লিখিত উত্তর দেখিয়া বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে ঐ যুবকের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। বিস্ময়াপনোদনের পর কহিলেন "হাঁ ইহা আমারই হস্তাক্ষর লিখিত উত্তর। আপনার নিকট ইহা কেমন করিয়া আসিল। তবে আপনিই আমার পরিণয়ের পাত্র ও জীবনস্বরূপ সেই জীবন বলিয়া বোধ হইতেছে। দেখুন দেখি (কুন্তল-কবরীর অভ্যন্তর হইতে লিপি বাহির করিয়া) এই প্রশ্ন কি আপনার হস্তাক্ষর লিখিত?" যুবক লিপি হস্তে লইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন এবং

কহিলেন হাঁ ইহা আমারই স্বাক্ষরিত প্রশ্ন। প্রশ্ন হইতেছে এই যে' "মানব জীবনের উদ্দেশ্য কি?" উত্তর হইতেছে যে, ভগবৎ প্রীতি সাধনই মানব জীবনের উদ্দেশ্য; পরন্তু জীবনের প্রীতি সাধনই মানব জীবনের উদ্দেশ্য।"

এইরূপে লিপি ও প্রতিলিপি দৃষ্টে যখন উভয়েই উভয়ের মনোনীত পাত্র ও পাত্রী বলিয়া উভয়েরই সংশয় দূর হইল, তখন জীবন আশ্রমাধিকারী মহাপুরুষের আদেশানুসারে তাহাকে সংযত ভাবে থাকিতে ও ধর্ম্মের সহায়তা করিতে আদেশ করিলেন। সঙ্গিনীও নিজজীবন স্বরূপ জীবনের সহায়তার জন্য লজ্জাবস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক লজ্জাকে দূর করিয়া জীবন দত্ত কৌপীন মাত্র পরিধান করিলেন, ভয়কে পরিত্যাগ করিয়া নির্ভয়ে পত্র, পুষ্প, ফল, জলাদি আহরণ করিবার নিমিত্ত ঐ উপবনে একাকিনী গমনাগমন করিবার অভিলাষে প্রস্তুত হইলেন এবং দুঃখের প্রতি ঘৃণা পবিত্যাগ পূর্ব্বক ধূলী শয্যাকে অতি সুখকর জ্ঞান করত সম্পূর্ণ জিতেন্দ্রিয় অবস্থাতেই পরমসুখে জীবনের সঙ্গে সঙ্গিনীরূপে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। সঙ্গিনী জীবনের সকল কার্য্যের সহায়তা ও সেবা শুশ্রূষায় সহধর্ম্মিণীর ন্যায় নিযুক্তা রহিলেন এবং অবকাশ পাইলেই জীবনের নিকট হইতে মহাপুরুষ প্রদত্ত আত্মজ্ঞান শিক্ষা করিতে লাগিলেন। এতদ্ব্যতীত সময়ে স্ত্রীধর্ম্ম, নাম মাহাত্ম্য, গার্হস্থ-ধর্ম্ম ও ভগবানের বিবিধ লীলাগুণাদির প্রতি অকৃত্রিম প্রীতি সংস্থাপন পূর্ব্বক বাসনা ক্ষয় ও আত্মজ্ঞান লাভ করিতে লাগিলেন।"

এইরূপে জ্যোতির্ম্ময় সন্ন্যাসী উঁহাদের নিরুদ্দেশ বৃত্তান্ত শেষ করিয়া,জীবনের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক সিংহাসন হইতে নামাইয়া'বলিলেন বৎস জীবন! এক্ষণে তুমি তোমার সঙ্গিনীর হস্ত ধারণ করতঃ সিংহাসন হইতে নামাইয়া দাও এবং তোমার পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজন ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনগণের নিকট গমন করিয়া তাঁহাদিগকে উপযুক্ত বিধানে প্রণাম প্রদক্ষিণ, অভিবাদন ও কথোপকথনাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে থাক। ঠিক রাত্র দ্বিপ্রহরের সময় আমি পুনরায় আসিয়া তোমাদের শুভ উদ্বাহ কার্য্য বিধি অনুসারে সম্পাদন করিব; এখন আমি চলিলাম। এই বলিয়া তিনি ঐ একত্রভূতা সভাদ্বয়ের চারিদিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক যেন কি এক মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।

জ্যোতির্ম্ময়ের এই করুণ দৃষ্টিপাত ও মন্ত্রোচ্চারণের গুণেই হউক বা সেই আশ্রম দেবতা মহাপুরুষের যোগ বলেই হউক ঐ সভাদ্বয়ে সমাগত ব্যক্তি মাত্রেরই-উদর যেন হঠাৎ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সকলেরই মনে হইতে

লাগিল যেন তাহারা বিবিধ প্রকারের অতি উপাদেয় অন্নব্যঞ্জন ও মিষ্টান্নাদি ভোজন করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন।

এদিকে জীবন ও সঙ্গিনী সিংহাসন হইতে অবতরণ করিয়া যেমন মৃত্তিকায় পদার্পণ করিলেন অমনি সংসারের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত তাঁহাদের স্মরণ হইল এবং স্ব স্ব পিতা মাতা ও আত্মীয় স্বজনগণকে জানিতে পারিয়া একে একে তাঁহাদের সকলের নিকটেই গমন করিয়া প্রণাম ও অভিবাদনাদিদ্বারা সকলকেই সম্মানিত করিতে লাগিলেন। জীবনের পিতামাতা জীবনকে এবং সঙ্গিনীর পিতামাতা সঙ্গিনীকে ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক আনন্দাশ্রুতে অভিষিক্ত ও মস্তকাঘ্রাণাদিদ্বারা বাৎসল্য স্নেহের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। পরে উহাদিগকে আপন আপন গৃহে লইয়াগিয়া, নানাবিধ ক্ষীর সর, নবনীত, প্রভৃতি উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন ও সুবাসিত পানীয় জল ভোজন পানার্থ প্রদান করিলেন। উহারাও বহুদিনের পর জনক জননীর স্নেহামৃত মাখা ভক্ষ্যদ্রব্য সাগ্রহে ভোজন করিয়া যার পর নাই তৃপ্ত ও সন্তোষলাভ করিলেন। ভোজনান্তে উহাদের নিরুদ্দেশ হওন ও তজ্জন্য উহাদের জনক জননীর শোকদুঃখাদি সম্বন্ধে কথোপকথন হইতে হইতে রজনী দ্বিপ্রহর সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। এই সময়ে সেই জ্যোতির্ম্ময়পুরুষ আগমন করিয়া সভাস্থ সকল ব্যক্তির সমক্ষে জীবন ও সঙ্গিনীর শুভ পরিণয় কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া যখন উহাদিগকে এক সিংহাসনে বসাইলেন তখন বোধ হইল যেন নীল নীরদ পার্শ্বস্থিত সৌদামিনী হাস্য করিতেছে, অথবা শ্যামগিরি যেন বিদ্যুল্লতিকা বেষ্টিত হইয়া বিরাজ করিতেছে এই প্রকৃতি ও পুরুষের অপূর্ব্ব মিলন সন্দর্শনে সকলেই যে বিশেষ প্রীতি-লাভ করিয়াছিলেন। তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

বাস্তবিক, সৎগুরুরউপদিষ্ট সাধন ভজনরূপ প্রণালী অনুসারে বুদ্ধিরূপা সঙ্গিনী অর্থাৎ প্রকৃতিকে জীবনরূপ পুরুষ বা ব্রহ্মের সহিত মিলন অথবা প্রকৃতিরূপা জীবাত্মাকে পুরুষরূপী পরমাত্মা ব্রহ্ম বা শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন করাই মানব জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। পরন্তু আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনাদি পাশব বৃত্তি চরিতার্থ করিয়া শ্রেষ্ঠ মানবজীবন কলুষিত ও অধঃপতিত করা মানুষ আধ্যাত্মধারী জীবের কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া ধারণা করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে।

মহাপুরুষাদিষ্ট জ্যোতির্ম্ময়, জীবন সঙ্গিনীর শুভ উদ্বাহ বিধান

সুসম্পন্ন করিয়া সঙ্গিনীর পিতাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন—আপনাদের সামাজিক আচারানুসারে অতঃপর যাহা যাহা কর্ত্তব্য তাহা সম্পাদনার্থ আপনার কন্যা ও জামাতাকে লইয়া গৃহে গমন করুন। আগামী উষাকাল পর্য্যন্ত তপোবলাকৃষ্ট এই জনপদও সংভাদ্বয় এইরূপ অবস্থাতেই থাকিবে কিন্তু অরুণোদয়ের পূর্ব্বেই পুনরাকৃষ্ট হইয়া স্ব স্ব স্থানে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে। অতএব উভয় স্থানের ব্যক্তিবর্গকে অরুণোদয় কালের পূর্ব্বেই নিজ নিজ স্থানে অবস্থান করিতে বলিবেন। আর আপনার জামাতা ও কন্যাকে ঐ সময়ের মধ্যে আপনার বৈবাহিক নিকেতনে পাঠাইয়া দিবেন। অনন্তর তিনি জীবনের পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকেও ঐরূপ উপদেশ দিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। উপদেশ মত কার্য্য সাধন করিতে উভয়েই প্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

এইবার অধ্যাপকের বিচার। অধ্যাপক মণ্ডলীও এই বিস্ময়কর ব্যাপার পরিদর্শনজন্য সমাহূত হইয়া উৎসুকচিত্তে আগমন করিয়াছিলেন এবং দৈবের অসম্ভব ও বিচিত্রগতি প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া যার পর নাই বিস্ময়াপন্নও হইয়াছেন এমন কি "দৈবেনদেয়মিতি কাপুরুষাবদন্তি" এই বাক্যের উপর আস্থা রাখিয়া যেসমস্ত তার্কিক তর্ক বিতর্কাদিদ্বারা লোকের মনোরঞ্জন করিতেন তাঁহারাও বিষমভ্রমে পড়িয়া ঐ বাক্যের উপর আস্থা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। এখন দেখাযাউক বিচার ও বিচারের সিদ্ধান্ত—তর্কালঙ্কার মহাশয়—যাঁর ঐ বাক্যের উপর সুদৃঢ় আস্থা তিনি আসিতেছেন দেখিয়া, ন্যায়লঙ্কার মহাশয় হাস্য সহকারে বলিতেছেন,—"বলি ওহে তর্কালঙ্কার ভায়া! এমন মহতীসভা যুগলের মধ্যে তর্কাদিত্যাগ করে চুপ্‌চাপ্‌ ক'রে বেড়াচ্ছেন যে—ব্যাপারটা কি? তর্কালঙ্কার—আর দাদা! যা নিয়ে আমার তর্ক বিতর্ক, তারই ত মূলোচ্ছেদ হ'য়ে গেল। এখন উপায় কি? আমার ত আর সঞ্চিত অন্যকিছু নাই যে, তাইথেকে এক রকম দাঁড় করাব। ন্যায়লঙ্কার—আরে তোমায় ত আমি বরাবরই বলেআস্‌ছি, দেখ তর্কালঙ্কার পুরুষকারটা অহং পক্ষে ব্যবহার নয়, ওটা ছেড়ে দাও; দিয়ে "দৈবী বিচিত্রা গতিঃ।" স্বীকার কর। বিদ্যারত্ন—কার কথা বল্‌ছেন, তর্কালঙ্কারের কথা। ছেলে মানুষ বোঝে না। অধ্যাত্মরামায়ণে স্পষ্টই লেখা আছে যে, "বলবান বিধিরেবাত্র পুরুষত্বোহিদুর্ব্বলঃ।" বেদান্তবাগীশ আরে ওঁর কথা ছেড়ে দাও। উনি আমার সঙ্গে একদিন ঐ পুরুষকার নিয়ে

মহাতর্ক আরম্ভ করেছিলেন। তাতে আমি ওঁকে মহাকবি কালিদাস প্রণীত দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকার চতুর্দ্দশোপাখ্যানে বিক্রমাদিত্যোক্ত সেই—"নেতা যস্য বৃহস্পতিঃ প্রহরণং বজ্রংসুরা সৈনিকাঃ, স্বর্গো দুর্গমনুগ্রহঃখলুহরে-রৈরাবতো বাহনঃ। ইত্যাশ্চর্য্য বলান্বিতেহপি বলিভির্ভগ্নঃ পরৈঃসময়ে, তদ্ব্যক্তং নম্নু দৈবমেব শরণং ধক্ ধিক্ বৃথা পৌরুষম্॥" শ্লোকটী আওরাইয়া বুঝাইবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু না বুঝলে আর বোঝাব কি ক'রে। যাহা হউক এখন এই প্রত্যক্ষ ঘটনা দেখে উনি বুঝেছেন ত?" এই সকল কথা শুনিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয় অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন এবং ঐ সকল কথা চাপা দিবার জন্য বলিয়া উঠিলেন--দেখুন দেখি, জীবনের পিতার কি ভাগ্য; সর্ব্বগুণ সম্পন্ন নিরুদ্দেশ পুত্র সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা অপরূপ রূপলাবণ্য বিশিষ্টা প্রত্যক্ষ লক্ষ্মীস্বরূপা বধূর সহিত প্রত্যাগত হ'ল—শুধু তাই নয় আবার ঐ পুত্র পুত্রবধূর গুণে জীবনের পিতা ভগবানের অভেদমূর্ত্তি সাক্ষাৎ ভগবদ্ভক্তের অনুগ্রহ ভাজন পর্য্যন্ত হ'ল। ধন্য ভাগ্য, ধন্য ভাগ্য! তর্কালঙ্কারের এই কথা শুনিয়া বিদ্যারত্ন মহাশয় বলিলেন—আহা বেশ বলেছেন, এই খানে আপনার বিচারেই আপনি বুঝুন কেন যে ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র ন বিদ্যা নচ পৌরুষম্।" তর্কালঙ্কার—বুঝিলাম আপনার সিদ্ধান্তই প্রকৃত পক্ষে অকাট্য আর পুনঃপ্রযত্ন সর্ব্বৈব বৃথা। এই অধ্যাপক সংবাদ সকলেই এমন কি পুলিশ কর্ম্মচারীগণ পর্য্যন্ত স্বীকার করিলেন যে, দৈববলই বল—পুরুষার্থ কিছুই নয়, কেবল অহন্তা মমতার উদ্দীপক। এদিকে সিদ্ধান্তও শেষ হইল, ওদিকে উষাদেবীও যেন নবজাত অরুণ পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া আবির্ভূতা হইতে লাগিলেন। বর বধূ জীবনের পিতৃ নিকেতনে আসিয়া পৌঁছিল। যে সভা ও যেজনপদের যে যে লোক তাহাদিগকে সেই সেই সভা ও জনপদে সংস্থাপিত করা হইল। সভা ও জনপদ পূর্ব্ববৎ যোগবলে আকৃষ্ট হইয়া যথাস্থানে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল।

জীবনের মাতা প্রতিবাসিনী কুলকামিনীগণের সহিত মঙ্গলাচারে পুত্র ও পুত্রবধূকে গৃহপ্রবেশ করাইলেন এবং রামসীতার যুগলরূপের অপূর্ব্ব মাধুরী নির্নিমেষলোচনে নিরীক্ষণ করিতে করিতে আনন্দাতিশয্যে অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পরে বহুমূল্য যৌতুকাদির সহিত ধান্য ও দুর্ব্বাঙ্কুর দ্বারা উহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া লক্ষ্মীস্বরূপা বধূকে ক্রোড়ে স্থাপন পূর্ব্বক যেন স্বর্গীয় সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। নিজ ভাগ্যকে প্রশংসা

করিতে করিতে অসীম স্নেহভরে মুহুর্মুহু মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন। জীবনের পিতা আনন্দ পয়োধিতে ভাসিতে ভাসিতে বধূমাতাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গদগদ স্বরে বলিতে লাগিলেন,—"মা! তুমি আমার জীবন অপেক্ষাও স্নেহ ও আদরের জিনিস। তোমায় জীবনের সহিত মিলন করাইয়া করুণাময় পরমেশ্বর আমায় ভাগ্যবান করিয়াছেন সন্দেহ নাই। অতএব কৃতজ্ঞতার সহিত সেই পরম কারুণিক পরমেশ্বরের নিকট আমার কায়মনো বাক্যে প্রার্থনা এই যে, যেন তিনি তোমাদিগকে নিরন্তর শান্তিতে রাখেন ও যথা সময়ে ধর্ম্মপরায়ণ ও কুলপাবন পুত্রপ্রদান করেন।" যেমন এই আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ, অমনি আকাশবাণী হইল—"কুলপাবন ও সৎস্বরূপ চারিটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে।" সঙ্গিনী তাহার জননীস্বরূপা শ্বশ্রূমাতার অকপট স্নেহ ও আদরে এবং জনক সদৃশ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শ্বশুর মহাশয়ের শুভাশীর্ব্বাদ সম্বলিত মধুরবাক্যে পরম প্রীতি লাভ করিয়া উহাদিগকে দেবতা জ্ঞানে উহাদিগের প্রতি কিরূপ আচরণ করা কর্ত্তব্য এতক্ষণ তাহাই মনে মনে চিন্তা করিতেছিলেন। কিন্তু যেমন আকাশবাণী তাঁহার কর্ণগোচর হইল, অমনি গার্হস্থ্যাশ্রম সম্বন্ধে গুরুর উপদেশ সমূহ তাঁহার অন্তরে জাগরূক হওয়ায় গাত্র রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। তখন তিনি অন্তরের ভাব গোপন রাখিতে না পারিয়া ব্রীড়া অপসরণ করিয়া পিককণ্ঠ বিনিন্দিত শ্রুতি সুখকর অতি মধুর স্বরে কহিলেন—"আর্য্য! আপনাদের আশীর্ব্বাদে গার্হস্থ্যাশ্রম সম্বন্ধে গুরুদেব দত্ত সমস্ত উপদেশই আমার স্মরণ হইয়াছে। অতএব এইক্ষণ হইতেই আমি আপনাদের সেবা শুশ্রূষা ও সাংসারিক কার্য্য সম্পাদনে নিযুক্তা হইলাম।" এই বলিয়া তিনি শ্বশুর ও শ্বশ্রূমাতাকে প্রণাম ও তাঁহাদের পদরেণু মস্তকে ধারণ করিয়া সেই দণ্ডেই সংসার ক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইলেন অর্থাৎ সংসারাশ্রমের কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিতে আরম্ভ করিলেন। জীবনও পিতামাতার চরণ বন্দনা করিয়া সঙ্গিনীর সহিত গৃহপ্রবেশ পূর্ব্বক সংসারাশ্রমের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে যত্নবান হইয়া বলিতে লাগিলেন;—"প্রত্যহ প্রাতঃস্নানান্তে গুরুদেবের কুশ পাদুকা ও গুরুজনের পূজার আয়োজন করিয়া দিবে। তৎপরে গুরুজনের পাদপূজা ও বন্দনাদি সমাপন করিয়া "সাংসারিক কার্য্য ধর্ম্মত ও সুশৃঙ্খলায় যেন সুসম্পন্ন করিতে পারি ও তাহাতে যেন ভূতভাবন ভগবান প্রীত হন" এই বলিয়া প্রার্থনা করিবে। এই প্রার্থনান্তে তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করতঃ পাচক পাচিকা

ও দাস দাসীগণের যাহা যাহা আবশ্যক তাহা তাহা বিবেচনা পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রদান করিবে। সঞ্চয়াগার অর্থাৎ ভাণ্ডারমধ্যে পবিত্রভাবে প্রবেশ করিয়া সঞ্চিত দ্রব্যাদির ন্যূনতা পর্য্যবেক্ষণ করিবে। ভোজনার্থীর সংখ্যা অবগত হইয়া তদুপযুক্ত দ্রব্যসামগ্রী রন্ধনার্থ নিজহস্তে প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। ভক্ষ্যবস্তু জীবনের সার সামগ্রী; অতএব ইহার পবিত্রতা ও সুপক্বতা সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত হইলে নিজহস্তে ভোজনের স্থান প্রস্তুত করিয়া গুরুজন, কুটুম্ব ও বালক বালিকাদিগকে অগ্রে ভোজন করাইবে এবং যতক্ষণ না তাঁহাদের ভোজন সমাপ্ত হয়, ততক্ষণ তাঁহাদের নিকট উপস্থিত থাকিয়া কাহার কি প্রয়োজন তাহা পরিদর্শন করিবে। ভোজনান্তে তাঁহাদিগকে তাম্বুলদান ও বিশ্রামস্থান প্রদান পূর্ব্বক অতিথি অভ্যাগত ও দাস দাসীগণের ভোজনের আয়োজন করিবে। উহারা ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইলে পর নিজে যথাবশিষ্ট ভোজন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়া কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিবে। সায়ংকালে সন্ধ্যাবন্দনাদির আয়োজন ও তৎপরে আবার ভোজনাদির বাবস্থা ঐরূপ ভাবেই সম্পাদন করিবে আর এই সমস্ত কার্য্যে সদাসর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকিবে। এইত গেল সাংসারিক মোটামুটী বা সংক্ষিপ্ত কার্য্য। এখন এই সঙ্গে গুরুদেবের যে সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্মের উপদেশ দিয়াছেন তাহা তোমার স্মরণ থাকিলেও পুনরায় আমি বর্ণনা করিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণকর।„—"ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া অবসন্ন হইলেও কদাপি অধর্ম্মে মনোনিবেশ করিবে না। অধর্ম্মেরদ্বারা প্রথমে সুখ বৃদ্ধি হয়, কিন্তু পরে পুত্র বা পৌত্রে তাহার ফল হয়; শেষে সমূলে তাহার বিনাশ হয়। সত্যধর্ম্ম সদাচার ও শুচিত্ব বিষয়ে সতত অভিলাষ করিবে; শিষ্য, পত্নী, পুত্র, ছাত্র, ভৃত্য ইহাদিগকে ধর্ম্মানুসারে শাসন করিবে। সত্য কথনদ্বারা বাক্য সংযম করিবে, বাহুবলে কাহারও পীড়া উৎপাদন না করিয়া বাহুসংযম; যথালব্ধ আহার দ্বারা উদর সংযম করিবে। ধর্ম্মের বিরোধী অর্থ, ও কামনা পরিত্যাগ করিবে। হস্ত, পদ, নয়ন, ও বাক্যের চঞ্চলতা পরিত্যাগ করিবে। যম অর্থাৎ দয়া, ক্ষমা, ধ্যানাদি অন্তঃকরণের ভাবশুদ্ধি এবং নিয়ম—অর্থাৎ স্নান, উপবাস, বেদাধ্যয়ন, ইন্দ্রিয় সংযম ও শুশ্রূষা—এই যম ও নিয়ম উভয়ই পালন করিবে। সত্য অথচ প্রিয়কথা বলিবে। যাহা অপ্রিয় অথচ সত্য, তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক বলিবে না। কিন্তু প্রিয় হইলেও মিথ্যাকথা কখনই বলিবে না। একবস্তুকে অন্য বস্তুবলিয়া প্রকাশ করিবে

না কাহারও মনে কষ্ট দিবে না। আপনার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিবে না। ব্রাহ্মণাদির ছায়ালঙ্ঘন করিবে না। সরল হইবে। কুটিলতা, কপটতা, বকধার্ম্মিকতা, বিড়ালব্রতিকতা, ধর্ম্মধ্বজিত্ব ত্যাগ করিবে, যে আপনাকে অন্যথাভূত করিয়া প্রকাশ করে তাহার পাপ অসীম। দম্ভ, মাৎসর্য্য ত্যাগ করিবে। অভিমানী হইয়া থাকিবে না। যাহার যেরূপ মর্য্যাদা, তদনুসারে তাহাকে অভিবাদনাদি করিবে। আচার্য্য, পুরোহিত মাতৃপক্ষীয় এবং পিতৃপক্ষীয় গুরুজন, গৃহাগত, আগন্তুক, অনুজীবী, বালক, বৃদ্ধ, বৈদ্য, জ্ঞাতিকুটুম্ব, মাতা, পিতা, ভগিনী, পুত্র, পত্নী, কন্যা, ও ভৃত্যবর্গ —ইহাদের সহিত এমন সম্পর্ক যে, মনের কষ্ট ও বিবাদের কারণ উপস্থিত হইলেও তাহা পরিহার করিয়া ইহাদের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিতে হয়, পরহিংসা বা পরনিন্দা করিবে না। কটু ও কর্কশ বচন বলিবে না যান, শয্যা, আসন, কূপ, উদ্যান, গৃহাদি বাহিরের বস্তু (অব্যবহৃত থাকিলেও) সে ব্যক্তি না দিলে লইবে না। পরদারাভিগমন অপেক্ষা পাপ ইহলোকে আর নাই। আরব্ধকর্ম্ম সমাপন করিতেই হইবে, এইরূপভাবে যাঁহার দৃঢ়তা আছে, যাঁহার শান্ত স্বভাব, যিনি শীতাতপাদি দ্বন্দসহিষ্ণু, যিনি ক্রুরাচারী দিগের সংসর্গে থাকেন না; তিনি ইন্দ্রিয় সংযম ও দানাদি দ্বারা স্বর্গ লাভ করেন। বালক, বালিকা, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, পোষ্য ও ভৃত্যবর্গকে আহার করাইয়া গৃহস্থদম্পতি শেষে ভোজন করিবে। দান ও প্রতিগ্রহ বিষয়ে পাত্র পাত্র বিচার কর্ত্তব্য। বিদ্যা ও তপস্যা সম্পন্ন ব্রাহ্মণ দানের বিশিষ্ট পাত্র। কেহ কিছু প্রার্থনা করিলে, দ্বেষ না করিয়া যথাশক্তি দান করিবে। কখন দানের এমন সৎপাত্র উপস্থিত হইতে পারেন, যাঁহাকে দান করিলে সর্ব্ব প্রকার উদ্ধার পাওয়া যায়। ধন, ধান্য, অন্ন, বস্ত্র, দীপ, ভূমি, স্বর্ণ, রৌপ্য, গৃহ, গো, যান, এই সকল বস্তু দানের পক্ষে উৎকৃষ্ট। ভীতকে অভয় দানাদি অন্যবিধ দানও আছে। বিদ্যাদান সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বিনিতভাবে শ্রদ্ধাসহকারে দান করিতে হয়। যে অশ্রদ্ধা পূর্ব্বক বা দম্ভভাবে দান করে, অথবা দান করিয়া তাহার ঘোষণা ও গৌরব করে, তাহার দানে ফল হয় না। বিচার করিয়া অন্নগ্রহণ করিবে, মত্ত, ক্রোধী, ব্যধীযুক্ত, পিশুন, কৃতঘ্ন, কূটসাক্ষী নিষ্ঠুরকর্ম্মা, গোঘাতী, ভ্রূণঘাতী, চৌর, কুবৃত্তিজীবী, রজস্বলাস্ত্রী, ভ্রষ্টাস্ত্রী, ভ্রষ্টাস্ত্রীর ভর্ত্তা,—এই সকল লোকের অন্ন; এবং কেশ কীটাদি যুক্ত, পদস্পৃষ্ট পর্য্যুষিত বা কাকাদি পক্ষী ও পশুর উচ্ছিষ্ট অন্ন আহার করিবে না।

নদী তড়াগাদিতে প্রত্যহ স্নান করিবে। বিষ্ঠা মুত্রাদি দূরে ত্যাগ করিবে। জলে রক্ত, শ্লেষ্মা, বিষ্ঠা মুত্রাদি নিঃক্ষেপ করিবে না। অন্তর্বাহ্য শুচি থাকিবে। মঙ্গলাচারযুক্ত হইবে। সর্ব্বদা শাস্ত্রালাপেরত এবং তপস্তাপরায়ণ হইয়া পরলোকে সাহায্যার্থ ধর্ম্মসঞ্চয় করিবে। গো সেবাও ধর্ম্মসঞ্চয়ের একটী প্রধান উপায়। অতএব প্রত্যহ গো সেবা করিবে। আর এই কল কার্য্য ও সাংসারিক অন্যান্য কার্য্য যখন যাহা করিবে, সকলই ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত করা হইতেছে মনে করিয়া নিরন্তর মুখে "রাধাকৃষ্ণ" নাম উচ্চারণ করিবে। কারণ কলিকাল উপস্থিত হইয়াছে। কলিকালে নামের মহিমাই প্রবল। যে যুগল নাম তোমাদিগকে উচ্চারণ করিতে বলিলাম সেই নামের মহিমা যে কি তাহা বলিয়া শেষ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। তবে উচ্চারণ করিতে করিতে ফল পাইবার সময় কেবল অনুভব করা যায় মাত্র প্রকাশ করিতে পারা যায় না। রাধা প্রেমময়ী, তাই প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ কখনই পৃথক থাকিতে পারেন না। সেই জন্যই বোধ হয়, অগ্রে শ্রীমতীরাধার নাম উচ্চারণ করিয়া তৎপরেই শ্রীকৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করিতে হয়। এই যুগল নাম উচ্চারণের অভ্যাস করিতে করিতে যখন প্রকৃত ভক্তির উদয় হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রিত অভেদ মূর্ত্তি প্রেমময়ী রাধা ভক্তের ভক্তিরসাপ্লুত পবিত্র অন্তরে প্রবেশ করিয়া ভক্তের বিশুদ্ধ ভক্তি বলে বিপরীত ভাব ধারণ করতঃ নিজের রাধা নাম উল্টাইয়া দিয়া ধারা রূপে সেই ভক্তের নয়নদ্বার দিয়া প্রস্রবণের ন্যায় নিরন্তর বহির্গত হইতে থাকে। আর অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণ অন্তর হইতে অনন্তধারে প্রেমধারা ঠেলিয়া দিতে থাকেন। নামের ফল এইরূপে ফলিয়া থাকে। অন্যান্য ভক্তগণ টের পান না, কিন্তু যিনি ঐ ফলের মধু অপেক্ষাও সুমধুর রস আস্বাদন করেন তিনিই ঐ পরমানন্দ অনুভব করিতে পারেন, পরন্তু তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারেন না। যেমন মূকের রসাস্বাদন। রসের আস্বাদ টের পায়, কিন্তু প্রকাশ করিতে পারে না। অতএব এই তত্বটী যেন সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিয়া কোন ক্রমেই বিস্মৃত হইও না। কলিযুগে সংসারীর পক্ষে এইটীই সারতত্ব।"

সঙ্গিনী ভর্ত্তার আদেশ ও গুরুদত্ত উপদেশ সমূহ স্বামীমুখে শ্রবণ করিয়া, তাঁহার সন্তোষ সাধন ও আদেশ পালনার্থ শ্বশুর ও শ্বশ্রূ দেবীর অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক ঠিক্ সেইরূপ ভাবেই কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। অধিকন্তু কোন কোন দিন পাচিকা ও দাস দাসীগণকে অবকাশ দিয়া নিজেই উহাদের কার্য্য

সমূহ অতি আনন্দের সহিত সম্পাদন করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য ইহাতে তিনি বিন্দুমাত্রও বিরক্তি বা শ্রান্তি বোধ করিতেন না। প্রত্যুত উহাদের অপেক্ষা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া ফেলিতেন। বধূমাতার এই কার্য্য প্রণালী ও পাক পটুতার আশ্চর্য্য মধুরতা বিদিত হইয়া জীবনের পিতা মাতা ও আত্মীয় স্বজনগণ অতীব বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং সকলের নিকটেই শতধারে প্রশংসা ও ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। কেবল মুখে প্রশংসা বা ধন্যবাদ প্রদান করা নয়, তাঁহার এই অপ্রাকৃত গুণ সমূহের প্রত্যক্ষ পরিচয় প্রদান করিবার মানসে পাকস্পর্শ উপলক্ষ্যে একদিন দেশস্থ ও একদিন দূর দেশস্থ কুটুম্বাদি করিয়া প্রায় দুইশত লোককে নিমন্ত্রণ করিলেন এবং বহু পরিমানে পাচক ও দাস দাসী নিযুক্ত করিয়া বধূমাতাকে কেবল পাক প্রণালী পর্য্যবেক্ষণের ভারার্পণ করিয়া নানাবিধ সামগ্রীর বিপুল আয়োজন করিতে লাগিলেন। সঙ্গিনী এই বিপুল আয়োজন ও প্রচুর লোক নিয়োগের অনাবশ্যকতা নিজ পতিকে জানাইয়া কহিলেন যে, যে গুরুদেবের কৃপায় অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের জীব অশন পানাদি প্রাপ্ত হইয়া পরিতৃপ্ত হইতেছেন, সেই গুরুদেবের প্রসাদ স্বরূপ কুশ পাদুকা প্রাপ্ত হইয়াও বিনা আয়োজনে দুই শত কি পাঁচশত লোকের উপযোগী উপাদেয় অন্নাদি প্রদান করিবার শক্তি কি আমার নাই ? জীবন কহিলেন গুরুদেবের কৃপায় শক্তির অভাব হয় না বটে, কিন্তু অলৌকিক বা অমানুষিক কার্য্য লোক সমাজে প্রকাশ হইয়া পড়িলে সাধন ভজনের বিস্তর ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। অতএব আয়োজন হইতেছে হউক, তোমার কর্ত্তব্য তুমি গোপনে সম্পাদন করিও। সঙ্গিনী কহিলেন যে আজ্ঞা, তাহাই হইবেক (ঈষৎ হাস্য সহকারে) আপনাকে কিন্তু পরিবেশন করিতে হইবে। জীবনও ঈষৎ হাস্য সহকারে নর্ম্মবাক্যে কহিলেন গৃহ মধ্যে বসিয়া থাকিয়া বাহবা লইবে তুমি ; আর খেটে মরিব বুঝি আমি। সঙ্গিনী তদুত্তরে বলিলেন শক্তি শক্তি সঞ্চারিত না করিলে কি পুরুষ কার্য্যক্ষম হয় ? জীবন কহিলেন বিবাদ করিবে না কি ? জগতের নিমিত্তই প্রকৃতি ও পুরুষ ; শুদ্ধ প্রকৃতি নহে। সঙ্গিনী কহিলেন এ বিবাদ বিপদজনক নয় ; অজাযুদ্ধবৎ দাম্পত্য কলহ। উত্তরেই উভয়ের মুখ নিরীক্ষণ করিতে করিতে হাস্য করিতে লাগিলেন। রজনীও প্রভাতা হইল। ক্রমে পাকস্পর্শের দিন উপস্থিত হইল।

ঐ দিন অরুণোদয় হইবার পূর্ব্বেই দম্পতি যুগল প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মাগণের নামোচ্চারণ করিতে করিতে শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শৌচাদি ক্রিয়া সমাপন করত

প্রাতঃস্নানার্থ গমন করিলেন। স্নানান্তে সঙ্গিনী পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে পূজার আয়োজন শেষ করিয়া স্বামীর সহিত আপনাদের পূজা গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং দুইটী সিংহাসনের কুশ-পাদুকাদ্বয়ের পূজা শেষ হইলে, সঙ্গিনী স্বামী চরণের পূজা ও বন্দনাদি শেষ করিলেন। পরে উভয়েই সিংহাসন সমীপে করযোড়ে দণ্ডায়মানা হইয়া ঐ পাকস্পর্শের ব্যাপার অতি কাতর স্বরে নিবেদন করিতে লাগিলেন। প্রার্থনা শেষ হইলে পাদুকাদ্বয় হইতে মৃদু মৃদু বাণী নিঃসৃত হইতে লাগিল। বাণী বলিতে লাগিলেন—"ভয় নাই। সংগৃহীত দ্রব্যাদির এক এক মুষ্টি পরিমিত সামগ্রী সঙ্গে লইয়া সঙ্গিনী পবিত্রভাবে রন্ধনগৃহে প্রবেশ করিলেই নিমিষ মধ্যে এত প্রচুর অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত হইয়া থাকিবে যে, দিন রাত্রি ধরিয়া যথেচ্ছা পরিমাণে পরিবেষণ করিলেও শেষ হইবে না। এই দিন রাত্রির মধ্যে ভোজনার্থী হইয়া অসংখ্য অসংখ্য লোক সমাগত হইলেও অন্ন ব্যঞ্জনাদির কিছু মাত্রও অভাব হইবেনা। প্রত্যুত সকলেই ভোজন করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিবে।" বাণী শেষ হইলেই দম্পতিযুগল পরমানন্দের সহিত সিংহাসনস্থিত ঐ পাদুকা দ্বয়েকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করতঃ পূজাগৃহ হইতে বাহির হইয়া পিতা মাতা ও অন্যান্য গুরুজনগণের চরণ বন্দনাদি শেষ করিলেন এবং উঁহাদের আশীর্ব্বাদ গ্রহণান্তে সঙ্গিনী মুষ্টি পরিমিত দ্রব্যাদি বৃহৎ একটী পাত্রে সাজাইয়া লইয়া রন্ধনাগারে প্রবেশ করিলেন। জীবন অন্যান্য কার্য্যের পর্য্যবেক্ষণে নিযুক্ত থাকিবার অভিপ্রায়ে পিতা মাতার অনুজ্ঞা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের নিকট গমন করিয়া তাঁহাদিগকে গুরুদত্ত কুশপাদুকা নিঃসৃতবাণী যাহা বলিয়াছেন, আদ্যোপান্ত সমস্তই নিবেদন করিলেন এবং এই সমস্ত অলৌকিক কাণ্ড জনসমাজে যাহাতে প্রকাশ না হয় তজ্জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন। জনক জননী পুত্র ও পুত্রবধু এই প্রকার অমানুষিক গুণে উঁহাদিগকে কোন দেবদেবীর অংশ সম্ভূত জ্ঞান করিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলেন এবং পুত্রকে পুত্রের অভিপ্রায় মত সকল কার্য্যে পর্য্যবেক্ষণ ও পরিবেষণের ভার গ্রহণ করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। আর পাচক ব্রাহ্মণদিগকে তাঁহাদের উপযুক্ত অন্যবিধ কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়া দাস দাসীদিগকে যেখানে যেমন আবশ্যক সেখানে সেইরূপ নিয়োগ করিলেন। আপনি কেবল নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের সমাদর ও অভ্যর্থনাদি কার্য্যের জন্য সতত প্রস্তুত রহিলেন। এদিকে এই রূপ সুবন্দোবস্ত অবধারিত হইল—ওদিকে অন্ন ব্যঞ্জনাদি সমস্তই

প্রস্তুত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিল। যেমন সংবাদ আসিল, অমনি জীবন দ্বিগুণ উত্তমের সহিত তিনশত ব্যক্তির উপযুক্ত পাত্রে অন্ন ব্যঞ্জনাদি সুসজ্জিত করিয়া রাখিলেন। বেলা দশটা হইতে দ্বিপ্রহরের মধ্যে প্রায় তিনশত নিমন্ত্রিত ব্যক্তি একত্র সমাগত হইলে উহাদিগকে ভোজনে উপবেশন করিবার নিমিত্ত আহ্বান করা হইল। ভোজনার্থ আসনে উপবেশন করিবা মাত্রই ঐ অন্ন ব্যঞ্জনাদির এক অলৌকিক ও মনোহর আঘ্রাণে সকলেরই ভোজনে আগ্রহ ও স্পৃহা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অন্ন ও বহুবিধ ব্যঞ্জনাদির এক এক রকম যেমন জিহ্বাগ্রে স্পৃষ্ট হইতে লাগিল, অমনি আস্বাদে প্রত্যেক গুলিই যেন অতি মধুর, এমন কি অমৃতের স্বাদ জানা না থাকিলেও যেন অমৃত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এই অমৃতবৎ স্বাদু অন্ন ব্যঞ্জনাদি সকলেই ভোজন করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করত আচমনান্তে তাম্বুল গ্রহণ পূর্ব্বক প্রহৃষ্টান্তঃকরণে পাক প্রকরণের বহুবিধ যশ ঘোষণা করিতে করিতে গমন করিতে লাগিল। অবশিষ্ট নিমন্ত্রিত, অনাহূত, অতিথি, পাচক পাচিকা ও দাসদাসী এবং গৃহস্থ ব্যক্তিবর্গও অবশেষে জীবন ও সঙ্গিনীর ভোজন বেলা তিন ঘটিকার মধ্যেই শেষ হইয়া গেল। এইবৃহৎ ব্যাপার এত অল্প সময়ে ও অনায়াসে সুসম্পন্ন হইল যে, ইহাতে কাহারও কোন বিষয়ে কোনরূপ কষ্ট বোধ হইল না।

পাকস্পর্শ শেষ হইলে পর জীবন ও সঙ্গিনী সেই মহাপুরুষাদিষ্ট নিয়মানুসারে নিরন্তর রাধাকৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিতে করিতে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। সঙ্গিনীর কার্য্যদক্ষতাগুণে সংসারেও দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। যথা সময়ে জীবন, সঙ্গিনী হইতে চারিটি পুত্র লাভ করিলেন। এবং ক্রমানুসারে উহাদের নাম রাখিলেন পথ্যস্বরূপ, সত্বস্বরূপ, নিত্যস্বরূপ ও সত্যস্বরূপ। জীবন সঙ্গিনীর সাহায্যে পিতৃ এবং শ্বশুর কুলের সম্পত্তির যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিতে লাগিলেন। জীবনের পুত্রচতুষ্টয় বিদ্যালাভ করিতে করিতে সর্ব্বগুণে গুণান্বিত হইয়া সকলের প্রীতিভাজন হওত যখন যৌবনে পদার্পণ করিলেন, তখন জীবনের পিতা নিজ নিবাসের সন্নিহিত গোবিন্দপুর নিবাসী বিশ্বরূপ নামক জনৈক ধর্ম্মনিষ্ঠ, সুব্রাহ্মণের রুচী, কমলা, আনন্দদায়িনী ও বিজ্ঞানদায়িনী নাম্নী অতি সুশীলা ও রূপবতী কন্যা চতুষ্টয়ের সহিত ক্রমানুসারে এককালে উহাদের শুভ পরিণয় কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াদিলেন। কিছু কাল পরে জীবন ও সঙ্গিনীর পিতা মাতা সংসার বিষয় সম্পত্তির ভার

জীবন সঙ্গিনীর উপর ন্যস্ত করিয়া শ্রীবৃন্দাবন ধামে যাত্রা করেন এবং জীবনের অবশিষ্ট কাল তথায় যাপন করিয়া অন্তে ঐ বৃন্দাবনধামেই দেহ রক্ষা করেন। উহাদের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য ও শ্রাদ্ধাদি বহুব্যয়ে সমাধা করিয়া জীবন ও সঙ্গিনী যার পর নাই যশস্বি হইয়াছিলেন। ক্রমে জীবন ও সঙ্গিনী বৃদ্ধদশারসহিত সংসারে অনাসক্তি ও মাহাত্মার উপদেশের ফল ফলিবার সময় আগত প্রায় হইলে উহারা পুত্র চতুষ্টয়ের প্রতি উভয় সম্পত্তির ও সংসারের ভার অর্পণ করিয়া বহুবিত্ত ও শুভাশীষ প্রদান পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত সিংহাসন আরোহণে সেই পূর্ব্ব-কথিত অদৃশ্য আশ্রমে গমন করেন এবং তথায় গুরুপাদপদ্ম দর্শন ও যোগচর্য্যায় মননিবেশ পূর্ব্বক প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে কিছু কাল যাপন করত যোগবলে সঙ্গিনী জীবনে এবং জীবন পরমাত্মাতে বিলীন হয়েন।

ভাবার্থ।

জীবন আত্মা; সঙ্গিনী বুদ্ধি। বুদ্ধিকে কুলগুরু ও পুরোহিতের সাহায্যে পরধর্ম্মে লিপ্ত হইতে না দিয়া স্বধর্ম্মাবলম্বনী করত আত্মার সহিত সম্মিলিত করিতে পারিলেই কুলের মঙ্গল ও পুরের হিত হইয়া থাকে এবং ঐ পবিত্র সম্মিলনে যে সমস্ত প্রজার সৃষ্টি হয়, তাহারাও ধর্ম্মের নিদান, কুলের গৌরব ও বংশের কেতু স্বরূপ হইয়া থাকেন। আত্মা বুদ্ধানুসন্ধানী ও বুদ্ধি আত্মানুসন্ধায়িনী অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা হইলে চুম্বকের লৌহাকর্ষিণী শক্তির ন্যায় উহাদের আকর্ষণী শক্তিতে গুরু ও পুরোহিত আকৃষ্ট হইয়া স্বতই আসিয়া উপস্থিত হন ও সেবক সেবিকার ঐহিক ও পারত্রিক উভয় বিধ মঙ্গলেই বিধান করিয়া থাকেন। গুরুবল অপেক্ষা সেবক সেবিকার আর অন্য কোন বলই নাই। গুরু সহায় থাকিলে অসাধ্য সাধন হয়। আপদ বিপদ, বাধা বিঘ্নাদি দূরে পলায়ন করে। অতএব জীবনের সহিত জীবন পরায়ণা সঙ্গিনীর সম্মিলনের ন্যায় আত্মার সহিত আত্ম পরায়ণা বুদ্ধির সম্মিলন করাই হইল মানব জীবনের সার্থকতা। অন্যথা আত্মার অধঃপতন * হেতু এই সুদুর্লভ মানব জীবন বিফল

---

* আত্মা স্থান ভ্রষ্ট হইয়া অধোদেশে আসিয়া মন উপাধি ধারণ করে। সেই উপাধি ধারণ করার পর চঞ্চল হইয়া কণ্ঠের নীচে রজোগুণে আসিয়া পড়ে। সেই অবস্থায় কামনার উৎপত্তি। তাই শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন যে, "পাপ করিতে ইচ্ছা না থাকিলেও পুরুষ যাহা কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়া যেন বল পূর্ব্বক নিযুক্ত হইয়াই পাপ করে তাহা

হইয়া যায়। বস্তু লাভ করিয়াও বঞ্চিত হইতে হয়। কেবল ব্যবহারের গুণে ও দোষে ঐ বস্তুই (আত্মাই) আত্মার বন্ধু ও শত্রু হইয়া থাকে। অতএব আত্মাকে ঊর্দ্ধে রক্ষা করিয়া নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির সাহায্যে মনকে নিশ্চল করতঃ আত্মজ্ঞান লাভ করাই মানব জীবনের একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু আত্মভাবাপন্না বুদ্ধিকে পর ধর্ম্মাবলম্বিনী হইতে না দিয়া স্বধর্ম্মাবলম্বিনী করিবার প্রণালী সৎ গুরুর আনুকূল্য ও উপদেশ ভিন্ন শিক্ষা করিবার যে উপায়ান্তর নাই ইহা স্থির নিশ্চয়।

শ্রীভূপতিচরণ বসু।

(পুরস্কার প্রবন্ধ)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বস্ত্রহরণ ও রাস এই দুইটী লীলার পরস্পর সামঞ্জস্য রাখিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনার জন্য ভক্তি ভণ্ডার হইতে একটী পুরস্কার দেওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে। বলা বাহুল্য শ্রীমদ্ভাগবতের মতকেই মুখ্য ধরিয়া লইয়া কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার করিয়া প্রবন্ধ লিখিতে হইবে। ভক্তির আকারে ছাপিলে যাহাতে ১৬ পৃষ্ঠার বেশী না হয়, লেখকের সে বিষয়েও বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। আগামী ১লা চৈত্র ১৩২৮ বঙ্গাব্দের মধ্যে প্রবন্ধ আমাদের হস্তগত হওয়া চাই। "ভক্তি"-কার্যালয়ে ডাক-টিকিট সহ পত্র লিখিয়া বিশেষ বিবরণ অবগত হউন।

রজোগুণ জাত দুষ্পূরণীয় ও অত্যুগ্র কাম এবং উহা কোনরূপে প্রতিহত হইলে উহা হইতে ক্রোধ উৎপন্ন হয়। মোক্ষ মার্গে ইহাকে বৈরী জানিও। গীতা। ৩য় অধ্যায়। ৩৭ শ্লোকের ব্যাখ্যা। শ্রীগীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ৪৩ সংখ্যক শ্লোক অবলম্বনে এই আখ্যায়িকা রচিত হইল।

ভক্তি

(২০শ বর্ষ ৭ম সংখ্যা ফাল্গুন মাস ১৩২৮ সাল)

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥"

শ্রীগৌরাঙ্গ-জন্ম

(প্রাচীন)

ভুবন মনোচোরা গোকুল পতিগোরা-
চাঁদের জনম কি শুভক্ষণে।
দেখিয়া পুত্রমুখ শচীর যত সুখ
তাহা কি কহিবারে পারে আনে॥
নদীয়া পুরনারী আইসে সারি-সারি
লইয়া থাবিভরি দ্রব্য বস্তু।
সুসজ্জে সুরপ্রিয়া মানুষে মিশাইয়া
বালকে নিরখিয়া থির নহু॥
শ্রীসীতাদেবী আসি সূতিকাগৃহে পশি
দেখিয়া শিশু উলসিত হিয়া।
মালিনী আদি সঙ্গে ভাসায়ে নানা রঙ্গে
করয় কত না মঙ্গল ক্রিয়া॥
গোয়ালিনী বা কত গোয়ালা শত শত
লইয়া দধি আসে চারু সাজে।

সবে বিহ্বল-চিত্তে [illegible] পূর্ব্ব-স্বভাবেতে
ছড়ায় দধি আঙ্গিনার মাঝে ॥
রচিয়া করতালি হাসিয়া নাচে ভালি
তা'দেখি দেবে গোপবেশ ধরি।
নাচয়ে আঙ্গিনাতে কেবা না নাচে তাতে
সঘনে জয় জয় ধ্বনি করি ॥
বাজয়ে বাদ্য হেন কৌতুক নাহি যেন
মিশ্রালয়ে সে নন্দালয়ের রীতি।
নরহরি কি কব প্রভু জন্মোৎসব
উৎসাহে কারুকিছু নাহি স্মৃতি ॥

তরজার ব্যাখ্যার প্রতিবাদ

বর্ত্তমান ২০শ বর্ষের ১ম সংখ্যা ভাদ্রমাসের ভক্তিতে প্রভুর অপ্রকট প্রবন্ধের মধ্যে ১৮ পৃষ্ঠায় "বাউলকে কহিও লোকে হইল বাউল" ইত্যাদি পয়ারের অর্থ যাহা বাহির হইয়াছিল ভক্তিপত্রিকার ২৩৬৯ নং গ্রাহক তাহার একটি প্রতিবাদ পাঠাইয়াছেন, আমরা পা'ঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে প্রতিবাদটী ছাপিয়া দিলাম। এসম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য পরে প্রকাশ করিব। বর্ত্তমানে যদি কেহ এই দুই ব্যাখ্যা ছাড়া অন্যরকমের কিছু ব্যাখ্যা লিখিয়া পাঠান আমরা বারান্তরে ইহা ভক্তিপত্রে ছাপিতে ইচ্ছুক আছি। ভাদ্র মাসের ভক্তিতে প্রকাশ হইয়াছিল—

"প্রভুকে কহিও আমার কোটী নমস্কার
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার
বাউলকে কহিও—লোকে হইল বাউল
বাউলকে কহিও—হাটে না বিকায় চাউল
বাউলকে কহিও—কাজে নাহিক আউল
বাউলকে কহিও—ইহা কহিয়াছে বাউল"

"এই তরজার অর্থ এই যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু একজন বাউল (ফকির) মহাজন, আর অদ্বৈত তাঁহারই অধীন আর একজন বাউল। এই শেষোক্ত মহাজন তাঁহাকে ভবের হাটে জীবগণের নিমিত্ত কৃষ্ণভক্তিরূপ চাউল বিক্রয় (বিতরণ) করিবার জন্য আকর্ষণ করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। এখন দেশের সে দুর্দ্দিন ঘুচিয়াছে। ভক্তিশূন্য সংসার ভক্তিতে পূর্ণ হইয়াছে। জীবগণ আকণ্ঠ ভক্তিসুধা পান করিয়া ধন্য হইয়াছে। তাহাদের প্রাণ পবিত্র ও স্বর্গীয় আলোকে আলোকিত হইয়াছে। আর ত চাউল বিক্রয় অর্থাৎ প্রেম প্রচারের আবশ্যক নাই।

শ্রীঅদ্বৈত, প্রভুকে বলিতেছেন হাটে বিক্রয় করিবার জন্য যে চাউল আনা হইয়াছিল, লোকে তাহা লইয়া আউল হইয়াছে—অর্থাৎ তাহাদের অভাব পূর্ণ হইয়াছে সুতরাং আপনার কার্য্য শেষ হইয়াছে।"

ভক্তি-গর্ব্বে উক্ত তরজার উক্তরূপ অর্থ সংন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু হাটে বিক্রয় করিবার জন্য যে চাউল আনা হইয়াছিল, লোকে তাহা পাইয়া আওয়াল হইয়াছে, তরজায় তরজাকার এমন কথা ত বলিতেছেন না—তরজাকার স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছেন "লোকে বাউল হইল, হাটে চাউল বিকায় না— আউলে কায নাই।" কোন বৃদ্ধ মহাজন এই তরজার যে ব্যাখ্যা করেন তাহা নিম্নে দেওয়া হইল—

"শ্রীমন্মহাপ্রভু যে ভক্তি প্রবাহ ছুটাইবার জন্য প্রয়াস করিতেছেন, লোকে তাহা না বুঝিয়া বাউল হইল, মহাপ্রভুর মতের বিকৃত অর্থ পোষণ করিয়া লোকে বাউল হইল—এখানে বাউল শব্দের অর্থ—পাগল, লোকের মস্তিষ্ক বিকৃত হইল।

হাটে চাউল বিকায় না। ইহার অর্থ এই যে—মহাপ্রভুর নির্দ্দিষ্ট ভক্তি প্রবাহে লোকে ডুবিতে পারিল না—মহাপ্রভুর মত কার্য্যকরী হইল না এমতাবস্থায় কাজে নাইক আউল—আর বেশী গোলমালে প্রয়োজন নাই।

মহাপ্রভুর মত সাধারণ লোকে বুঝিল না, তাহারা প্রভুর মতের বিকৃত অর্থ গ্রহণ করিয়া কদাচার গ্রহণ করিতে থাকিল।

মহাপ্রভুর পারিষদগণই মহাপ্রভুর মতের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করিতে পারিয়া ভক্তি প্রবাহে ডুবিয়াছিলেন।

আচার্য্য প্রত্যক্ষ করিলেন যে মহাপ্রভুর মতের বিকৃত অর্থ গ্রহণ করিয়া নানাসম্প্রদায় উৎপত্তি হইল—এই সকল সম্প্রদায় সংকীর্ত্তনে যোগ দিলেও

কামিনী কাঞ্চনের মোহ পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। কামিনী কাঞ্চনের মোহ ত্যাগ করাই মহাপ্রভুর মতের সর্ব্ব প্রধান বিশিষ্টতা—ইহাতে সন্দেহ নাই—এই পবিত্র বিশিষ্টতা যখন সম্প্রদায়গণ কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়া বৈষ্টব বৈষ্টবী নেড়া নেড়ী প্রভৃতি নানাকলুষে পূর্ণ হইতে লাগিল, তখন আচার্য্য মহা আক্ষেপের আবেগে প্রভু-সন্নিকটে উক্ত তরজা জ্ঞাপন করেন।

উক্ত তরজা মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করিলে উহাতে সফলতার উৎসাহ দেখা যাইবে না—তৎ পরিবর্ত্তে অসাফল্যের আক্ষেপ বিশিষ্ট ভাবেই অনুভূত হইবে।"

ভক্তিতে যে ব্যাখ্যা পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল এটী তাহারই প্রতিবাদ। তবে লেখক লিখিয়াছেন যে ইহার ভিতরে কোনরূপ তর্ক নাই তিনি যেরূপ শুনিয়াছেন তাহাই লিখিয়াছেন। আমরাও এবিষয় সাধারণের মতামত জানিতে ইচ্ছাকরি।

সম্পাদক

কারাগার

দণ্ডবিধান দ্বারা অপরাধী ব্যক্তির অপরাধ মোচন ও স্বভাব পরিবর্ত্তন করিবার অভিপ্রায়ে বিশ্বস্রষ্টা ভগবান এই সংসাররূপ কারাগার সৃষ্টি-করিয়াছেন। সুখ ও দুঃখরূপ দণ্ড এই কারাগারে ভোগ করিতে হয়। সুখ ও দুঃখরূপ দণ্ড ভোগ করিতে আসিয়া, সুখে মজিয়া ও দুঃখে অভিভূত হইয়া সংসার কারাগারের সৃষ্টিকর্ত্তা বা দণ্ডপাণি ভগবানকে বিস্মৃত হওয়া এবং স্বভাব পরিবর্ত্তনের জন্য যত্নবান না হওয়া কদাচই আমাদিগের কর্ত্তব্য নহে। কারাগারের সুখ দুঃখকে সমান জ্ঞান করিয়া এবং কারাগারের মালিক দণ্ডপাণি ভগবানে লক্ষ্য ও ভয় রাখিয়া সংসারের কার্য্য সুসম্পন্ন করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। কেবল সুখ দুঃখের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দণ্ডপাণি ভগবানকে বিস্মৃত হওয়া কখনই উচিত নহে।

সুখও ভোগের জিনিস, দুঃখও ভোগের জিনিস, আর সংসার ঐ সুখ ও দুঃখ ভোগের স্থান। সুখ ও দুঃখ ভোগের স্থান বলিয়া এই সংসারের

আর একটি নাম কারাগার। মোহ এই কারাগারের শৃঙ্খল বা বেড়ী। এই বেড়ীতে আবদ্ধ হইয়া সুখীকে সুখ ভোগ এবং দুঃখীকে দুঃখ ভোগ করিতে হয়। সুতরাং ভোগার্থ সুখ ও দুঃখ মোহশৃঙ্খলাবদ্ধ জীবের পক্ষে একই পদার্থ। সুখভোগী সুখেও তৃপ্তি লাভ করিয়া সুখী হইতে পারে না। আর দুঃখভোগী দুঃখেও সুখী হইতে পারে না। অতএব সুখদুঃখ উভয়েতেই যখন সুখী হইতে পারে না, তখন তারতম্যবিহীন জাগতিক এই সুখদুঃখ যে একই পদার্থ, তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। মোহ-শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবের মোচনই সুখ, তদ্ব্যতীত সকলই দুঃখ। উদাহরণ যথা—কোন একটী পক্ষীকে পিঞ্জর বা শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া, তাহার ভোজন ও পানার্থ যদি উপাদেয় দ্রব্যাদি প্রদান করা যায়, তাহা হইলে সে কি মনের সুখে ভোজন পানাদি করিয়া সুখ স্বচ্ছন্দে সেই আবদ্ধ অবস্থায় কাল যাপন করে? না, তা কখনই করে না। অপরিহার্য্য ক্ষুৎপিপাসা নিবারণার্থ ভোজন ও পান করে বটে, কিন্তু মুক্তিলাভের নিমিত্ত সর্ব্বদাই মনের অসুখে থাকে এবং শৃঙ্খল বা পিঞ্জর সুবর্ণ নির্ম্মিত হইলেও, কাটিয়া মুক্ত হইবার জন্য সততই চেষ্টা করিতে থাকে। সুস্বাদু ভক্ষ্য ভোজ্য ও সুনির্ম্মল পানীয় তখন তাহার ভাল লাগে না। অতএব সুখ দুঃখকে হেয় জ্ঞানে মোহ শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থা হইতে মুক্তিলাভের নিমিত্ত সতত যত্নবান হওয়াই সকলের বিশেষতঃ মানব আধ্যাধারী জীবের নিতান্ত আবশ্যক ও অতীব কর্ত্তব্য। সুখ দুঃখ মনের ধর্ম্ম; আত্মার নহে। মন বা ইতরেতর ইন্দ্রিয়াদির ধর্ম্মাবলম্বনে জীবন যাপন করাই অজ্ঞানের কার্য্য। আর আত্ম ধর্ম্মাবলম্বনে অবস্থান করাই জ্ঞানের কার্য্য। "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ" ॥ গীতা ৩,৩৫।

এই সংসার কারাগারে যাতায়াতের পথ বন্ধ করিবার চেষ্টা করাই মানব জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম। পথ বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতে হইলে এই সংসারে এমন ভাবে থাকিতে হয় যে, সংসারের ভাব যেন হৃদয়ে না লাগে বা প্রবেশ না করে। অর্থাৎ নির্লিপ্ত ভাবে থাকিতে পারিলেই যাতায়াতের পথ বন্ধ হইয়া যায়; আর সংসারে লিপ্ত বা আসক্ত হইলেই যাতায়াত বৃদ্ধি হইয়া থাকে। তাই মহাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব জীবের দুঃখ অর্থাৎ যাতায়াত ক্লেশ দূর করিবার জন্য উপদেশচ্ছলে বলিয়াগিয়াছেন যে, "সংসারে থাকিতে হয় পাঁকাল মাছ বা নৌকার মত।" পাঁকাল মাছ পাঁকে থাকে, কিন্তু গায়ে পাঁক লাগে না। নৌকা জলে থাকে, কিন্তু নৌকায় জল প্রবেশ

করিলেই নৌকা ডুবিয়া যায়। নৌকার জল যেমন মাঝে মাঝে সেচন করিয়া ফেলিয়া দিতে হয়; এই সংসারের ভাব হৃদয়ে প্রবেশ করিলেও সেই রূপ মাঝে মাঝে ধর্ম্মালোচনারূপ সেচনী দ্বারা সেচন করিয়া ফেলিয়াদিতে হয়। সকলই সত্য, কিন্তু সংসার মোহের এমনই মোহিনী শক্তি যে, জীব কিছুতেই এই কারাগারের মায়া ভুলিতে পারে না। চলিয়া যায়, তবুও এই কারাগারে প্রতি-কৃতি রাখিয়া যায়। কারাগার-ক্লেশ ভোগ করিতে আসিয়া কারাগারে প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন পূর্ব্বক চলিয়া যাইতে কখনও কি কাহারও ইচ্ছা হয়? না, তা বোধহয় কাহারও হয় না। বরং কেহ যেন টের না পায়, তজ্জন্য কারাবাস ক্লেশের দাগ ও সেরেস্তা পত্র পর্য্যন্ত যাহাতে অদৃশ্য হয়, অনেকে তাহাই প্রার্থনীয় বলিয়া জ্ঞান করেন। অতএব এই সুখ দুঃখ ভোগের স্থান সংসার কারাগারে কোনরূপ স্মৃতি চিহ্ন না রাখিয়া এমন কি সংসারের ভাব পর্য্যন্ত হৃদয় হইতে অপসারিত করিয়া যাইতে পারিলেই প্রকৃত মানবের কার্য্য করা হয়। আর তাহা হইলেই পথ বন্ধ হইয়া যায়, আর আসিতে হয় না। অন্যথা মায়ামোহিত চিত্তে দিবা রজনী কেবল অহন্তা মমতারূপ মিথ্যাভিনিবেশের বশবর্ত্তী হইয়া এই অস্থায়ি কারাগারের (যাহা অস্থায়ী কারাগার অপেক্ষাও অত্যল্পকাল অস্থায়ী) পাকা বন্দোবস্ত এবং সতত সম্মুখে বর্ত্তমান কাল বা মৃত্যুর দিকে লক্ষ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিরদিনই জীবিত থাকিব ভাবিয়া, যে সমস্ত বিষয়ে আমার কোন অধিকার বা সত্ব নাই, সেই সমস্ত বিষয়কে আমার করিয়া লইবার জন্য বিবিধ প্রকারের কায়দায় লিখন পঠন এবং স্বাক্ষর ও সাক্ষ্যাদি সংস্থাপন দ্বারা আমার বলিয়া পরিচয় দেওয়াই হইল অপরাধ। কারণ যাহা আমার নয়, তাহাকে নানাবিধ উপায়ে আমার বলিয়া পরিচয় দেওয়াই হইল সত্যচ্যুতি বা মিথ্যা। এই মিথ্যাই হইল প্রত্যবায়, পাপ বা দোষ, আর এই পাপ বা অপরাধের দণ্ড ভোগ করিবার জন্যই হইল এই সংসাররূপ কারাগার। অতএব আমরা যতই আমার আমার বলিয়া অসদ্‌গ্রহে অভিভূত হইব, ততই এই সংসাররূপ কারাগারের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইবে। ঘনিষ্ঠতা নিবন্ধন হইবে আসক্তি। আসক্তি হইলেই হইবে যাতায়াত বৃদ্ধি। সুতরাং কোন কিছুকেই আমার বলিতে নাই। যেহেতু আমার সঙ্গে কোন কিছুরই কোন সম্বন্ধ নাই। অধিক কি বলিব পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, প্রাণের আধার এই দেহ, সেই প্রাণের সহিতই এই দেহের কোন সম্বন্ধ নাই। যথা :—

"কস্য মাতা কস্য পিতা কস্য ভ্রাতা সহোদরাঃ।
কায়ে প্রাণে ন সম্বন্ধঃ কা কস্য পরিবেদনা ॥"

"কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি" এই ঋষিবাক্য মিথ্যা নহে। ইহার ভাব স্বতন্ত্র। বোধহয় কেবল নাম কিনিবার নিমিত্ত কীর্ত্তি রক্ষা করা এরূপ ভাব নহে। যিশুখৃষ্ট বলিয়া গিয়াছেন—"সৎকার্য্য এমন ভাবে করিবে যে দক্ষিণ হস্তে করিলে যেন বাম হস্তে টের না পায়।" আমাদের হিন্দুশাস্ত্র সমূহও ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ দিয়া থাকেন যে "পুণ্যকার্য্য প্রকাশ হইলেই নষ্ট হইয়া যায়।" অতএব কীর্ত্তির সঙ্গে নামের সংস্রব থাকিলেই, অর্থাৎ আমার কীর্ত্তি সংবাদপত্রে ঘোষিত হউক বা কীর্ত্তিস্তম্ভে স্বর্ণাক্ষরে আমার নামধামাদি খোদিত হউক, ইত্যাদি ভাব থাকিলেই, সে কীর্ত্তি অকীর্ত্তিতে পরিণত হয়, সাধু সম্মত কীর্ত্তি তাহাকেই বলা যায়, যাহাতে জীবের সংসার মোচন হয় অর্থাৎ কারাবাস দুঃখ দূর হয়। কারাবাস-দুঃখ ভোগ করিয়া যাঁহার অন্তরে সেই দুঃখের উদয় হয় ও দুঃখে দুঃখিত হইয়া নিজ জীবনকে উৎসর্গ করিয়া সাধারণের সেই দুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত যিনি বদ্ধ পরিকর হন ও উদ্ধারের প্রকৃত উপায় উদ্ভাবন করিয়া দেন, তিনিই প্রকৃত সাধু এবং তাঁহার কীর্ত্তিই সৎকীর্ত্তি বলিয়া পরিগণিত হয়। সাধুর চক্ষে সুখী দুঃখী সমান। সুখীও ভোগী, দুঃখীও ভোগী, আর কারাবাসযন্ত্রণা উভয়েরই সমান; সাধু এইরূপ বিচারকরিয়া অতি গোপন ভাবে দর্শন দিয়া, সময়ানুসারে সুখী ও দুঃখী উভয়েই ভোগ মোচন করিয়া দেন। সাধু প্রতিষ্ঠাকে শূকরীবিষ্ঠা এবং গৌরবকে রৌরব জ্ঞান করিয়া থাকেন।

আর এক কথা—এই কারাগারে আসিয়া, যে বিষয়ে আসক্ত হওয়া যায়, সে বিষয় আমার কি আর কাহারও তাহা এই কারাগারে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে, অবস্থান কালে বা ত্যাগ করিবার সময়, যখনই হউক একবার একটু মনোনিবেশ পূর্ব্বক ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, এই কারাগারের বিষয়ে আমার কোনই স্বত্ব বা অধিকার নাই। কেবল একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য কারাগারে খাটিতে আসা মাত্র। নির্দ্দিষ্ট সময় পূর্ণ হইলে যখন কারাগার পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হয়, তখন আমার বলিয়া কারাগার হইতে একটি অতিক্ষুদ্র জিনিষ পর্য্যন্ত আনিতে পারাযায় না। যাই একাকী আসিও একাকী। কারাগার যাহার—কারাগারের দ্রব্যাদি যাহার, তাহারই থাকে। অতএব এই সংসার-কারাগারে আসিবার জন্য

জননী জঠরে জীব যখন প্রবেশ করে, তখনকার ভাব আবার নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তে দেহ ত্যাগ করিয়া জীব যখন চলিয়া যায়, তখনকার ভাব ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারাযায় যে, জীব এ কারাগারের জন্য কিছুই লইয়া আসিতে পারে না। সংসারের যাহা কিছু সকলই পড়িয়া থাকে। সংসারে অবস্থিতি কালে মধ্য হইতে কেবল মায়া কল্পিত কতকগুলি ব্যক্তি ও বস্তুর সংমিলনে অত্যাশক্তি বশতঃ কর্ত্তব্য কার্য্যের স্মৃতি লোপ হয় এবং প্রবৃত্তির নিবৃত্তি না হইয়া বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অর্থাৎ স্বভাবটা সংসারের ভাবে ভাবিত ও সংস্কারিত হইয়া যায় আর ঐ সংস্কার বশতঃই মৃত্যুকালে পুনরায় সংসারের ভাবই জীবকে প্রাপ্ত হইতে হয়।

এখন বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, প্রবৃত্তি, সংস্কার বা কর্ম্মই কেবল জীবের সঙ্গে যাতায়াত করে; আর কিছুই সঙ্গে যাইতে বা আসিতে পারে না। চেষ্টা বা পুরুষকার (ভগবৎ কৃপা) দ্বারা প্রবৃত্তির নিবৃত্তি, সংস্কারের লোপ বা কর্ম্ম-বীজের অঙ্কুরোদ্ভব শক্তির নাশ হইলেই জীবের মুক্তি হইয়া থাকে। মুক্তি হইলে যাতায়াত ও কারাবাস-ক্লেশ আর ভোগ করিতে হয় না।

মধ্যস্থলে মায়াকল্পিত ব্যক্তি ও বস্তুর সংসর্গ দোষে জীবের মিথ্যাভিনিবেশ অর্থাৎ অহন্তা মমতা আসিয়া উপস্থিত হয়। ঐ অসৎগ্রহ হইতেই জীবের আত্মঘাত বা কন্মভোগ ঘটিয়া থাকে। সুতরাং জন্ম কর্ম্মাদি সকলই ব্যর্থ হইয়া যায়। বহুকষ্ট-লব্ধ অপবর্গ সাধক মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়াও জীব মোক্ষের নিমিত্ত যত্ন না করিয়া কাঞ্চনের (অমূল্যনিধি ধর্ম্মের) বিনিময়ে কাঁচ লাভ করিয়া বঞ্চিত হইয়া থাকে।

"লব্ধা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে,
মানুষ্যমর্থদমনিত্য মপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত নপতেদনু মৃত্যু যাবন্,
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥"

ভাঃ ১১।৯ ২৯

ধীর ব্যক্তি বহুজন্মের পর সুদুর্লভ অনিত্য হইয়াও অর্থদ (পরমার্থ দর্শন-ক্ষম) মনুষ্য এই জন্ম লাভ করিয়া এই জন্মেই যাবৎ রোগ শোকাদি দ্বারা পতন না হয় তাবৎ শীঘ্র মোক্ষের নিমিত্ত যত্ন করিবে। আহারাদি

বিষয় ভোগ সকল জন্মেই আছে—কেবল উহার জন্যই মানব জন্ম হয় নাই, ইহা স্থির।

"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং,
প্লবংসুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।"
"ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং,
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥"

ভাঃ ১১। ২০ ১৭

অনুকূল বায়ুদ্বারা চালিত, গুরু কর্ণধার সমন্বিত সংসার উত্তরণের নৌকা স্বরূপ এই সুলভ, সুদুর্ল্লভ ও সমস্ত বাঞ্ছিত ফলের মূল মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইয়া, যে পুরুষ ভব সমুদ্র পার অর্থাৎ মুক্ত হইতে চেষ্টা করে না, সে আপনাকে আপনিই দুঃখ সাগরে নিমজ্জিত করে। অতএব তাহাকে আত্মঘাতী বলিয়া জানিবে।

"স বঞ্চিতোবতাত্মধ্রুক্ কৃচ্ছ্রেণ মহতা ভুবি।'
"লব্ধাপবর্গ্যং মানুষ্যং বিষয়েষু বিষজ্জতে॥" ভাঃ ৪।২৩।২৮

অর্থাৎ অতি কষ্টে বহু তপস্যার বলে পৃথিবীতে মোক্ষসাধক মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াও যে ব্যক্তি বিষয়েতে আসক্ত থাকে, হায়! সেই ব্যক্তি আপনার অনিষ্ট আপনিই করে এবং তাহার জন্মলাভ নিরর্থক।

অতএব ভবে আসিয়া ভবের ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভবনাথের ভাবে ভাবিত হইয়া যাইতে পারিলেই, ভবসাগর পার হইতে পারা যায় আর ভবনাথের ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভবের ভাবে আসক্ত হইলেই ভব পারাবার অপার হইয়া উঠে। সুতরাং পার হইতে না পারিয়া আবার সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া ভগবানের হইয়া যাইতে পারিলে, আবার এই সংসারই পরমানন্দের স্থান হইয়া উঠে, কাম ক্রোধাদি রিপুগণ বশীভূত হইয়া অনুকূল কার্য্য করিতে থাকে, গৃহ আর কারাগার থাকে না। মায়াবেড়ী আপনা আপনিই খুলিয়া যায় ও অহন্তা মমতা দূর হয়। তখন সকলই ভগবানের, আমিও ভগবানের, এই পূর্ণজ্ঞানে চতুর্দ্দিকে ভগবানের সত্তা অনুভব করিতে করিতে মন প্রাণ ভগবানের ভাবে মাতিয়া উঠে, বিষয়-ভোগ-লালসা একেবারেই নিবৃত্তি পায় ও সংসার মোচন হইয়া যায়।

"তাবদ্রাগাদয়ঃ স্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহম্।
তাবন্মোহোহঙ্‌ঘ্রি নিগড়ো যাবৎ কৃষ্ণ ন তে জনা॥" ভাঃ১০।১৪ ৩৬

শ্রীভূপতিভূষণ রায়।

শ্রীল নরোত্তম দাস

(১)

যশোহর জেলার তালখড়ি জাগলি গ্রামে কুলীনব্রাহ্মণ পদ্মনাভ চক্রবর্তীর ঔরসে, সীতাদেবীর গর্ভে ক্ষণজন্মা লোকনাথ গোস্বামী জন্মগ্রহণ করেন। পদ্মনাভ চক্রবর্তী অদ্বৈত প্রভুর শিষ্য ছিলেন। লোকনাথের হৃদয়ে শিশুকাল হইতেই ভক্তিরস উদিত হইয়াছিল এবং অল্প বয়সেই তিনি পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি একদিন কাহারও সহিত কথা প্রসঙ্গে শুনিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ নবদ্বীপে শচীর গর্ভে গৌর-রূপে অবতীর্ণ হইয়া সর্ব্ব-নয়ন-গোচর হইয়াছেন। এই নবদ্বীপ তাঁহার বাড়ী হইতে মাত্র দুই দিনের পথ ব্যবধান। তিনি ভাবিলেন সেই অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি শ্রীকৃষ্ণ—যাঁহাকে যোগিগণ শত শত বৎসর তপস্যা করিয়াও প্রাপ্ত হন না; সেই অমূল্যধন চিন্তামণি আমার বসতি স্থান হইতে এত নিকটে সর্ব্ব-নয়ন-গোচর হইয়াছেন, ইহা আমার ভাগ্যের কথা। ইহা ভাবিয়া তিনি প্রভুদর্শনের জন্য অস্থির হইয়া পড়িলেন, তাঁহার সংসারে ঔদাস্য জন্মিল।

যাঁহার মনভৃঙ্গ শ্রীগৌরাঙ্গের চরণারবৃন্দের মধুপানে লোলুপ, তিনি সংসারের অসার বিষয় সম্পদাদির সুখ ভোগের জন্য লালায়িত হন না। তিনি ভাবিলেন সংসারে থাকিয়া মোহের দাস হওয়া অপেক্ষা সংসার বন্ধন ছিন্ন করিয়া শ্রীভগবানের চরণ সেবা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। ইহা ভাবিয়া ভাবিয়া তিনি অগ্রহায়ণ মাসের রাত্রশেষে গোপনে শ্রীধাম নবদ্বীপে গমন পূর্ব্বক শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন।

প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ বড়ই স্নেহে তাঁহার এই তরুণ ভক্তটীকে আলিঙ্গন করিলেন। তাহার পর কিছুদিন তাঁহাকে নিকটে রাখিয়া শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন। গমনকালে বলিলেন,—"পশ্চিম দেশে ভক্তিধর্ম্ম প্রচার ও শ্রীকৃষ্ণলীলাস্থান বৃন্দাবনের লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার কর।" আর বলিলেন, "বৃন্দাবনে যাইয়া চীরঘাটে বাস করিও। তথায় তমাল, কদম্ব ইত্যাদি শোভিত যে কুঞ্জ তাহা তোমার।"

লোকনাথ গোস্বামীর বৃন্দাবন গমন কালে গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য ভূগর্ভও তাহার অনুগামী হইলেন। তাঁহারা বৃন্দাবনে প্রবিষ্ট হইয়া প্রভু

দত্ত স্থান অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কারণ বৃন্দাবন জঙ্গল ময়; মুসলমানদের অত্যাচারে ছারে খারে গিয়াছে। তাঁহাদের আহারের বা দেহ রক্ষায় চেষ্টা মাত্র নাই বৃক্ষতলে বাস করিয়া থাকেন। যথা—

"ব্রজবাসী বিপ্র অনুরোধে যথাকালে।
ফলাদি ভক্ষণ করি রহে বৃক্ষতলে॥
একস্থানে স্থির হৈয়া কভু নাহি রয়।
বৃন্দাবন প্রদেশেতে ভ্রমণ করয়॥　(নরোত্তমবিলাস)

ক্রমশঃ তাঁহারা স্থির হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ-বিরহে অতিকষ্টে বাস করিতে লাগিলেন। যথা প্রেমবিলাসে—

"আর না দেখিব গোরা তোমার চরণ।
রহিলাম আজ্ঞামাত্র করিয়া ধারণ॥
ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু যে করিলা লীলা।
বঞ্চিত করিয়া মোদের এথা পাঠাইলা॥"

প্রভু লোকনাথ অতি কঠোর ভাবে সাধন ভজনে মনোনিবেশ করিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন এজীবনে কাহাকেও শিষ্য করিবেন না। এই প্রতিজ্ঞা কিন্তু শেষে তাঁহাকে ভঙ্গ করিতে হইয়াছিল।

(২)

শ্রীভগবান বার বার বলিয়াছেন—"মদ্ভক্তঃ পূজ্যাত্ভ্যাধিকঃ" অর্থাৎ "আমার ভক্তই আমাপেক্ষা অধিক পূজনীয়।" একথা আমার জীবনে একবার বুঝিবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। আমি তখন শ্রীল শিশির বাবুর অমিয় নিমাই চরিত একে একে ছয় খণ্ডই শেষ করিয়াছি। অনন্ত মাধুর্য্য পূর্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ-কথা সম্পূর্ণ পাঠ করিয়াও যেন আমার আশা মিটিল না। শ্রীগৌরাঙ্গের সেই নিদারুণ তিরোভাব আমার বক্ষে শেল সম বিঁধিয়া গেল। ইহার কিছুদিন পরে আমি আর একখানি গ্রন্থ পড়িতে পাইলাম। সেখানি তাঁহারই লিখিত 'নরোত্তম চরিত'। দেখিলাম রাজকুমার 'নরুর' কি শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেম। তাঁহার একবার দর্শন লাভের জন্য রাজকুমারের কি ব্যাকুলতা! কি আর্ত্তি! তিনি প্রাণ উঘারিয়া ক্রন্দন করিতেছেন আর বলিতেছেন,—

'পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব!
গৌরাঙ্গ গুণের তরী কোথা গেলে পাব॥'

আহা! এই অপূর্ব্ব প্রেম দর্শনে জগৎ যেন মোহিত হইয়া গেল। আর

আমার এই দগ্ধ হিয়াও যেন ক্ষণিকের তরে শীতল হইল। ধন্য রাজকুমার, ধন্য তোমার প্রেম!

আমরা নরোত্তমকে রাজকুমার কেন বলিলাম, এইবার তাহা বিবৃত করিয়া বলিতেছি। সত্যই নরোত্তম রাজপুত্র ছিলেন। গৌরপদ তরঙ্গিণী, গ্রন্থে তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ পরিচয় লিখিত আছে,—"রাজসাহীজেলায় গোপালপুর নামে এক বৃহৎ পরগণা ছিল, উহার অধিপতি ছিলেন, উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-কুলোদ্ভব দত্ত বংশীয় রাজা কৃষ্ণানন্দ। * গোপালপুর মধ্যে বোয়ালিয়ার উত্তর-পশ্চিমাংশে ছয় ক্রোশ এবং পদ্মানদীর তীরস্থ প্রেমতলী হইতে উত্তর-পূর্ব্বাংশে অর্দ্ধ ক্রোশ ব্যবধানে খেতুরি নামক স্থান কৃষ্ণানন্দের রাজধানী ছিল। এই কৃষ্ণানন্দের ঔরসে ও নারায়ণী দাসীর গর্ভে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নরোত্তম ঠাকুরের জন্ম হয়। পুরুষোত্তম দত্ত নামে কৃষ্ণানন্দের এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, তাঁহার সন্তোষ দত্ত নামে এক পুত্র ছিল। নরোত্তম বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মানুরক্ত- ভোগ বিলাস বিরহিত, ও বৈরাগ্য ভাবাপন্ন ছিলেন।" খেতুরি রাজ্য একজন মুসলমান জায়গীরদারের অধীন ছিল। রাজা কৃষ্ণানন্দ এই জায়গীরদারকে কর দিতেন।

মাঘি পূর্ণিমার গোধূলি লগ্নে ঠাকুর নরোত্তম জন্মগ্রহণ করেন। যথা নরোত্তম বিলাসে,—

"কিবা মাঘ পূর্ণিমা দিবস দণ্ড ছয়।
সর্ব্ব সুলক্ষণ হৈল প্রকট সময়॥"

তাঁহার জন্ম শকাব্দ জানিতে পারাযায় না। তবে তখনও শ্রীগৌরাঙ্গ দেব প্রকট আছেন।

আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সাধারণতঃ শিশির বাবুর 'শ্রীনরোত্তম চরিত' গ্রন্থেরই অনুসরণ করিলাম। শিশিরবাবু এবং গৌরপদ তরঙ্গিণী সংগ্রহকার উভয়েই শ্রীকৃষ্ণানন্দ দত্তকে জ্যেষ্ঠ এবং পুরুষোত্তম দত্তকে কনিষ্ঠ বলিয়াছেন। কিন্তু নরোত্তম ঠাকুরের জীবনী লেখক প্রাচীন বৈষ্ণবকবি নরহরি চক্রবর্ত্তী তাঁহার 'ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের ৩৩ পৃষ্ঠায় (বহরমপুর—রাধারমণ যন্ত্রে মুদ্রিত) বলিতেছেন—"জ্যেষ্ঠ পুরুষোত্তম কনিষ্ঠ কৃষ্ণানন্দ।" 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, গ্রন্থে নরোত্তম ঠাকুরের সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে। "নরোত্তম দাস

* ইহাদের উপাধি ছিল মজুমদার।

পদ্মানদীর তীরস্থ গোপালপুরের কায়স্থ রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্তের পুত্র, মাতার নাম নারায়ণী, ইনি বৃন্দাবন বাসী লোকনাথ গোস্বামীর নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত হন। নরোত্তম রাজপুত্র হইয়াও রঘুনাথ দাসের ন্যায় সংসার ত্যাগী হন; তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতজ ভ্রাতা সন্তোষ দত্ত (পুরুষোত্তম দত্তের পুত্র) তৎস্থলে রাজা হন।'

উপেন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায় কৃত 'চরিতাভিধান' গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে—১৪৫৩ শকে মাঘ মাসে নরোত্তম দাসের জন্ম হয়।

রাজকুমার নরোত্তম ক্রমশঃ খেতুরিবাসিগণের নয়নমণি হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সুবলিত অঙ্গ, শ্যামবর্ণ, কমল নয়ন দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইত। পিতা মাতা আদর করিয়া তাহাকে 'নরু' বলিয়া ডাকিতেন। এই শান্ত প্রকৃতি সতেজ বুদ্ধি সম্পন্ন বালক মন দিয়া বিদ্যাভ্যাস করিয়া অল্প বয়সেই পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেই সময়ে খেতুরিগ্রামে কৃষ্ণদাস নামে জনৈক শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্ত প্রাচীন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। রাজকুমার তাঁহার মধুর ব্যবহারে তাঁহাতে একান্ত আকৃষ্ট হইলেন। কৃষ্ণদাস নরুকে একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারের কথা শুনাইলেন। শ্রীভগবান শ্রীগৌরাঙ্গরূপে তাঁহাদের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন একথা শুনিয়া রাজকুমার শিহরিয়া উঠিলেন। হায়! হায়! আর কিছু দিন পূর্ব্বে জন্ম হইলে তাঁহার শ্রীভগবান দর্শন লাভ ঘটিত। এখন যে তিনি তিরোহিত হইয়াছেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ-কথা শুনিতে বসিলে নরুর ক্ষুধা তৃষ্ণা মনে থাকিত না। তিনি যেন শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁহার পরিজনকে দিবা ভাগেই স্বপ্ন দেখিতেন। যখন শুনিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী হইয়া সংসার ত্যাগ করিয়া ছিলেন তখন তিনি বড়ই কাঁদিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ তাঁহার পূর্ব্বরাগের সঞ্চার হইল। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ কথা একটী একটী করিয়া সমস্তই শুনিলেন। তাঁহার পার্ষদগণের কথা শুনিলেন। আরও শুনিলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গের অদর্শনে স্বরূপ ও দামোদর প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। অন্যান্য ভক্তগণ গৌর শূন্য নীলাচলে থাকিতে না পারিয়া বৃন্দাবনে পলাইয়া গিয়াছেন। কারণ তাঁহারা শুনিয়াছিলেন—প্রভু, সংগোপনের পর বৃন্দাবনে লুকাইয়া আছেন। কেবল মাত্র দামোদর পণ্ডিত প্রভুর ঘরণী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত নবদ্বীপে অবস্থান করিতেছেন। সমস্ত শুনিয়া রাজকুমার স্থির করিলেন সর্ব্ব প্রথমে তাঁহার একবার বৃন্দাবনে গমন করাই উচিত।

এখন রাজকুমারের একমাত্র চিন্তা কিরূপে তাহার বৃন্দাবন দর্শন ঘটিবে। কিরূপে গোবিন্দ, কাশীশ্বর, বক্রেশ্বর, জগদানন্দ প্রভৃতি প্রভু-পার্ষদগণের দর্শন লাভ হইবে। কখন বা তিনি পদ্মাবতী তীরে গিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন। কারণ তিনি শুনিয়াছিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ বৃন্দাবন যাইবেন বলিয়া লক্ষ লক্ষ লোক বেষ্টিত হইয়া পদ্মার পর পার দিয়া নৃত্য করিতে করিতে গমন করিয়াছিলেন। যদি সে দেব দর্শন ঘটে, রাজকুমার বড় আশায় বুক বাঁধিয়া পদ্মার পর পারের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। কখন তাহার মনে হইত, তাহার শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শন লাভ ঘটিল; যেন তিনি (শ্রীগৌরাঙ্গ) লক্ষ লক্ষ লোক লইয়া পর পারে নৃত্য করিতে করিতে যাইতেছেন।

এক দিবস নরু পদ্মায় স্নান করিতে গিয়া আর বাড়ী আসিলেন না। মাতা পিতা আকুল হইয়া নিজেরাই তল্লাস করিতে ছুটিলেন। দেখিলেন তাঁহাদের নরু সেখানে নাই, তবে তাহারই মত একটী গৌরবর্ণ বালক তীর ভূমিতে উন্মাদের মত নৃত্য করিতেছে। নরুর মাতা নরু পদ্মায় ডুবিয়া মরিয়াছে ভাবিয়া 'নরু' 'নরু' বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। নৃত্যকারী বালকটী 'নরু' 'নরু' স্বরে ক্রন্দন শুনিয়া একটু স্থির হইলেন। ক্রমশঃ চেতনা পাইয়া মাতার কাছে গিয়া বলিলেন 'মা, তুমি কান্দিতেছ কেন? এই ত আমি আছি।'

ঘাটে বহুলোক ছিলেন, কিন্তু কেহই রাজকুমারকে দেখিয়া চিনিতে পারেন নাই। কারণ তিনি শ্যামবর্ণ ছিলেন, এ যুবক উজ্জল গৌরবর্ণ।

নরুর এইরূপ অবস্থা সম্বন্ধে প্রেম বিলাস গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে যে, শ্রীগৌরাঙ্গ যখন বৃন্দাবন গমন করিতে ছিলেন তখন রাম কেলি গ্রাম হইতে 'নরোত্তম' 'নরোত্তম' বলিয়া কয়েকবার হুঙ্কার করিতে ছিলেন, সেই আকর্ষণে নরোত্তম ঠাকুরের জন্ম হয়। প্রভু ও নিত্যানন্দ পদ্মাবতীর নিকট প্রেমধন গচ্ছিত রাখিয়া বলিয়াছিলেন নরোত্তম দাস জন্ম গ্রহণ করিলে তাহাকে তুমি ইহা প্রদান করিবে। অত্র স্নান করিতে আসিলে পদ্মাবতী নদী দেহ ধারণ করিয়া গচ্ছিত ধন তাহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। তাহাতে নরুর শ্যামবর্ণ দেহ গৌরবর্ণ ধারণ করিয়াছিল এবং তিনি প্রেমে অচেতন হইয়াছিলেন।

বাড়ী আসিয়া তিনি সুস্থির হইতে পারিলেন না। দেহে উপদেবতা ভর করিয়াছে ভাবিয়া কত ওঝা ডাকা হইল কত ঔষধ দেওয়া হইল কিন্তু

কিছুতেই তাহার তপ্ত হৃদয় শীতল হইল না। নরু বলিল 'মা, যদি আমাকে বাঁচাইবার ইচ্ছা থাকে তবে আমাকে একবার বৃন্দাবন দর্শনের অনুমতি দাও; তাহাতে আমি সুস্থির হইব। মাতার ধারণা কিন্তু অন্যরূপ, তিনি ভাবিলেন বৃন্দাবনে গেলে নরুকে আর পাওয়া যাইবে না। কাজে কাজেই তাহার বৃন্দাবন দর্শনের অনুমতি মিলিল না।

কিন্তু নরোত্তমের বাসনা শ্রীগৌরাঙ্গ পূর্ণ করিলেন। যথা নরোত্তম বিলাসে,

"নরোত্তমের জনক অকস্মাৎ।
রাজকার্য্যে গৌড়ে গেলা বহুলোক সাথ॥
নরোত্তম জানি শুভক্ষণ সেইক্ষণে।
প্রকারে বিদায় উহার জননীর স্থানে॥
পরম সুবুদ্ধি সর্ব্বমতে বিচারিলা।
রক্ষকে বঞ্চিয়া সঙ্গোপনে যাত্রা কৈলা॥
নবদ্বীপ আদি স্থান না করি ভ্রমণ।
লোক ভয়ে বন পথে চলে বৃন্দাবন॥"

রাজকুমার গৌর প্রেমে বিহ্বল হইয়া গমন করিতেছেন। বহু পথ অতিক্রম করিয়া তিনি মথুরায় গমন করিলেন। আর চলিতে পারিতেছেন না। কাতর হইয়া তিনি বিশ্রাম ঘাটে শয়ন করিয়া রহিলেন।

এদিকে জীব গোস্বামী স্বপ্নে তাঁহার আগমন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বিশ্রাম ঘাটে একজন লোক পাঠাইয়া দিলেন। সেই লোক বিশ্রাম ঘাট হইতে তাহাকে লইয়া জীব গোস্বামীর নিকট উপস্থিত করিয়া দিল।

নরোত্তম দেখিলেন তিনি নিরাশ্রয়ে ভাসিতেছেন না। শ্রীগৌরাঙ্গ তাহাকে ত্যাগ করেন নাই। তিনি শ্রীজীবের নিকট গমন করিয়া ছিন্নমূল দ্রুমের ন্যায় তাঁহার চরণে পড়িলেন। আর শ্রীজীব আদর করিয়া তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করলেন।

তিনি শ্রীজীবের আশ্রয় পাইলেন। ক্রমশঃ তাঁহার পথের ক্লেশ দূর হইল। তখন তিনি সাধু দর্শনে বাহির হইলেন। তিনি কুঞ্জে কুঞ্জে সাধু দর্শন করিয়া বেড়াইতেছেন শত শত গৌরাঙ্গ ভক্ত, সকলেই ভুবন পাবন, ঘোর বিরাগী, প্রেমে উন্মত্ত। নরোত্তম লোকনাথকেও দেখিলেন। দেখিয়াই তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিলেন। কিন্তু প্রভু লোকনাথ আপন সাধন ভজনে এতই

মগ্ন থাকিতেন যে কাহারও সহিত কথা কহিবারও তাঁহার অবকাশ ছিল না। যথা অনুরাগবল্লী ৪র্থ মঞ্জরী,—'পরম বিরক্ত কথা নাহি কারু সনে।'

নরোত্তম প্রভু লোকনাথে চিত্ত সমর্পণ করিয়া ক্রমশঃ শুনিলেন যে তিনি কাহাকেও শিষ্য করিবেন না বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছেন। তখন নরোত্তমের মনের অবস্থা কিরূপ হইল তাহা সহজেই বুঝা যায়। যথা—

শ্রীলোকনাথ গোসাঞিরে দেখিলা যখন।
তখনি করিলা মনে আত্মসমর্পণ॥
তাঁর চেষ্টা মুদ্রা দেখি কহিতে না পারে।
কি মতে হইব ইহা সতত বিচারে॥
রাত্রিদিন সেই স্থানে অলক্ষিতে যাঞা।
বাহিরে টহল করে সশ্রুনেত্র হঞা॥
মৃত্তিকা শৌচের তরে সুন্দর মাটী আনে।
ছড়া ঝাটি জল আনে বিবিধ সেবনে॥
প্রত্যহ গোসাঞি দেখি হয়েন বিস্মিত।
কোন বা কৃতি যার এমন চরিত॥
দেখিবারে যত্ন করে দেখিতে না পায়।
তুচ্ছ সেবা দেখি চিত্তে করুণ হিয়ায়॥
এই মত কথোদিন সেবন করিতে।
দৈবে এক দিন তারে দেখে আচম্বিতে॥
পুছয়ে সে তুমি কেনে কর হেন কাজ।
বন্দিয়া ঠাকুর কহে পাঞা ভয় লাজ॥
কেবল তোমার প্রসন্নতা চাহ প্রভু।
এই কৃপা কর মোরে না ছাড়িবা কভু।
তিঁহো কহে এক আমি সেবক না করি।
আর যেই কহ তাহা যে করিতে পারি॥
তোমার সেবনে আমা দ্রবীভূত মন।
আর না করিহ মোরে ছাড় বিড়ম্বন॥
পড়িয়া কান্দিয়া কহে প্রভুর চরণ।
যখন দেখিনু কৈনু আত্ম-সমর্পণ॥

যে তোমার মনে আইসে তাহা তুমি কর।
মোর প্রভু তুমি মুঞি তোমার কিঙ্কর॥
শুনিয়া গোসাঞি মৌন হইয়া চলিলা।
আর দিন হইতে স্পষ্ট সেবিতে লাগিলা॥
গোসাঞি কথনো তাঁরে কিছু নাহি বোলে।
ইচ্ছা অনুরূপ কার্য্য আগে যাই করে॥
এই মত বৎসরেক করিয়া সেবন।
নানান্ প্রকারে তাহা না যায় কথন॥
তবে এক যুক্তি মনে গোসাঞি করিয়া।
সাক্ষাতেই কহিলেন ঠাকুরে ডাকিয়া॥
মনে জানে ইহারে কহিব হেন কথা।
যাহা করিবারে নাহি পারয়ে সর্ব্বথা॥
অয়ে নরোত্তম এক মোর বোল ধর।
মনে ভাবি দেখ যদি করিবারে পার॥
তবে আমি উপাসনা করাইব তোরে।
অন্যথা এ কথা আর না কহিও মোরে॥
ঠাকুর কহয়ে প্রভু তুমি যে কহিবা।
অনুগ্রাহ উষ্ণ-চালু মৎস্য না খাইবা॥
একথা শুনিয়া ঠাকুর আনন্দিত হঞা
দীঘাল হইয়া পড়ে চরণ ধরিঞা॥
পুলকে ভরিল তনু, আর্ত্তনাদে কান্দে।
অঙ্গ থর থর কাঁপে থির নাহি বান্ধে॥
তাহাই করিমু প্রভু যে আজ্ঞা হৈল তোর।
মাথে পদ দিয়া কহ নরোত্তম মোর॥
বিস্মিত হৈলা গোসাঞি উৎকণ্ঠা দেখিয়া।
রাখিতে না পারে অশ্রু পড়ে বুক বাঞা॥
তবে সে ঠাকুরের মাথে পদ আরোপিয়া।
কোলে করি কহে অতি ব্যগ্রচিত্ত হৈয়া॥
জানি জন্ম জন্ম তুমি হও মোর দাস।
অন্যথা এমত আর্ত্তি কেমতে প্রকাশ॥

ঠাকুর কহয়ে যদি কৃপা হৈল মোহে।
দীক্ষামন্ত্র দেহ প্রভু বিলম্ব না সহে॥
তবে ঘরে বসিয়া দীক্ষার প্রকরণ।
আনুপূর্ব্ব কহে ভাবে গর গর মন॥
হরিনাম রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র পঞ্চনাম।
দিয়া কহে সেবা সাধ্য সাধন বিধান॥
মহাপ্রভু শচীপুত্র ব্রজেন্দ্র কুমার।
নির্য্যাস কহিল সব সিদ্ধান্তের সার॥
সিদ্ধনাম থুইলেন বিলাসমঞ্জরী।
আপনার নাম কহিলেন মঞ্জুনালী॥
এতেক সংক্ষেপে কহি কহিল তাঁহারে।
ক্রমে ক্রমে পাবা তুমি ইহার বিস্তারে॥
ঠাকুর একান্তে মন্ত্র স্মরণ করিয়া।
গুরুকৃষ্ণ সাধু তুলসীরে প্রণমিয়া॥

* * *

গোসাঞি ভোজন কৈলা পাত্র শেষ লৈঞা॥
রহিলা সেথানে অহর্নিশ সেবা করে।
কায়মনোবচনে সন্তোষে গোসাঞিরে॥" (ঐ)

নরোত্তমের সহিত লোকনাথ প্রভুর কুঞ্জেই শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু ও শ্যামানন্দের আলাপ হয়। এই শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দেরও শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেম অতি চমৎকার ছিল। শ্রীনিবাসও নরোত্তমের ন্যায় মহাপ্রভুর বরপুত্র বলিয়া বৈষ্ণব সমাজে সম্পূজিত।* তাহারা তিনজনে শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট সমগ্র ভক্তি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলেন। অতঃপর জীব গোস্বামী নরোত্তমকে "ঠাকুর মহাশয়" উপাধি দান করেন।

---

* "বৈষ্ণব সমাজে নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য্য ও গদাধর দাস এক সময়ে যে সম্মানলাভ করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী সময়ে শ্রীনিবাস আচার্য্য নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দও সেইরূপ শ্রদ্ধাপ্রাপ্ত হইয়াছেলেন। এমন কি, বৈষ্ণব সমাজে শ্রীনিবাস ও নরোত্তম মহাপ্রভুর দ্বিতীয় অবতার বলিয়া আদৃত। ইহাদের জীবন বিস্তৃত ভাবে বর্ণন করিতে বহু সংখ্যক গ্রন্থকার লেখনী ধারণা করিয়াছিলেন। এই বিরাট অধ্যবসায় চিহ্নিত কীর্ত্তির প্রান্তে দাঁড়াইয়া

জীব গোস্বামী বৃন্দাবনে রচিত সমগ্র বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী তাঁহাদিগের দ্বারা বঙ্গদেশে প্রচারের জন্য ইচ্ছা করেন এবং গ্রন্থগুলি এক সিন্দুকে পুরিয়া গোযানে ১৫০৪ শকে ১০।১২ জন পাদাতিক সৈন্য বেষ্টিত হইয়া প্রেরিত হইল। কিন্তু পথে বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বিরের নিযুক্ত দস্যুগণ পুস্তক লুণ্ঠন করে। এই সিন্দুক মধ্যে সনাতন গীতা, ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বল নীলমণি, ভাগবতামৃত দাস গোস্বামীর গ্রন্থ, ষট সন্দর্ভ, চৈতন্য চরিতামৃত প্রভৃতি রক্ষিত ছিল। ইহাতে তাঁহারা কিরূপ দুঃখ পাইয়াছিলেন তাহা সহজেই অনুমেয়। শ্রীনিবাস গ্রন্থগুলির অনুসন্ধানার্থে তথায় থাকিয়া অপর দুইজনকে খেতুরিতে পাঠাইয়া দিলেন যথা প্রেমবিলাসে—

"প্রাতঃকালে দুইজনে করিল বিদায়।
কে কহিবে কত দুঃখ উঠিল হিয়ায় ॥
করে ধরি কহে শুন ওহে নরোত্তম।
না পাইলে গ্রন্থ সব ছাড়িব জীবন।
কান্দিয়া কান্দিয়া দোঁহে হইল বিদায়।
ইহদেশে যান তেঁহ কান্দিয়া বেড়ায় ॥
ঠাকুর মহাশয় দুঃখিত অন্তর বাহিরে।
না জানয়ে কোথা থাকে কোথা কারে ॥"

ঠাকুর মহাশয় অতি দুঃখে দেশে ফিরিয়া আসিলেন। রাজা ও রাণী পুত্র মুখ দেখিয়া আনন্দে মগ্ন হইলেন, খেতুরিতে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইল। তাঁহারা দেখিলেন তাহাদের নরু এখন দেবতা হইয়াছেন। অঙ্গে কৌপীন ও বহির্ব্বাস, হস্তে হরিনামের মালা। পাত্র মিত্রগণ আসিয়া তাঁহার চরণ তলে লোটাইল। সকলে তাঁহার নূতন সৌন্দর্য্য দেখিয়া মোহিত হইয়া গেল।

ঠাকুর মহাশয় আর গৃহে গেলেন না। ঠাকুর বাড়ী থাকিয়া স্বপাকে একবার আহার ও তিন সন্ধ্যা স্নান করেন। পিতামাতাকে বলিলেন তিনি আর সংসারে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। গুরুর নিকট ব্রহ্মচর্য্যব্রত লইয়াছেন,

---

আমাদিগকে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। বটতলার কর্ম্মঠতা ও উদ্যম এই সাহিত্যের অতি নগণ্য অংশ মাত্র এ পর্য্যন্ত মুদ্রিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। কীট অগ্নি প্রভৃতির উপদ্রবে বৎসর বৎসর এই প্রাচীন কীর্ত্তিরাশি লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার উপযুক্ত কোন আয়োজন এখনও পর্য্যন্ত হয় নাই। (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৩৭০ পৃষ্ঠা।

যে ব্রত ভঙ্গ হইলে তাহাকে পতিত হইতে হইবে। যতদিন তাহার জীবন থাকিবে ততদিন তাঁহাদের সেবা করিবেন এই জন্যই তিনি দেশে আসিয়াছেন। এবং ইহাই তাহার গুরুর আদেশ।

শ্যামানন্দ বিদায় লইয়া দেশে চলিয়া গেলেন। ঠাকুর মহাশয় পিতাকে বলিয়া তাহার সহিত দুইজন লোক দিয়া দিলেন। শ্যামানন্দকে বিদায় দিয়া ঠাকুর মহাশয় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

এদিকে আচার্য্য প্রভু গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছেন। রাজা বীরহাম্বির ধন রত্ন বোধে গ্রন্থ সম্পুট চুরি করিয়াছিলেন এক্ষণে প্রকৃত ব্যাপার অবগত হইয়া তাহা আচার্য্য প্রভুকে ফেরত দিয়াছেন। এবং নিজে দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করিয়া আচার্য্য প্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।

কিয়দ্দিবস পরে মাতা পিতার নিকট অনুমতি লইয়া ঠাকুর মহাশয় শ্রীগৌর-মণ্ডল ভূমি দর্শন করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। নদীয়া নগরের আর সে শোভা নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ নাই—তাহার সেই ভুবন পাবন পার্ষদ বৃন্দ নাই—সমগ্র নদীয়া আজ অন্ধকার ময়। যথা নরোত্তম বিলাসে,—

কেহ কেহ কান্দিয়া কহয়ে হেঁট মাথে।
ওই দেখ প্রভু বাটী যাহ এই পথে॥
প্রভুর ভবন দেখি কান্দে নরোত্তম।
দুই নেত্রে ধারা বহে নদী ধারা সম॥
সেই পথে আইসে ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর।
নরোত্তমে দেখি হৈলা ব্যাকুল অন্তর॥
নরোত্তম প্রণমিলা পড়ি ভূমিতলে।
দেহ পরিচয় বলি তেঁহ কৈলা কোলে॥
নরোত্তম নিজ পরিচয় নিবেদিতে।
পরম বাৎসল্যে কহে কান্দিতে কান্দিতে॥
যবে গৌরচন্দ্র রামকেলি গ্রামে গেলা।
প্রেমে মহামত্ত হৈয়া তোমা আকর্ষিলা॥
কে বুঝিতে পারে সেই প্রভুর চরিত।
পূর্ব্বেই তোমার নাম করিলা বিদিত॥
ওহে বাপু নরোত্তম তোমারে দেখিতে।
বড় সাধ ছিল সর্ব্ব মহান্তের চিতে॥

প্রভুর বিরহে স্থির নহে কার মন।
কেহ কেহ অল্প দিনে হৈলা অদর্শন॥
এত কহি নিজ পরিচয় জানাইলা।
প্রভু ভক্তগণে নরোত্তমে মিলাইলা॥"

নবদ্বীপ হইতে বিদায় লইয়া তিনি শান্তিপুরে গেলেন। সেখানেও এইরূপ ব্যাপার। অদ্বৈত প্রভু তিরোহিত হইয়াছেন। শ্রীঅচ্যুতানন্দ, নরোত্তমকে আলিঙ্গন করিয়া গৃহে লইলেন। অতঃপর তিনি "হরি নদ' গ্রামে আসি গাঙ্গ পার হৈয়া।" অম্বিকা কালনায় হৃদয় চৈতন্যের গৃহে উপনীত হইলেন। এখান হইতে বিদায় লইয়া তিনি খড়দহ যাত্রা করিলেন। পথে মহেশ পণ্ডিত প্রভৃতির সহিত মিলন হইল। প্রভু-ভক্তগণ মাত্রেই নরোত্তমের কথা শ্রবণ করিয়াছেন। তাঁহাদের বৃন্দাবন গমনাগমন, গ্রন্থ চুরি ও গ্রন্থ প্রাপ্তি কাহিনী মুখে মুখে সর্ব্বত্র প্রচার হইয়াছে। খড়দহে,—

"শ্রীবসু জাহ্নবী দেবী দেখি নরোত্তমে।
হইলা অধৈর্য্য হিয়া উথলয়ে প্রেমে॥
মহাশয় নাম সে ইহার যোগ্য হয়।
ঐছে পরস্পর কত স্নেহে প্রশংসয়॥
নরোত্তম প্রতি অনুগ্রহ অতিশয়।
রাখিলেন দিন চারি ছাড়িতে নারয়।" (নরোত্তম বিলাস)

ক্রমশঃ

শ্রীভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা

মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ

প্রত্যহই আমাকে কলিকাতায় আসিতে হয়, যখন আসি তখন বেশ প্রফুল্ল মনেই আসি কিন্তু সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিয়া সন্ধ্যার সময় যখন বাড়ীতে ফিরি তখন আর যেন দেহে কিছু নাই বলিয়াই মনে হয়। এক পা চলিতে দু'পা পিছাইয়া পড়ি। কোন রকমে গাড়ী ধরিয়া যেমন গিয়া ষ্টেশনে নামি অমনি যেন কেমন একটা বৈদ্যুতিক ক্রিয়া আমার দেহের ভিতর হইতে থাকে। তখন যা ১০।১৫ মিনিট চলিতে হয় সে একেবারে তীরবেগে। এই করিয়াই আজ ৭ বৎসর কাটিতেছে। তবে প্রত্যহই যে বাড়ীতে ফিরি তাহা নয়, কোন কোন দিন কোন বন্ধুর বাড়ীতে থাকিয়াও যাই। বাড়ীতে পৌছাইলেই ছেলেরা আমার নিকট ছুটিয়া আসে, প্রথম প্রথম দু'চার দিন তাদের জন্য কিছু কিছু

নিয়াও গিয়াছি, কিন্তু ইদানিং আর তাহা হয় না, কেন যে হয় না তাহা আর বোধ হয় কাহাকেও খুলিয়া বলিতে হইবে না। সে কেবল অখণ্ড মণ্ডলাকার রৌপ্য খণ্ডের অভাবে। যাক্ একদিন কর্ম্মস্থলে বসিয়া কলম চালাইতেছি আর মনে মনে চিন্তা করিতেছি যে, আর কতদিন এমন ভাবে পরের গোলামী করিয়া যাইবে ; এমন দিন কি আমার ভাগ্যে হইবেনা, যে দিন কাহারও মুখের দিকে না তাকাইয়া স্বাধীন ভাবে জীবন কাটাইতে পারিব ? এখানে বলিয়া রাখি জীবনে কখনও আমার মনে এ ভাবের উদয় হয় নাই যে, দু'পয়সা জমাইয়া নিজের বা পরিজনবর্গের "চাল" বাড়াইয়া জনসমাজে বড়লোক হইয়া থাকিব। যে কোন প্রকারে দুটী খাওয়া আর সাধারণ ভাবে পোষাক পরিচ্ছদ হইলেই আমার যথেষ্ট বলিয়া মনে হয়। ভগবানের কৃপায় সংসারেও যাহাদের পাইয়াছি তাহাদেরও মতি গতি আমারই মত। কাজেই হাজার প্রলোভন আসিলেও শ্রীগুরুদেবের কৃপায় আজ পর্য্যন্ত পয়সার জন্য আমাকে আমার কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত হইতে হয় নাই।

যখন আমার মনে পূর্ব্বোক্ত চিন্তা উদয় হইয়াছে তখন যাহা লিখিতেছিলাম কেমন একটা চিন্তার বোঝা আসিয়া সে ভাবটা চাপাদিয়া আমাকে অস্থির করিয়া তুলিল। আর লেখা হইলনা, আমি আস্তে আস্তে কলম রাখিয়া কিছু কাল চুপ করিয়া বসিয়া আছি, ঠিক সেই সময় আমার উপরওয়ালা আসিয়া আমাকে চিন্তাকুল ভাবে দেখিয়া বলিলেন—"ভাব্‌ছো কি, তোমার মুখ অমন শুক্‌নো কেন, কোন অসুখ করেছে নাকি ? তাহ'লে বাড়ী যাও।" তিনি একেবারে এতগুলো কথা বলিয়া আমার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই চলিয়া গেলেন। আমিও উপরওয়ালার আদেশ পাইয়া খাতাপত্র তুলিয়া বাড়ী চলিলাম। সেদিন যেন কেমন হইল আর ট্রামে না উঠিয়া পদব্রজেই চলিলাম। যখন হাওড়ার পুলের নিকট গিয়া পৌছিয়াছি তখন যেন একটু মনটা নিজের আয়ত্তে আসিল, তাড়াতাড়ি পুল পার হইয়া ষ্টেশনে গেলাম, গিয়া দেখি ট্রেন নাই প্রায় ৷৷০ ঘণ্টা পরে তবে আবার ট্রেন পাইব। মনে করিলাম এ সময়টা আর এখানে বসিয়া নাকাটাইয়া গঙ্গার ধারে গিয়া বসি। আস্তে আস্তে গঙ্গার ধারে বাঁধান ঘাটের একটা পৈঠার উপর বসিয়া একমনে গঙ্গার ঢেউ গুলি দেখিতেছি। আর আকাশ পাতাল কত কি ভাবিতেছি।

একবার ভাবিতেছি এই গঙ্গার মধ্যে কত মৎস্য মনের সুখে বিচরণ করিতেছে তারা তো কাহারও চাকর নয়, যেখানে ইচ্ছা যায় যাহা ইচ্ছা

করে। উপরের দিকে চাহিয়া দু চারটা পাখী দেখিয়া মনে হইল, আহা! ইহারা তো আরও সুখী, মুক্ত আকাশে মুক্ত বাতাস গায় লাগাইয়া বোধহয় ইহারাও মুক্ত হইয়া গিয়াছে, তাই বুঝি ইহারা আনন্দে অনন্তের দিকে চলিয়াছে। এইরূপ কত কিযে ভাবনা আসিয়া পর পর জোগান দিয়া মনকে চঞ্চল করিতেছিল তাহার সীমানাই। ভাবনা চলিয়াইছে এবার কেমন বিরক্ত ভাব আসিয়া অস্থির মনকে ধিক্কার দিতে লাগিল কিন্তু মন তাহা শুনিল না শেষে বিরক্ত হইয়া খুব গলা ছাড়িয়া শ্রীল কিশোর দাস মহাশয়ের

"আর কতবা বেড়াব কেঁদে (হরিহে)।
আমায় কেবা স্নেহ করে কে যন্ত্রণা হরে
(আমায়) আপন জনে মারে বেঁধে॥
কপট থাকিতে নাহয় সাধু অনুকুল
কপট থাকিতে গুরু কৃষ্ণ প্রতিকূল
গেল একুল ওকুল ভাবিয়ে অকুল আকুল ঘোর বিপদে॥
আমার দুঃখ আমি নিবেদিব কায়
চোরের কান্নাদেখে কেবা প্রত্যয় যায়
কেহ ফিরে নাহিচায় দেখি নিরুপায়
মরিনু আপন খেদে :—
কপট ছেড়ে ডাকি মনে হেন বাসি
স্বভাব ছাড়ে না ভাবি দিবানিশি
শুনি গুণরাশী অদোষদরশি কিশোর পড়িল পদে॥

এই গানটী গাহিলাম, বলা বাহুল্য আমি চোক বুজিয়াই গান করিতেছিলাম, শেষ হইলে চাহিয়া দেখি ৭।৮ জন লোক আমার চারিদিকে ঘেরিয়া বসিয়াছে আমার যেন একটু কেমন লজ্জা বোধ হইল, আমি একবার এদিকওদিক চাহিয়া উঠিলাম উঠিয়া ঘড়িদেখিলাম এখনও ট্রেণছাড়িতে আধঘণ্টা দেরী। আবার যেমন বসিয়া ছিলাম তেম্‌নিই বসিলাম।

হঠাৎ একটা ঢেউ আসিয়া ২।৩টা পৈঠা ধুইয়া দিয়া গেল। অমনি কেমন মনে হইল ভগবানের কৃপার ঢেউ লাগ্‌লেও বুঝি এম্‌নি ক'রে মনের ময়লা ধুইয়া পরিষ্কার হইয়া যায়। অমনি মনে পড়িয়া গেল সেই "নির্ম্মল কর মঙ্গল করে মলিন মর্ম্ম মুছায়ে" গানটা, গুন্ গুন্ করিয়া গানটী যতদূর মনে আসিল গাহিলাম। এই ভাবে কত রকমের ভাবনা চিন্তা লইয়া কতক্ষণ যে ছিলাম জানিনা। হঠাৎ কে যেন পিছন হইতে আমার চোক দুটী চাপিয়া ধরিল, আমি একটু চকিত ভাবে তাহার হাত দু'খানি ধরিয়া পরিচিত দু'চার জনের নাম

বলিলাম কিন্তু কোনটাতেই তাঁহার সহিত ঠিক মিলিল না। কিছু সময় পরে তিনি নিজেই হাত ছাড়াইয়া আমার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন 'কিহে! তুমি যে একেবারে ঢেউগুলি সবই গুণে যাচ্ছ' আবার কি কোন প্রত্নতত্ত্ব বের করবে নাকি?' আমিতো অবাক্, এযে আমার বিশেষ বন্ধু বাল্যসহচর ক্ষীরোদ চন্দ্র, প্রায় ৩ মাস পূর্ব্বে সংবাদ পাইয়াছিলাম নৌকা ডুবি হইয়া ক্ষীরোদ পদ্মাগর্ভে জীবন লীলা সাঙ্গ করিয়াছে, আমি তখন তার জন্য খুবই দুঃখ করিয়া ছিলাম, অবশ্য সে দুঃখের ভাগটা এখন ক্রমে কমিয়া গিয়াছিল। আজ একেবারে হঠাৎ চক্ষের সাম্নে ক্ষীরোদকে দেখে আমি যেন কেমন এক রকম হইয়া গেলাম। সে আমার মনের ভাব ঠিক বুঝিয়াই বলিল,"ভাবছো কি, আমি মরিনাই, নৌকা ডুবেছিল বটে, আমিও ডুবেছিলাম কিন্তু যাঁর কৃপায় রক্ষা পেয়েছি তাঁর সন্ধানটা দিবার জন্যই তোমার কাছে যাচ্ছিলাম, কিন্তু ট্রেণের সময় আছে বলিয়া গঙ্গায় হাত মুখটা ধুইয়া যাইব মনে করিয়া এখানে বসিয়া ছিলাম, আসিয়াই দেখি তুমি ধ্যানস্থ। যাক্ এখন কথা হচ্ছে এই যে, আমি যাঁর কৃপায় উদ্ধার পাইয়া আজ তোমাদের নিকট আবার আসিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছি সেই মহাপুরুষটী আজ রাত্রেই কলিকাতায় পৌঁছিবেন। আজ না পার কাল সন্ধ্যার পর আমাদের বাড়ীতে আসিয়া তাঁহার দর্শন করিয়া যাইবে। আর একটা কথা তোমাকে বলিয়া দিতেছি তিনি কিন্তু খুব সঙ্গীত প্রিয়, তোমায় সেদিন রাত্রে আর বাড়ী ফেরা হইবেনা, কেননা রাত্রে তাঁহাকে গান শুনাইতে হইবে। তোমার গাড়ীর সময় হইয়াছে তুমি যাও আমি মহাপুরুষের জন্য কিছু ফল মূলাদি কিনিয়া তাঁহাকে আনিবার জন্য শিয়ালদহ ষ্টেশনে যাইব।" এই বলিয়া ক্ষীরোদ চলিয়া গেল আমি কিছুই বলিতে পারিলাম না, কেবল ভাবিতে লাগিলাম একি ব্যাপার—সুদীর্ঘ তিন মাসকাল ক্ষীরোদের কোন সাড়াশব্দ পাই নাই হটাৎ একেবারে জীবনদাতা মহাপুরুষকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত, যাক্, কাল দেখা যাবে এবং মহাপুরুষের নিকট হইতেই শুনা যাইবে কিপ্রকারে ক্ষীরোদ রক্ষা পাইয়াছে।

গঙ্গা দেবীকে প্রণাম করিয়া ও একটু গঙ্গাজল মাথায় দিয়া ষ্টেশনে চলিলাম। যথাকালে গাড়ী ছাড়িয়া দিল আমিও কেবল ভাবিতে লাগিলাম, এ কি ব্যাপার! সহৃদয় পাঠকগণ! এবার শুধু মহাপুরুষ-প্রসঙ্গের সূচনাই হইয়া রহিল আগামী বার হইতে যথানিয়মে তাঁহার কথা আলোচনা হইবে।

শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ভক্তি

(২০শ বর্ষ ৮ম সংখ্যা চৈত্র মাস ১৩২৮ সাল)

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥"

আমি কে ?

আমি আমি আমি সকলে বলে।
আমি যে কে—তা জানে না সকলে॥
কে আমি, আমি কি, কি আমি চাই।
অন্বেষণ কেন না কর ভাই!
জ্ঞান, আত্ম-জ্ঞান-বিহীন হ'লে।
নিগূঢ় নিরয়ে পচে সকলে॥
আচার্য্য-শঙ্কর অমোঘবাণী।
কেন বল তবে তাহা না শুনি!
আগে আমি কে—তা জানিতে হবে।
পরে মৃগ্যমম দেখিতে পাবে॥

কে আমি, কে আমি দিলাম তাড়া।
নিশি শেষে তার পাইনু সাড়া॥
এই যে আমি গো, বিশ্ব জুড়িয়া।
আছিনু সুষুপ্ত রাত্র পাইয়া॥
বিশ্বব্যাপী আমি দিবসে জাগি।
কর্ম্ম করি, দিন-যাপন লাগি॥
অতীত ভবিষ্য কি বর্ত্তমানে।
আমিই আছি গো সকল স্থানে॥
দেহ গেহ সব বদল হয়।
আমি থাকি কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডময়॥

দুই মূরতিতে প্রকাশ হই।
নর নারী বপু বিভাগ দুই॥
প্রকাশে বিভাগ স্বরূপে নয়।
স্বরূপ আমার আনন্দময়॥
কোথাও ভাষায় উচ্চারি 'আমি'।
ভূধরে সরিতে অন্তরযামী॥
তাই সবে দেব ঋষিরা হেরে।
অনুভব নাই সহজ নরে॥
জড় যদি কভু কোথা না রয়।
তবু আমি র'ব ভুবন ময়॥

আমি নিত্য সত্য নই নশ্বর।
আমি দেব আমি হই ঈশ্বর॥
জড় দেহ গেহ অনিত্য হয়।
তাতে কেন মুগ্ধ হবে চিন্ময়?

আমি কি বলিব আমার কথা?
আমারে জানিলে ঘুচিবে ব্যথা॥
আনন্দে হৃদয় ভরিয়া যাবে।
তাই বলি মোরে জান গো সবে
ব্যাধি না চিনি, চাই প্রতিকার।
তাই আমাদের এ দুঃখ ভার॥
কিন্তু চিরানন্দ পাইতে হ'লে।
নিরানন্দে ত্রাণ চাহিতে গেলে॥
'আমি' কে যে বলে সবার মুখে।
জানা চাই জ্ঞান-নয়নে দেখে॥

জীব ক্ষুদ্র শক্তি মায়ার বশ।
মায়া মোহে থাকে সদা অবশ॥
আত্ম-অন্বেষণ কভু না করে।
বিষাদে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরে॥
দেহে আমি ভাবি' থাকে জগতে।
দেহ যে আধার নারে বুঝিতে॥
কার সুখ দুঃখ ভাবে আমার।
জন্ম কাটায় করি' হাহাকার॥
সুখ দুঃখ করে দেহে বসতি।
আমাতে ভাবিয়া পায় দুর্গতি॥

আমি সাক্ষী মাত্র সকল দেখি।
ভোক্তা ভাবিয়া মজে জীব-পাখী॥
অধিষ্ঠান যবে যে জীবে করি।
সেই সে জীবাত্মা যেনাম ধরি॥

যদি সে কখন গুরু-কৃপায়।
আমি যে কে—তা জানিতে পায়॥
সচ্চিদানন্দ স্বরূপ বৃহৎ 'আমি'র।
দাস্য ভাবেতে জুড়ায় শরীর॥
কর্ম্ম করে তায় না লাগে দাগ।
সদানন্দে থাকে সে মহাভাগ॥

আমি দেহ নই, আমার দেহ।
আধার স্বরূপ, আমি আধেয়॥
আমি সে অহং থাকি শ্রীগীতায়।
'মামেকং' আজ্ঞা করেছি কৃপায়॥
আমি ঈশ্বর, হৃদ্দেশে সবার।
'তিষ্ঠতি' ক'রেছি ভবে প্রচার॥
আমি সে অহং গীতায় বাস।
'ত্বাং মোক্ষয়িষ্যামি' দিয়াছি আশ॥

সকল জনের 'নাহং প্রকাশ'।
যোগ মায়াবৃত যেন ঘটাকাশ॥
আকাশে যেভাবে চলে পবন।
আমাতে সেরূপ জীব গমন॥
আমিত উত্তম পুরুষ হই।
পুরুষ-উত্তম কে আমা বই॥
যে যেথা যখন বলিছে 'আমি'।
প্রকাশে 'আমারে' মর্ম্ম না জানি॥

আদিতে আমি গো ছিলাম এক।
এবে স্বেচ্ছাবশে হ'নু অনেক॥
নিজ মায়া যোগে জড় হইয়া।
ক্রিয়াশক্তিহীন থাকি পড়িয়া॥
শক্তি বিদ্যমান কিন্তু তাহাতে।
চিদভাবে নারে ক্রিয়া করিতে॥

করণ মাত্র কর্ত্তা কভু নয় ।
জড়ে কর্ত্তাজ্ঞানে 'বিবর্ত্ত' হয় ॥
যদিও সে আমি, আমি সে নয় ।
আমার স্বরূপ চৈতন্য হয় ॥
আমার অস্তিত্ব জানাতে ভবে ।
শিরে শিখা রাখে ভকত সবে ॥
সকলের 'আমি' আমিসে হই ।
অধিষ্ঠিত সর্ব্ব ঘটেতে রই ॥
যেমনি আকাশ সর্ব্বত্র থাকে ।
তেমনি জানিবে সর্ব্বে আমাকে ॥
যে যাহা করিছে আমি সে করি ।
ফলাশা বর্জ্জিতে তাই প্রচারি ॥

কলে জল পড়ে ভবনে ভবনে ।
কলে পাখা চলে সদনে সদনে ॥
কলে সম ভাবে কত কি করে ।
প্রতি কলে ভিন্ন শক্তি কি ধরে ?
শক্তি-কেন্দ্র এক, তথা হইতে ।
ক্রিয়া শক্তি আসে যত কলেতে ॥
কিন্তু কেন্দ্র জড়, মানুষ বিনা ।
কখনো কোথাও ক্রিয়া করে না ॥
দেহে শক্তি আছে কিন্তু সে নারে ।
চৈতন্য ভিন্ন কিছু করিবারে ॥

মনেকর আমি অনন্ত মনে ।
দাবা খেলা রত আছি এখানে ॥
এমন সময়ে আমার পাশে ।
কোন বন্ধু আসি' হাসিয়া বসে ॥
দেহে কাণ, কাণে শকতি ছিল ।
'আমা' বিনা কাণ তা' না শুনিল ॥

সেই কালে 'আমি' ছিনু মগনে ।
কি চালে কি হয় চিন্তিত মনে ॥
কাণ তাই ক্রিয়া না করে তার ।
এই সে স্বরূপ মম বিচার ॥

দেহ জীর্ণ হয় বলী দুর্ব্বল ।
আমি সদা মম হৃষ্ট সবল ॥
যখন যে যন্ত্রে জাগ্রত থাকি ।
সেই করে ক্রিয়া অন্যে পারে কি ?
জাগ্রত চৈতন্য সে আমি হই ।
দেহে মোর বাস আমি সে নই ॥
বাস জীর্ণ হ'লে বাস নূতন ।
সবে যথা পরে আমি তেমন ॥
মৃত্যু মোর নাই সে বাস ত্যাগ ।
শোক নাহি করে যে মহাভাগ ॥

আনন্দ আমার স্বরূপ হই ।
আনন্দই খুঁজি ভুবন মই ॥
কোথা মিষ্ট খেয়ে আনন্দ পাই ।
কোথা কটু তিক্তে সে সুখ পাই ॥
যা ই কেন করি খা-ই কেন খাই ।
তার মধ্য দিয়া আনন্দ চাই ॥
করা কিম্বা খাওয়া উদ্দেশ্য নয় ।
সে সাধন, সাধ্য আনন্দ হয় ॥

জগতের জীব আনন্দ চায় ।
বহুমতে চেষ্টা করে সে হায় !
কিন্তু সে প্রয়াস বাহিরে করে ।
আমার সন্ধান পাইতে নারে ॥
এই পায় সুখ এই হারায় ।
খিন্ন অবসন্ন হ'য়ে বেড়ায় ॥

'বুড়ি' ছুঁতে নারে, 'চোর' সে থাকে।
আমারে ছুঁইলে ডুবিত সুখে॥

জানে না আনন্দ আমা বিহনে।
কোথাও নাই এ তিন ভুবনে॥
সৎচিৎ আনন্দ আমার রূপ।
তারি অংশকণা জীব স্বরূপ॥
বহ্নিকুণ্ড হ'তে স্ফুলিঙ্গ যথা।
আমা হ'তে জীব জানিবে তথা॥
দিবাকর, তার কর যেমন।
আমি আর জীব জান তেমন॥

জীব মোর প্রিয়, নিত্য কিঙ্কর।
জীবে মোর লীলা করে নির্ভর॥
খেলা ভালবাসি, খেলি কোথায়।
আমি অদ্বিতীয় একাকী হায়!
তাই যেন ঘটে আকাশ ঢাকি'।
মায়ার একাংশ আবরি' রাখি॥
সেই হয় বিশ্ব, তাহার সনে।
খেলা ধূলা করি আপন মনে॥
মায়া মোর শক্তি সে মোর দাসী।
ক্রীড়াহেতু তার ভিতরে পশি॥
বহিরঙ্গা শক্তি সে মায়া হয়।
যা হ'তে ত্রিগুণে জগৎ রয়॥

ভব-যন্ত্রে 'টানা' 'পোড়েন, আমি।
ওতপ্রোত ভাবে বিশ্বই আমি॥

আমিই খেলি গো আমার সনে।
জীব খেলি সে মোরি প্রয়োজনে॥
আমা সহ খেলা ভুলিলে দুঃখ।
আমা-মনে রাখ, পাইবে সুখ॥

আমি ক্ষুধা আমি অন্ন ও জল।
আমি বহ্নি বারি আমি সকল॥
আমি ব্যাধি, বৈদ্য হই গো আমি।
যা কিছু যেখানে সকলি আমি॥
এই আমি তত্ত্ব বুঝিয়া প্রাণে।
সদা থাক সবে সানন্দ মনে॥
কাহারে না ভাব পৃথক পর।
সবাতে নেহার মোরে সত্বর॥

এই দেহরথে আমি সারথি।
মায়া সহ মায়া-সমরে মাতি॥
আমারে না ধরি' যতই বল।
কুরু-বল সম সব চপল॥
আমারে ধরিলে বল না থাকে।
অজয়-পত্র লক্ষ্মী দেন তাহাকে॥
আমি দীনবন্ধু, আমি অমৃত।
মোরে ধর পাবে অনন্ত হিত॥
'সত্য' কহে তুমি ধরা না দিলে।
কার সাধ্য ধরে মায়ারে ঠেলে॥
ওহে ও কালীয়-দমন হরে!
মায়া-পারে দাসে লও সত্বরে॥

শ্রীসত্যচরণ চন্দ্র।

শ্রীল নরোত্তম দাস

(২)

এস্থান হইতে বিদায় লইয়া নরোত্তম নীলাচলে গেলেন। প্রভু যে পথে যে যে লীলা করিতে করিতে নীলাচলে গমন করিয়াছিলেন, তিনিও সেই পথ ধরিয়া সেই সেই স্থানগুলি দেখিতে দেখিতে চলিলেন। সচল জগন্নাথ শ্রীগৌর-চন্দ্রের বিরহে নীলাচল আঁধার। গোপীনাথাচার্য্য, শিখি মাহাতি, কানাই খুটিয়া, বাণীনাথ প্রভৃতি প্রভু-পার্ষদগণ তখনও জীবিত আছেন। তাঁহারা সকলেই নরো-ত্তমকে দেখিয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন। এক কথায় ভক্তগণ সকলে যেন শ্রীগৌরবিরহে জীবন্মৃত হইয়া ছিলেন, ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীমূর্ত্তি দর্শনে সকলেই যেন নবজীবন লাভ করিলেন। নীলাচলস্থ ভক্তবৃন্দের সহিত দেখা করিয়া তিনি শ্যামানন্দের সহিত মিলিত হইলেন। শ্যামানন্দের সহিত সাক্ষাতের পর তিনি গৌড়দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

গৌড়ভূমিতে আসিয়া শ্রীখণ্ড গ্রামে নরহরি সরকার ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, সেখানে সরকার ঠাকুরের স্থাপিত শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার যুগলমূর্ত্তি দেখিলেন। তথা হইতে জাজিগ্রামে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর গৃহে গেলেন। অতঃপর কেশব ভারতীর স্থান কাটোয়ায় গিয়া দাস গদাধরের স্থাপিত শ্রীগৌ-রাঙ্গ মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। তাহার পর নিত্যানন্দ-জন্মভূমি একচক্রা গ্রাম দর্শন করিয়া তিনি স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিলেন।

"ঠাকুর মহাশয় শ্রীখণ্ডে যখন শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার যুগলমূর্ত্তি দেখেন, তখনি তাঁহার ঐরূপ যুগল মূর্ত্তি স্থাপন করিতে প্রবল বাসনা হয়। নরোত্তম বিলাস-গ্রন্থকার বলেন যে, ঠাকুর মহাশয় তাঁহার কোন এক গৃহস্থ প্রজার গোলার মধ্যে এইরূপ মূর্ত্তি আছে এই স্বপ্ন দেখিয়া তিনি বহুতর লোক সমভি-ব্যাহারে যাইয়া গোলা হইতে যুগল বিগ্রহ বাহির করেন কিন্তু প্রেমবিলাসকার বলেন, তিনি কারিকর আনিয়া অষ্টধাতু দ্বারা সেই মূর্ত্তি প্রস্তুত করেন। যাহার যে কাহিনী বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় তিনি তাহাই করিবেন। আমরা শেষেরটিই বিশ্বাস করি। কারণ ঠাকুর মহাশয় যদি গোলার মধ্যে বিগ্রহ পাইতেন, তবে তাঁহাকে ঢোল বাজাইয়া লোক সমারোহ করিয়া আনিতেন না। তিনি গোপ-নেই আনিতেন, জাঁক জমক ইত্যাদি তিনি কিছুমাত্র জানিতেন না। সে যাহা

হউক, সেই সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের একটী মূর্ত্তিও প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, এই ঠাকুরের নাম "বল্লভীকান্ত"। (শ্রীনরোত্তম চরিত্র ৭৮ পৃষ্ঠা)

ঠাকুর মহাশয় শ্রীগৌরাঙ্গের জন্ম দিবস ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিলেন। তিনি রাজার পুত্র, বৃদ্ধ রাজা কৃষ্ণানন্দ পুত্রের এই কার্য্যে তাঁহার ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। এতদুপলক্ষে যে সমারোহ জনক উৎসব হইয়াছিল তাহাতে তাৎকালিক সমস্ত বৈষ্ণবমণ্ডলী আহূত হন। এ ঘটনাটি বৈষ্ণব সাহিত্যের অনেক পুস্তকেই বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই উৎসব অতীত ইতিহাসের দুর্নিরীক্ষ্য ও অচিহ্নিত রাজ্যের একটি পথ প্রদর্শক আলোকস্তম্ভস্বরূপ। ইহার প্রভাবে আমরা সমাগত অসংখ্য বৈষ্ণবের মধ্যে পরিচিত কয়েকজন শ্রেষ্ঠ লেখককে অনুসরণ করিতে পারি। ইহারা ছায়ার ন্যায় ত্বরিত গতিতে আমাদের দৃষ্টি হইতে অপসৃত হইলেও সেই ক্ষণিক সাক্ষাৎকারের সুযোগ পাইয়া আমরা তাঁহাদের উত্তরীয় বস্ত্রে ১৫০৩ শক অঙ্কিত করিয়া দিয়াছি। এই উৎসব উপলক্ষে অনেক বৈষ্ণব লেখকের সময় নিরূপিত হইয়াছে।—"—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৩৬৭ পৃষ্ঠা।

ঠাকুর মহাশয় সর্ব্বসমেত ছয়টী শ্রীবিগ্রহ স্থাপিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম—"গৌরাঙ্গ, বল্লভীকান্ত, শ্রীব্রজমোহন। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধাকান্ত, শ্রীরাধারমণ॥" কথিত আছে যে, ঠাকুর মহাশয় এই সময়ে এরূপ মধুর ভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন যে, তাঁহার কীর্ত্তন শ্রবণের জন্য গণসহ শ্রীচৈতন্য আবির্ভূত হন। তাঁহার সংকীর্ত্তন সময়ের ছবি স্তবামৃত লহরীতে এইরূপ বর্ণিত আছে, যথাঃ—

"সংকীর্ত্তনানন্দজমন্দহাস্যাদন্তদ্যুতিদ্যোতিত দিঙ্মুখায়।
স্বেদাশ্রু ধারাস্নপিতায় তস্মৈ নমো নমঃ শ্রীল নরোত্তমায়॥

তাঁহার দ্বারা নবভাবে "গড়ের হাটী" সুরের সৃষ্টি হয়।

উৎসব অন্তে নরোত্তমের জ্যেষ্ঠতাত পুত্র এবং মন্ত্রশিষ্য সন্তোষদত্ত সূত্র-বস্ত্র, পট্টবস্ত্র, থালা, বাটী, ঝারী, তাম্বুলের বাটা, স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা এবং নানাবিধ মিষ্টান্ন লইয়া যাহার যেমন আবশ্যক, তাঁহাকে তদ্রূপ ভাবে প্রদান করিয়া বিদায় করিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ ঠাকুর মহাশয়ের যশ বাড়িয়া গিয়াছে। ইহাতে একদল লোক তাঁহার শত্রু হইল। আবার যখন তিনি রামকৃষ্ণ ও হরিরামকে মন্ত্র দিলেন তখন মহা গণ্ডগোলই উপস্থিত হইল।

ইহারা দুই ভ্রাতা পরম পণ্ডিত; বাসস্থান গয়েশপুরে, তাঁহাদের পিতা শিবা-

নন্দ আচার্য্য দেশবিখ্যাত ব্যক্তি। তিনি ধনবান এবং ভগবতীর উপাসক ছিলেন। রামকৃষ্ণ ও হরিরাম দুর্গোৎসবের জন্য পদ্মা পারে ছাগাদি ক্রয় করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা যখন খেতুরির ঘাটে পৌছিলেন তখন ঠাকুর মহাশয় রামচন্দ্রের হস্তধারণ করিয়া স্নান করিতে আসিতেছেন, তাঁহাদের মনোহররূপ দর্শন ও শাস্ত্রালাপ শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া জ্যেষ্ঠ হরিরাম রামচন্দ্রের এবং কনিষ্ঠ রামকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। ইহাতে তাঁহাদের পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে যথেষ্ঠ ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু অবশেষে তিনি গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সহ তাঁহাদিগের নিকট বিচারে পরাস্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে শিবানন্দ ক্রুদ্ধ হইয়া মিথিলার দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত মুরারিকে আনিলেন। আবার বিচার হইল, তাহাতে দিগ্বিজয়ীরও পরাজয় হইল। যথা নরোত্তম বিলাসে—

"পরাভব হইয়া দিগ্বিজয়ী সবে কয়।
বৈষ্ণব মহিমা কহি মোর সাধ্য নয়॥
এত কহি দ্রব্য সব কৈলা বিতরণ।
লজ্জা হেতু দেশে পুনঃ না কৈলা গমন॥
ভিক্ষুধর্ম্ম আশ্রয় করিল সেই ক্ষণে।
"মুরারেস্তৃতীয়ঃ পন্থা" কহে সর্ব্বজনে॥"

ইহার পর গাম্ভিলা গ্রামের মহাপণ্ডিত গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর মহাশয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। ইহাতে দেশে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। ব্রাহ্মণগণ মহাক্রুদ্ধ হইলেন। যথা নরোত্তম বিলাসে :—

"নরসিংহ নামে রাজা রহে দূরদেশে।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বহু রহে তাঁর পাশে॥
ক্রোধে বিপ্র রাজার প্রতি কহে বার বার।
ধর্ম্মলোপ হইল কেহ না করে বিচার॥
কৃষ্ণানন্দ দত্তপুত্র নরোত্তম দাস।
লইয়া বৈষ্ণব মত কৈল সর্ব্বনাশ॥"

অতঃপর তাহারা রাজাকে সঙ্গে লইয়া নরোত্তমকে বিচারে পরাস্ত করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তাঁহারা ছদ্মবেশী গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী ও রামচন্দ্র

কবিরাজ কর্ত্তৃক বিচারে পরাস্ত হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। সেই সব পণ্ডিতগণ যে রাশীকৃত সংস্কৃত গ্রন্থ বহুসংখ্যক বাহকের স্কন্ধে চাপাইয়া তর্কযুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তদ্দারা তাঁহারা ব্রাহ্মণগণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপালন করিতে সমর্থ হন নাই।" বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৩৭১ পৃষ্ঠা।

রামচন্দ্র কবিরাজের সহিত ঠাকুর মহাশয়ের ঘনিষ্ঠতা নিবিড় হইতে নিবিড়-তর হইয়াছিল। উভয়ে একত্রে থাকিয়া ভজনানন্দে দিন কাটাইতেছিলেন। এই সময় তিনি খেতুরি হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে নির্জ্জনে ভজনালয় বা ভজন-খুলি প্রস্তুত করাইয়া বাস করেন। এই স্থান এইক্ষণে ভজনটুলি নামে প্রসিদ্ধ।

ঠাকুর মহাশয় বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সেগুলির নাম—"প্রেম-ভক্তি-চন্দ্রিকা, সিদ্ধভক্তি-চন্দ্রিকা, রস-চন্দ্রিকা, সদ্ভাব-চন্দ্রিকা, স্মরণ-মঙ্গল, কুঞ্জ-বর্ণন, রাগমালা, সাধন-ভক্তি-চন্দ্রিকা, সাধ্য-প্রেম-চন্দ্রিকা, চমৎকার-চন্দ্রিকা সূর্য্যমণি, চন্দ্রমণি, প্রেমভক্তি চিন্তামণি, গুরুশিষ্য সংবাদ ও উপাসনাপটল।" কিন্তু প্রার্থনা নামক গ্রন্থের জন্যই নরোত্তম সাহিত্য জগতে ও বৈষ্ণব জগতে বিশেষ প্রসিদ্ধ। ফলতঃ ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনার ন্যায়, প্রাণস্পর্শী, হৃদয় দ্রব-কারী, চিত্ত উন্নতকারী প্রার্থনা জগতের কোন ভাষায় ও কোন ধর্ম্মে আছে কি না সন্দেহ।

আবার নরোত্তমের "হাটপত্তন" নামক ক্ষুদ্র প্রবন্ধই কি সুন্দর, কি ভাব শুদ্ধ, কি মনোহারী! যেন সমস্ত বৈষ্ণবশাস্ত্রের সারাংশ নিষ্কাসিত করিয়া ঐ "হাটপত্তনের" পত্তন হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত হাটপত্তনের বহু অনুকরণ হইয়াছে। আমরা অনেক সাধু বৈষ্ণবের মুখে শুনিয়াছি, ঐ হাটপত্তন পাঠ করিলে সমস্ত চৈতন্য ভাগবত ও চৈতন্য চরিতামৃত পাঠের ফল লাভ হয়। নরোত্তম দাস এক অসাধারণ ক্ষমতাবান্ পুরুষ ছিলেন। মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর ঈদৃশ অসাধারণ ব্যক্তি বঙ্গভূমে আর জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। এই জন্য ইঁহাকে অনেকে মহাপ্রভুর দ্বিতীয় অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন। রামচন্দ্র কবিরাজ এই নরোত্তমের হৃদয় বন্ধু ছিলেন। তত্ত্বনিধি মহাশয় বলেন, উভয়ে এত প্রীতি ছিল যে, স্বামী স্ত্রী বা কোন যুবক যুবতীর মধ্যেও এতাদৃশ প্রণয় পরিদৃষ্ট হয় না;—"গৌরপাদ তরঙ্গিণী ১০৭ পৃষ্ঠা

একটী প্রাচীন পদে তাঁহাকে এইরূপে বন্দনা করা হইয়াছে। যথা—

নরে নরোত্তম ধন্ত, গ্রন্থকার-অগ্রগণ্য; অগণ্য পুণ্যের একাধার।
সাধনে সাধক শ্রেষ্ঠ, দয়াতে অ'ত গরিষ্ঠ, ইষ্ট-প্রতি ভক্তি চমৎকার॥
চন্দ্রিকা পঞ্চমসার,* তিন মণি † সারাৎসার, গুরুশিষ্য সংবাদ পটল ‡।
ত্রিভুবনে অনুপাম, "প্রার্থনা" গ্রন্থের নাম, "হাটপত্তন" মধুর কেবল॥
রচিল অসংখ্য পদ, হৈয়া ভাবে গদ গদ, কবিত্বের সম্পদ সে সব।
যেবা শুনে যেবা পড়ে, যেবা তাহা গান করে, সে-ই জানে পদের গৌরব॥
সদা সাধু মুখে শুনি, শ্রীচৈতন্ত আসি পুনি, নরোত্তমরূপে জনমিলা।
নরোত্তম গুণাধার, বল্লভে করহ পার, জলেতে ভাস'ও পুনঃ শিলা॥"

এদিকে বৃন্দাবনে প্রভু লোকনাথ, ভূগর্ভ, গোপালভট্ট প্রভৃতি গোস্বামিগণ দেহ রক্ষা করিয়াছেন। শ্রীজীবও অতি বৃদ্ধ হইয়াছেন। শ্রীনিবাস আচার্য্যের বাসনা একবার তাঁহাকে দর্শন করিয়া আসিবেন। কিন্তু তিনিও বৃদ্ধ হইয়াছেন, একাকী যাইতে পারেন না। কাজে কাজেই তাঁহার ইচ্ছামত রামচন্দ্র কবিরাজ-কেও তাঁহার সহিত যাইতে হইল।

রামচন্দ্রকে বিদায় দিয়া ঠাকুর মহাশয়ের অতি দুঃখে দিন কাটিতেছে। একাকী ভজনস্থলীতে বাস করেন। কাহারও সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করিতে পারেন না। রামকৃষ্ণ, গঙ্গানারায়ণ প্রভৃতি ভক্তগণ প্রতিদিন তাঁহাকে দূর হইতে দর্শন করিয়া যান। এদিকে শ্রীনিবাস ও রামচন্দ্র বৃন্দাবনে তিরোহিত হইয়াছেন। ঠাকুর মহাশয়কে একথা কেহই বলিতে সাহস করিলেন না। তিনিও কাহাকেও কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না। তবে অনুমানে সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছেন। যথা তাঁহার কৃত পদ,—"বিধি মোরে কি করিল, শ্রীনিবাস কোথা গেল, হৃদি মাঝে দিয়া দারুণ ব্যথা। গুণের রামচন্দ্র ছিলা সেহ সঙ্গ ছাড়ি গেলা, শুনিতে না পাই মুখের কথা॥ পুনঃ কি এমন হব, রামচন্দ্র সঙ্গ পাব, এজনম মিছা বহিগেল। যদি প্রাণ দেহে থাক, রামচন্দ্র বলি ডাক, তবে যদি যাও সেহ ভাল॥ স্বরূপ রূপ সনাতন, রঘুনাথ সকরুণ ভট্টযুগ দয়া কর মোরে। আচার্য্য শ্রীনিবাস, রামচন্দ্র তার দাস, পুনঃ নাকি

* প্রেম ভক্তি চন্দ্রিকা, সিদ্ধ প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা, সাধ্য প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা, সাধনভক্তি চন্দ্রিকা, চমৎকার চন্দ্রিকা এই পাঁচ।

† সূর্য্য মণি, চন্দ্র মণি, প্রেমভক্তি-চিন্তামণি, এই তিন।

‡ সম্পূর্ণ নাম "উপাসনা পটল"।

মিলিবে আমারে॥ না দেখিয়া তার মুখ, বিদরিয়া যায় বুক, বিষ শরে কুরঙ্গিণী যেন। আচলে রতন ছিল, কোন ছলে কেবা নিল, নরোত্তমের হেন দশা কেন?" ॥

কারুণ্য-রস-মথিত করিয়া তিনি আবার বলিতেছেন,— * " "আচার্য্য শ্রীশ্রীনিবাস, আছিনু যাঁহার পাশ, কথা শুনি জুড়াইত প্রাণ। তেঁহ মোরে ছাড়ি গেল, রামচন্দ্র না আইল, দুঃখে জিউ করে আন চান॥ যে মোর মনের ব্যথা, কাহারে কহিব কথা, এছার জীবনে নাহি আশ। অন্ন জল, বিষ খাই, মরিয়া নাহিক যাই, ধিক ধিক্ নরোত্তম দাস॥"

ভক্তগণের চক্ষে ঠাকুর মহাশয়ের এই দুঃখের জীবন নিতান্ত অসহ্য বোধ হইতেছে। গঙ্গানারায়ণ তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে—ঠাকুরকে তাঁহার গৃহে (গাম্ভিলায়) লইয়া গিয়া গঙ্গাস্নান করাইতে পারিলে তিনি অনেকটা স্থির হইতে পারিবেন। তখন গঙ্গানারায়ণ তাঁহার চরণ ধরিয়া বলিলেন, প্রভু! আপনার এ অবস্থায় আমরা কিরূপে জীবন ধারণ করিতে পারি? আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক গাম্ভীলায় চলুন সেখান হইতে গঙ্গা স্নান করিয়া আসিবেন। ঠাকুর মহাশয় তাঁহার কথায় সম্মত হইয়া গাম্ভীলা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে বুধুরি গ্রামে গোবিন্দ কবিরাজের বাড়ী। তিনি এবং তাঁহার পুত্র দিব্যসিংহ পরম সমাদরে ঠাকুর মহাশয়কে গৃহে লইয়া গেলেন। এস্থানে উপযোগী বোধে তাঁহার কৃত ঠাকুর মহাশয়ের বন্দনা পদটি দেওয়া গেল,—"জয় রে জয় রে জয়,ঠাকুর শ্রীনরোত্তম, প্রেমভকতি মহারাজ। যা কর মন্ত্রী, অভিন্ন কলেবর, রামচন্দ্র কবিরাজ॥ ধ্রু॥ প্রেম মুকুট মণি, ভূষণ ভাবাবলী, অঙ্গ হি অঙ্গ বিরাজ। নৃপ আসন, খেতুড় মহা বৈঠত, সঙ্গ হি ভকত সমাজ॥ সনাতনরূপ কৃত, গ্রন্থ ভাগবত, অনুদিন করত বিচার। রাধামাধব যুগল ভজন রস, পরমানন্দ সুখসার॥ শ্রীসংকীর্ত্তন বিষয় রসে উনমত, ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি মান। যোগদান ব্রত, আদি ভয়ে জগত, বেকত করম-গেয়ান॥ ভাগবত শাস্ত্রজন, যো দেই ভকতি ধন, তাক গৌরব করু আপ। সাংখ্য মীমাংসক, তর্কাদিক যত, কম্পিত দেখি পরতাপ॥ অভকত যেহ, দুরহি ভাগি রহু, নিয়ড়ে নাহি পরকাশ। দীন হীন জনে, দেয়ল ভকতি ধন, বঞ্চিত গোবিন্দ দাস॥

*এই পদে শ্রীনরোত্তম রাজা ও রামচন্দ্র মন্ত্রীরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। রাজার বল কি, না ব্রজের উজ্জ্বল রস, অর্থাৎ মধুর রস। ইহাদের শত্রুকে, না

যোগ যাগ, কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞান-কাণ্ড ইত্যাদি। প্রকৃত কথা, যাঁহারা যুগল রসে উন্মত্ত, তাঁহাদের নিকট পাপ, অপাপ ইত্যাদি অতিক্ষুদ্র কথা।" (নরোত্তম চরিত ১৪৩ পৃষ্ঠা)

পর দিবস প্রাতে ঠাকুর মহাশয় বুধুরি ত্যাগ করিয়া গাম্ভীলায় চলিয়া আসিলেন। সেখানে মহা মহোৎসব হইতে লাগিল। কিন্তু ইহার মধ্যে একটি দুর্ঘটনা ঘটিল। ঠাকুর মহাশয় চারি দিনের জ্বরে দেহত্যাগ করিলেন। অন্তিমকালে তিনি নীরব হইয়া ছিলেন। ইহাতে শত্রু পক্ষীয় ব্রাহ্মণগণ বিদ্রূপ করিয়া বলিতেছেন—"কিগো চক্রবর্ত্তী, তোমার গুরু যে বাক্‌রোধ হ'য়ে মারা গেলেন। ব্রাহ্মণকে শিষ্য করার যে পরিণাম এইরূপই হবে, তা আমরা আগে থেকেই জানতাম।"

গঙ্গানারায়ণ তখন অতি দুঃখে ঠাকুর মহাশয়ের চরণ তলে বসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, প্রভু ইহারা মর্ম্ম না জানিয়া নিন্দা করিতেছে ইহাদিগকে রক্ষা করুন। "গঙ্গানারায়ণের এ ব্যাকুল বচনে। নিজ দেহে মহাশয় আইলা সেই ক্ষণে॥ রাধা কৃষ্ণ চৈতন্য বলিয়া নরোত্তম। উঠিলেন চিতা হইতে তেজ সূর্য্য সম॥" (নরোত্তমবিলাস।) তখন সেই সমস্ত নিন্দাকারী ব্রাহ্মণগণ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।

তাহার পর কিছুদিন অতিবাহিত হইয়াছে। তিনি একাকী তাঁহার ভজন স্থানে থাকেন। আর প্রার্থনা করেন হে শ্রীগৌরাঙ্গ, আমি অতি দুর্ব্বল হইয়াছি, আমার দ্বারা তোমার ভজনা চলে না। যে সমস্ত সাধু সঙ্গ বলে তোমার ভজনা করিতাম তাঁহারা তিরোহিত হইয়াছেন, এখন আমাকেও লও।

এক দিবস ঠাকুর মহাশয় বলিলেন যে, তিনি গাম্ভীলায় যাইবেন। আর ঠাকুর আঙ্গিনায় গমন করিয়া ঠাকুরদের নিকট বিদায় লইয়া তিনি ১৫০৯ শকে গাম্ভীলায় চলিয়া আসিলেন। সেখানে,—"গঙ্গাস্নান করিয়া বসিলা গঙ্গাকূলে॥ আজ্ঞা কৈলা রামকৃষ্ণ গঙ্গানারায়ণে। মোর অঙ্গ মার্জ্জন করহ দুইজনে॥ দোঁহে কিবা মার্জ্জন করিব, পরশিতে। দুগ্ধপ্রায় মিশাইলা গঙ্গার জলেতে॥ দেখিতে দেখিতে শীঘ্র হইল অন্তর্ধান। অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয় ইহা বুঝিব কি আন॥" (নরোত্তম বিলাস।)

"আমাদের আর অধিক কিছু বলিবার নাই। ঠাকুর মহাশয়ের বংশীয় আর কেহ নাই। একটী বিধবা স্ত্রীলোক ছিলেন, তিনিও কয়েক বৎসর হইল সংগোপন হইয়াছেন। কার্ত্তিকী কৃষ্ণা পঞ্চমীতে এখন খেতুরিতে মেলা হইয়া

থাকে। বহুতর বৈষ্ণব সেখানে যাইয়া থাকেন। ঠাকুর মহাশয়ের পরিবার অতি বৃহৎ। রাজসাহী, মালদহ, বহরমপুর, রঙ্গপুর, পাবনা প্রভৃতি স্থান ঠাকুর মহাশয় উদ্ধার করিয়াছিলেন। অধিক কি মনিপুরের রাজারা তাঁহার পরিবার। ইঁহারা পূর্ব্বে যাহাই থাকুন, ঠাকুর মহাশয়ের কৃপায় এখন শ্রীগৌরাঙ্গ সে দেশের উপাস্য দেবতা, আর ঠাকুর মহাশয়ের নাম করিলেই সকলে প্রণাম করেন। খেতুরির মেলাতে এখনও বিশ পঁচিশ সহস্র লোক সমবেত হইয়া ঠাকুর মহাশয়ের গুণ কীর্ত্তন করেন। হে পাঠক! একবার সেখানে যাইয়া স্থানটী দেখিয়া আসিবেন, আর যদি পারেন তবে সেই স্থানের ধূলা অঙ্গে মাখিবেন। এই তিনশত বৎসর ধরিয়া সহস্র সহস্র লোক, প্রতি বৎসর খেতুরি যাইয়া "নরুর" গুণ কীর্ত্তন করিতেছেন। নরু রাজকুমার থাকিলে কে তাহা করিত?

রামচন্দ্র ও শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর সঙ্গোপনের পর, ঠাকুর মহাশয় অধিক কাল জীবিত ছিলেন না। তাহার প্রমাণ আচার্য্য প্রভুর সাক্ষাৎশিষ্য ও উপরিউক্ত প্রভুগণের পার্ষদ বল্লভদাসের পদে প্রকাশ। যথা:—

প্রভু আচার্য্য প্রভু শ্রীঠাকুর মহাশয়।
রামচন্দ্র কবিরাজ প্রেম রসময়॥
এসব ঠাকুর সঙ্গে পারিষদগণ।
উজ্জ্বল ভকতি কথা করিনু শ্রবণ॥
বৈষ্ণবের তুলা মেলা নানাবিধ দান।
পরিপূর্ণ প্রেম সদা কৃষ্ণগুণ গান॥
এক কালে কোথা গেলা না পাই দেখিতে।
দেখিবার দায় রহু না পাই শুনিতে॥
উচ্ছিষ্টের কুকুর মুই আছিনু সেখানে।
যখন যে কৈলা কাজ সব পড়ে মনে॥
শুনিতে স্বপন হেন কহিলে সে কথা।
ভিটা সোঙরিয়া কান্দে কুকুর এমতি আছে কোথা॥
বল্লভ দাসের হিয়ায় শেল রহিগেল।
এ জনমে হেন বুঝি বাহির না ভেল॥

—শ্রীনরোত্তম চরিত ১৫৫-৫৬ পৃষ্ঠা।

ঠাকুর মহাশয় মাধুর্য্য-রস অবলম্বন করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি বলেন—

"সখীনাং সাঙ্গিনীরূপামাত্মানং বাসনাময়ীম্। আজ্ঞা সেবা পরাং তত্তদ্রূপালঙ্কার ভূষিতাম্॥ টীকানুযায়ী অনুবাদ—শ্রীমতী ললিতা রূপ মঞ্জরী প্রভৃতির আজ্ঞায় শ্রীরাধামাধবের সেবাপরা ও তত্তদ্রূপালঙ্কার ভূষিতা ('শ্রীকৃষ্ণ মনোহররূপে ও শ্রীমতী রাধিকার নির্ম্মাল্য বসন ভূষণে ভূষিতা) সখীদিগের সঙ্গিনীরূপে আপনার চিন্তাময়ী মূর্ত্তি ধ্যান করিবে।"—

আমরা অতি সঙ্ক্ষেপে ঠাকুর মহাশয়ের জীবনী আলোচনা করিয়া গেলাম। প্রেম বিলাস, শ্রীনিবাস চরিত, ভক্তি রত্নাকর, নরোত্তম বিলাস, নরোত্তম চরিত প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

আমরা তাঁহার সম্বন্ধে কয়েকটি প্রাচীন বন্দনা পদ উদ্ধৃত করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব।—

ও মোর করুণাময়, শ্রীঠাকুর মহাশয়, নরোত্তম প্রেমের মূরতি।
কিবা সে কোমল তনু, শিরীষ কুসুম জনু, জিনিয়া কনক দেহ জ্যোতি॥
অল্প বয়স তায়, কোন সুখ নাহি ভায়, গোরা গুণ শুনি সদা ঝুরে।
রাজ্য ভোগ তেয়াগিয়া, অতি লালায়িত হৈয়া, গমন করিলা ব্রজপুরে॥
প্রবেশিয়া বৃন্দাবনে, পরম আনন্দ মনে, লোকনাথে আত্ম সমর্পিল।
কৃপাকরি লোকনাথ, করিলেন আত্মসাথ, রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দীক্ষা দিল॥
নরোত্তম চেষ্টা দেখি, বৃন্দাবনে সবে সুখী, প্রাণের সমান করে স্নেহ।
শ্রীনিবাসাচার্য্য সনে, যে মর্ম্ম তা কেবা জানে, প্রাণ এক ভিন্ন মাত্র দেহ॥
শ্রীরাধা বিনোদ দেখি, সদায় জুড়ায় আঁখি, প্রভু লোকনাথ সেবারত।
ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়নে, মহানন্দ বাঢ়ে মনে, পূর্ণ হইল অভিলাষ যত॥
প্রভু অনুমতি মতে, শ্রীব্রজমণ্ডল হৈতে, শ্রীগৌড় মণ্ডলে প্রবেশিলা।
প্রভু অনুগ্রহ বলে, নবদ্বীপ নীলাচলে, ভক্তগৃহে ভ্রমণ করিলা॥
কি বা সে মধুর রীতি, খেতুরী গ্রামেতে স্থিতি, সেবে গৌর শ্রীরাধারমণে।
শ্রীবল্লভীকান্ত নাম, রাধাকান্ত রস ধাম, রাধাকৃষ্ণ শ্রীব্রজমোহনে॥
এ ছয় বিগ্রহ যেন, সাক্ষাত বিহরে হেন, শোভা দেখি কেবা নাহি ভুলে।
প্রিয় রামচন্দ্র সঙ্গে নরোত্তম মহারঙ্গে, ভাসে প্রেমরসের হিল্লোলে॥
নরোত্তম গুণ যত, কে তাহা কহিবে কত, প্রেমবৃষ্টি যার সংকীর্ত্তনে।
শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ, গণ সহ গৌরচন্দ্র, নাচয়ে দেখিল ভাগ্যবানে॥
গৌরগণ প্রিয় অতি, নরোত্তম মহামতি, বৈষ্ণব সেবনে যার ধ্বনি।
কি অদ্ভুত দয়াবান, কারে বা না করে দান, নির্ম্মল ভকতি চিন্তামণি॥

পাষণ্ডী অসুরগণে, মাতাইলা গোরাগুণে, বিহ্বল হইয়া প্রেমাবেশে।
অলৌকিক ক্রিয়া যার, হেন কি হইবে আর, সে না যশ ঘোষে দেশে দেশে॥
কহে নরহরি হীন, হবে কি এমন দিন, নরোত্তম পদে বিকাইব।
সঘনে দুবাহু তুলি, প্রভু নরোত্তম বলি, কাঁদিয়া ধুলায় লোটাইব॥

(২)

ভাল ভাল প্রভু নরোত্তম গুণধাম। জগজনে লওয়াইলা রাধাকৃষ্ণ নাম॥ ধ্রু॥
চৌথরি মালতী মালা, হিয়া ভালে শোভে রে, মধুর কথাটী কহে ভালো।
এমন গুণের প্রভু, আর না দেখিব রে, জগৎ করিয়াছিল আলো॥
যার গুণে পশুপাখী, ঝুরিয়া ঝুরিয়া কাঁদে, কুলে কাঁদে কুলের বৌহারি।
যাহার শুনিয়া রীত, সুরনর চমকিত, তাহে আমি কি বলিতে পারি॥
সর্ব্বক্ষণ করিত দয়া, অতি সকরুণ হৈয়া, মোরে প্রভু আপন বলিল।
মুঞি পাপী দুরমতি, সে পদে নহিল রতি, মিছাই জনম গোঙাইল॥

(৩)

ভুবন মঙ্গল গোরা, গুণে লোকনাথ ভোরা, সুখে নরোত্তমে দয়া করি।
রাধাকৃষ্ণ লীলা গুণ, নিজ শক্তি আরোপণ, পিয়াইল গোরাঙ্গ মাধুরী॥
অনুক্ষণ গোরা রঙ্গে, বিলসে বৈষ্ণব সঙ্গে, প্রিয় রামচন্দ্র সঙ্গী লৈয়া।
শ্রীমদ্ভাগবতাদি, গ্রন্থ গীত বিদ্যাপতি, নিজ গ্রন্থ গুণ আস্বাদিয়া॥
নরোত্তম দীনবন্ধু, জীবেরে করুণাসিন্ধু, রূপে গুণে রসের মূরতি।
রাধাকান্ত না দেখিয়া, সদাই বিদরে হিয়া, কে বুঝিবে ঐছন পিরীতি॥
মোর ঠাকুর মহাশয়, নরোত্তম দয়াময়, দন্তে তৃণ করোঁ নিবেদন।
বল্লভ ছাড়িয়া পাকে, আকুল হইয়া ডাকে, অহে নাথ লইনু শরণ॥

(৪)

নরোত্তম আরে মোর বারেক তোমারে পাঙ।
সে গুণ গাইয়া মুঞি মরিয়া না যাঙ॥ ধ্রু॥
সে ফোঁটা ঝলক মুখ দরশনে জ্যোতি।
ঈষৎ মধুর হাসি বিজুরির কাঁতি॥
ফুটিয়া রহিল শেল সেহ নহে ব্যথা।
মরমে মরম দুখে কি কহিব কথা॥
মো মেনে মরিয়া যাঙ সে গুণ ঝুরিয়া।
বল্লভদাসেরে লহ আপন করিয়া॥

শ্রীভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা।

মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ

(২)

ক্ষীরোদচন্দ্রের কথা ভাবিতে ভাবিতে আসিয়া বাড়ীতে পৌছিলাম। অন্যদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বাড়ী আসি কিন্তু আজ বাড়ী পৌছাইতে রাত্রি ৮॥টা বাজিল। কাজেই বিলম্বের জন্য বাড়ীতে কৈফিয়ৎ যে না দিতে হইল তাহা নহে। বলাবাহুল্য আমার কর্ম্মস্থলে বসিয়া সেইভাবনার উদ্রেক হইতে আরম্ভ করিয়া বাড়ী পৌছান পর্য্যন্ত যে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল আমি সবই খুলিয়া বলিলাম। এরূপ ভাবে বর্ণনা যে আমার আজ নূতন তাহা নহে, আমি বাহিরে যাহা যাহা করি, যে যে ঘটনা ঘটে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া অবসর মত তাহা সমস্তই বলিয়া থাকি। এ অভ্যাস আমার স্বর্গীয়া মাতাঠাকুরাণীর শিক্ষানুসারেই হইয়াছে। তিনি বলিতেন "সৎ হউক অসৎ হউক যে কার্য্যই কর না কেন, বন্ধু বা আত্মীয়গণের নিকট সরলভাবে সকল কথা প্রকাশ করিলে যদি তোমার কোথাও কিছু দুর্ব্বলতার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা তাঁহারা সংশোধন করিয়া দিবেন।" আমি তাই সংসারে যাহাদের লইয়া আছি, তাহাদের অজ্ঞাতসারে কিছু করিলে যখনই সুবিধা হয় সমস্ত তাহাদিগকে বলিয়া থাকি।

যাক্, রাত্রে সামান্য কিছু আহার করিয়া আমি আমার শয়নাগারে প্রবেশ করিলাম। বলা বাহুল্য আমার শয়নাগার অন্যের পক্ষে কারাগার সদৃশ, কেন না, আমার সেখানে বৈদ্যুতিক আলো নাই, পাখা নাই, খাট, গদি বা ছোট বড় বালিস তাকিয়ার ছড়াছড়ি মোটেই নাই। একখানি মাদুরীর উপর সামান্য রকমের একটু বিছানা এই হইল শীতের সময়ের ব্যবস্থা, আর গরমের সময় কেবলমাত্র একটি মাদুরী ও একটি বালিস। শীতের সময় গায়দিবার জন্য আর পৃথক কিছু আবশ্যক হয় না, আমার যে গায়ের কাপড় আছে তাহাতেই চলিয়া যায়। তবে একটা ব্যবস্থা আমার ঘরে আছে, যা "সভ্য" সম্প্রদায় বা বাবুক্লাসের লোকে মোটেই পছন্দ করেন না। আমার শয়নাগারে ৩টী আলমারী ও ২টী র‍্যাকে আমার স্বোপার্জ্জিত কতকগুলি পুস্তক, একটী মাটীর প্রদীপ ও দোয়াত,কলম,কাগজ আর একটী বাদ্যযন্ত্র হারমোনিয়াম আছে। মোট কথা আমার যা কিছু সবই এই একটী ঘরে আছে। পাঠক মহাশয়েরা কেহ যদি আমার পাঠাগার, শয়নাগার, বৈঠকখানা, প্রভৃতি পৃথক পৃথক দেখিবার আশা করিয়া থাকেন তবে এ যাত্রা তাঁহার যে খুব একটা মস্তবড় ভুল হইয়াছে তাহা তাঁহাকে স্বীকার না করিয়া আর উপায় নাই। আমার এই একটী ঘরেই শয়ন, পাঠ, গল্প, গান, বাজনা সমস্ত হইয়া থাকে।

রাত্রে ভাল ঘুম হইল না, কেবল ক্ষীরোদচন্দ্রের কথাই মনে হইতে লাগিল। কাল ক্ষীরোদের বাড়ী যাইয়া কি শুনিব তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলাম। তারপর আর একটা কথা—ক্ষীরোদ গঙ্গায় ডুবিয়া মরিয়াছে শুনিয়া খুব বড় একটা শোকোচ্ছ্বাস লিখিয়া খবরের কাগজে ছাপাইয়া ছিলাম, সেটাযে বিশেষ ভুল হইয়াছে—মহাপুরুষের নিকট সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া তাহারও একটা সংশোধন করিয়া আবার কিছু লিখিতে হইবে এভাবনাও মাথায় আসিতে ছিল। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে একটু তন্দ্রা আসিয়াছে, কতক্ষণ তন্দ্রাবিষ্ট ছিলাম জানি না হঠাৎ আমার স্ত্রীর কোমল করস্পর্শে চমকিয়া উঠিলাম। উঠিতেই স্ত্রী বলিলেন—"কি রকম, সারারাতটাই প'ড়েছ না কি? আলোটা নিবিয়ে দেবারও কি অবসর হয়নি? বেলা সাতটা বাজে এখনও ঘরে আলোজ্বলছে? এখনও ঘুমোচ্ছো যে, আজকি বেরুবে না?" সাতটা বাজে শুনে তাড়াতাড়ি উঠে জানালা খুলিয়া আলো নিবাইয়া স্ত্রীকে বলিলাম "বেরুব বৈ কি, তবে অন্য দিনের মত ৯টায় নয় ১১॥টায় যাব, তুমি এক কাজকর, আজ তো একাদশী, আর রান্নাকরার দরকার নেই, কিছু ফল ও মিষ্টান্ন ঠাকুরের ভোগলাগাও আমি সেই প্রসাদ পেয়েই আজ যাব। হ্যাঁ, একটা কথা, আজ কিন্তু রাত্রে আমার বাড়ী ফেরা হবে না। সেই যে কাল ক্ষীরোদের কথা বলছিলুম না? তাদের বাড়ী যেতে হবে, বুঝ্‌লে?—" স্ত্রী আমার কথাশুনে বল্লেন—"সে আমি কালথেকেই ঠিক্ ক'রে রেখেছি যে, তুমি আজ আর রাত্রে বাড়ী আস্‌বে না, কিন্তু খাবার কিছু নাহ'লে সমস্তদিন কিক'রে থাক্‌বে? শুধু ব'সে থাকাতোনয়, আফিসের খাটুনি আছে, তারপর ক্ষীরোদের ওখানে যাবে ২।৪ খানা গান কোন্ সেখানে না গাইতে হবে? তারপর তোমার তো গানের যে ব্যাপার, আরম্ভ কল্লেতো আর কিছু খেয়াল থাকে না? তুমি স্নানক'রে নিজের সন্ধ্যা পূজা সেরে নাও আমার তরকারি প্রায় রান্না হ'ল, দু'খানা রুটী করে দি খেয়ে যাও।" এই বলে ছেলেদের উঠিয়ে দিয়ে তিনি নীচে চলিয়া গেলেন আমিও ঠাকুরের নাম স্মরণ করিতে করিতে নীচে আসিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সারিতে লাগিলাম। স্নান আহ্নিক শেষ করিয়া আসিয়া দেখি একাদশীর ব্যবস্থাটা বড কম হয়নি। যা'হোক পেটভ'রয়া একাদশী করিয়া ক্ষীরোদচন্দ্রের ওখানে রাত্রে থাকিতে হইবে এবং কালও সকালে আসা হইবে না, ওখান হইতেই একেবারে আফিস করিয়া রাত্রে বাড়ী ফিরিব এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া যাত্রা করিলাম।

যথাসময়ে আফিসে আসিতে পারিনাই বলিয়া আমার উপরওয়ালা বিশেষ চিন্তিত হইয়াছিলেন, কারণ কাল আমার যে অবস্থা দেখিয়া তিনি ছুটি দিয়াছিলেন তাহাতে আমি যে খুব অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছি ইহাই তাঁহার ধারণা হইয়াছিল। আমাকে দেখিয়া বলিলেন "কি হে, এত দেরী কেন, কাল তাড়াতাড়ি কোন কথা জিজ্ঞাসাও ক'রতে পাল্লেম না। তোমার কি কোন অসুখ হ'য়েছিল নাকি? আমি সত্যকথা সব বলিলাম, তিনি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত শুনিয়া বিশেষ কিছু না বলিয়া এইমাত্র বলিলেন যে, "চাকুরী করিলেই কি সব নষ্ট হয়? এমন অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যে, চাকুরী করিয়া সংসার প্রতিপালন করিয়াও তিনি সাধন ভজনে যথেষ্ট উন্নত হইয়াছেন। ও সব কিছু নয়, মন নিয়ে হ'চ্ছে কার কারবার, তবে সংসারই কর আর উদাসীনই হও মোটকথা হ'চ্ছে অকপট হওয়া চাই। মনে এক মুখে এক হ'লে চল্‌বে না। অকপটভাবে ভগবৎ বিশ্বাস রাখিলে যেখানেই যা কর না তিনি ঠিক গুছাইয়া লইবেন।" আমি বলিলাম—"এই যে অকপট বিশ্বাসের কথা বলছেন এইতেইতো যত গোলমাল। সাধু গুরু শাস্ত্র সকলের মুখেই তো শুন্‌তে পাই ঐ এক অকপট বিশ্বাস। কিন্তু ঐ অকপট বিশ্বাস যে কি কর্‌লে হয় তাতো জানি না।" তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন:—"আচ্ছা এখন কাজ কর, অন্যদিন অবসর মত তোমার প্রশ্নের বিষয় আলোচনা করা যাইবে।"

আমি তাড়াতাড়ি বিশেষ জরুরী কাজগুলি সারিয়া ৪টার সময়ই ক্ষীরোদের ওখানে যাত্রা করিলাম। এইখানে ব'লয়া রাখি, ক্ষীরোদের বাড়ী কালকাতার বাহিরে বেহালায়। যখন সেখানে উপস্থিত হইলাম তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের সদর ঘরে আলো নাই দেখিয়া আমি একটু চিন্তিত হইলাম। মনে করিলাম, আজতো লোকজন বেশী থাকার কথা, কাল ক্ষীরোদ আমাকে বলিয়া আসিল একজন মহাপুরুষ আসিবেন, তিনিই বা কোথায়? তবে কি সবই মিথ্যা, যা হোক আমি ভিতরে ঢুকিয়া ভয়ে ভয়ে ক্ষীরোদকে ডাকিলাম। ভয়ে ভয়ে কেন তাহা বলিতেছি, বাহিরের ঘর অন্ধকার দেখিয়া এবং অন্যান্য লোকজনের সাড়া না পাইয়া মনে কেমন একটা খট্‌কা উঠিল, ভাবিলাম—কাল গঙ্গার ঘাটে যে ক্ষীরোদের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল সে প্রকৃত ক্ষীরোদ তো? এর মধ্যে কোন ভৌতিক ব্যাপার নাই তো? (অবশ্য ভূত কাহাকেও সাক্ষাতে দর্শন দেয় কি না জানি না) তাই সাত পাঁচ ভাবিয়া ভয়ে ভয়ে ডাকিলাম। ডাকিতেই ক্ষীরোদ বাহিরে আসিল এবং

আমাকে বলিল, "কিহে, তোমার এত দেরী হ'ল কেন? বিকেল বেলাতে তোমার আসবার কথা, মহাপুরুষ যে তোমার জন্য অস্থির হ'য়েছেন, কাল যখন তিনি ষ্টেশন হ'তে আমাদের বাড়ীতে আসেন তখনই আমার কাকাবাবু তোমার কথা তাঁহার নিকট বিশেষ ক'রে ব'লে রেখেছেন। তিনিও সেই অবধি তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য ও গান শোন্‌বার জন্য একেবারে অস্থির হ'য়েছেন, যাক্ আর বিলম্ব ক'রনা তিনি কাকাদের ঠাকুর বাড়ীতে আছেন চল।"

আমি কেবল "সংসারী জীব আমরা নানা ঝঞ্ঝাটে দেরী হয়ে গেল" এইটুকু মাত্র বলিয়া তাহার সঙ্গে তাহার কাকা নবকুমার বাবুর ঠাকুর বাড়ীর দিকে চলিলাম। ঠাকুর বাড়ীতে গিয়া দেখি নাট মন্দিরে একখানি কম্বলের উপর গেরুয়া বসনে সমস্ত গাত্র আবৃত করিয়া একজন কে বসিয়া আছেন। আমি অনুমানে ইহাকেই মহাপুরুষ বলিয়া যেমন প্রণাম করিয়া বসিতে যাইব তিনি বলিলেন "দেখ এখানে না ব'সে একেবারে ঘরের মধ্যে চল, অম্‌নি ওখানে বসে বেশ কথা বার্ত্তাও হবে, আর দু' একটা গানও শুনা হবে।" সকলেই তাঁহার আদেশ মত ঘরের মধ্যে চলিলাম সেখানে কিছু সময় নানা কথাবার্ত্তার পর ক্ষীরোদের কথা উঠিলে ক্ষীরোদের কাকা বলিলেন "আপনি বল্‌ছিলেন আজ ক্ষীরোদের বিষয় বল্‌বেন এইবার বল্লে হয় না? আমরা সকলেই এখানে উপস্থিত আছি।

মহাপুরুষ—"বেশ, তাই হউক," বলিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন—গত আশ্বিন মাসের ৭ই তারিখ বুধবার ক্ষীরোদের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়। আমি পদ্মায় স্নান কর্‌তে নেমেছি এমন সময় একখানি ছোট নৌকা হঠাৎ ডুবে গেল এরূপ ঘটনা পদ্মাতে প্রায়ই হয়, এটা যে বিশেষ নূতন ঘটনা তা নয় তবে এত কিনারায় যে নৌকা ডুবিল এইটাই একটু আশ্চর্য্যের। যা' হোক, দেখ্‌তে দেখ্‌তে নৌকার দু'চার খানা কাঠ ভেসে উঠল, আমি কিছু সময় চেয়ে থেকে একটা মানুষকে দেখতে পেলাম, বিশেষ লক্ষ্য ক'রে দেখলাম লোকটা তখনও আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা কর্‌ছে কিন্তু সামর্থে কুলাচ্ছে না, আমি শ্রীগুরুদেবের নাম স্মরণ ক'রে সাঁতার দিয়ে গিয়ে লোকটাকে ধরলাম—কিন্তু অল্পক্ষণ মধ্যেই তাহার দেহ অবসন্ন হ'য়ে গেল বলে মনে হ'ল, কারণ এতক্ষণ সে আমাকে খুব শক্ত ক'রে ধ'রে ছিল এবার যেন ক্রমে সে ধরাটা শিথিল হ'ল। আমি তখন তাহাকে আমার পিঠের উপর উঠাইয়া গুরুদেবের স্মরণ করিতে করিতে তীরে আসিলাম। আসিয়াই আমি আমার উত্তরীয় যাহা স্নান

ক'রে পরব ব'লে রেখেছিলুম তাহা তাহাকে পরাইলাম ও ২।১টী লোকের সাহায্যে সামান্ত সময় কিছু ক্রিয়া করিতেই লোকটীর জ্ঞান হইল। লোকটীর পরিচয় বোধ হয় এখন আর বিশেষ ক'রে দিতে হবে না সেই লোকটীই আপনাদের এই ক্ষীরোদ চন্দ্র।" মহাপুরুষের কথায় বাধা দিয়া ক্ষীরোদের কাকা বলিলেন "সেই সময়ই ইহাকে বাড়ী পাঠালেন না কেন? এদিকে আমরা যে অশুভ সংবাদই শুনেছিলাম।

মহা—আমি ক্ষীরোদকে সে কথা ব'লে ছিলাম কিন্তু সে বল্লে আমি কিছু দিন আপনার নিকট থেকে আপনার সেবা ক'রে তবে যাব। আমি বলিলাম তবে আমার আশ্রমে চল সেখান হ'তে বাড়ীতে খবর দিয়ে তারপর থাকবে। সেও আর কিছু না বলে আমার সহিত চলিল", ক্ষীরোদের কাকা বলিলেন—"আমরা এখানে ১৩ই আশ্বিন বেলা ৯টার সময় ক্ষীরোদের আফিস হইতে এক পত্র পাই যে,"গত ৭ই আশ্বিন পদ্মায় নৌকাডুবি হইয়া ক্ষীরোদ ও আফিসের ২ জন কেরাণী মারা গিয়াছে। যে নৌকায় তাহারা ছিল তাহারই একজন যাত্রী (ক্ষীরোদের অধীনস্থ কেরাণী) অনেক কষ্টে রক্ষা পাইয়া তাহার আফিসে এই সংবাদ দিয়াছে।

মহা—আপনারা তা হ'লে সাত দিন পরে সংবাদ পেলেন যে ক্ষীরোদ মারা গিয়াছে, কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় তখন ক্ষীরোদ সুস্থ হইয়া আমার আশ্রমে রহিয়াছে। আমি তাহাকে আপনাদের নিকট পত্র দিতে বলিয়া ছিলাম কিন্তু সে বলিল আরও ২।৩ দিন পরে সংবাদ দিবে সে আরও বল্লে যে, বাড়ীতে তাহার জন্য ভাবিবার তেমন কেউ নাই সুতরাং এত তাড়াতাড়ি সংবাদ দিবার কোন আবশ্যক নাই।

এইখানে বলিয়া রাখি ক্ষীরোদের ৭ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার পিতাঠাকুর স্বর্গীয় হন। ঠিক তাহার ৯ দিন পরে মাতাঠাকুরাণী ও ক্ষীরোদের একটী বড় ভাই ইহধাম ত্যাগ করেন তখন ক্ষীরোদের আপনার বলিতে কেউ ছিল না, এই যে কাকাবাবু ইনিও তখন কলিকাতায় থাকিতেন না সরকারী কার্য্যে লক্ষ্ণৌ থাকিতেন। কাজেই ক্ষীরোদ প্রতিবাসী রাম শঙ্কর বাবুর তত্ত্বাবধানে তাঁহার বাড়ীতে থাকিয়াই পিতার সঞ্চিত অর্থে কোন রকমে কয়েক বৎসর পড়া শুনা করিয়া এণ্ট্রান্স পাশ করে, গ্রামের দুষ্ট লোকে নানাভাবে কানাকানি করিত যে, রাম শঙ্কর বাবু নাকি ক্ষীরোদের খরচ বাবদ মাসে মাসে তাহার নিকট হইতে ৫০৲টী করিয়া মুদ্রা লইত। অবশ্য আমরা জানিতাম না যে, রামবাবুর এরূপ "মুদ্রা দোষ" ছিল কি না, তিনি নিজে বলিতেন ক্ষীরোদের

বাপের সহিত তাহার বিশেষ ভাব ছিল তাই তিনি ক্ষীরোদের ভার লইয়াছেন। যাহা হউক পাশের পর যদিও তাহার বিবাহের সম্বন্ধ দু' একটী আসিয়াছিল কিন্তু "নিজে উপার্জ্জনক্ষম না হইয়া বিবাহ করিতে নাই" বলিয়া সে তাহাতে রাজি হয় নাই। পাশ করিবার পর ক্ষীরোদ কলিকাতায় কোনও সওদাগরি আফিসে কার্য্য আরম্ভ করে। চাকুরী আরম্ভের ৩ বৎসর পরে এই ঘটনা হয়। ক্ষীরোদের যখন চাকুরী বা পড়াশুনার কোনও ব্যবস্থা ছিল না তখন কোন আত্মীয় স্বজন তাহাকে ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করে নাই, কিন্তু যেমন চাকুরী হইল অমনি "বাবার মাসী" "মামাতোভাইয়ের সম্বন্ধী" প্রভৃতি অনেক আত্মীয়ই আসিয়া ক্ষীরোদের ভার লইল। কাজেই ক্ষীরোদ নিজের পৈতৃক বাড়ী সংস্কার করিয়া পুনরায় তাহাতেই বসবাস আরম্ভ করিল।

যাহাহউক মহাপুরুষ বলিলেন, ক্ষীরোদকে বিশেষ করিয়া বলিয়াও বাড়ীতে কোন সংবাদ দিতে না পারায় তাহার বাড়ীর ঠিকানা জানিবার জন্য অনুসন্ধান আরম্ভ করিলাম। কিন্তু ক্ষীরোদের ঐকান্তিক প্রার্থনায় শেষে তাহাতেও প্রতিনিবৃত্ত হইয়া তাহাকে আশ্রমস্থ অন্যান্য ভক্তবৃন্দের সহিত শাস্ত্রোপদেশাদি প্রদান করিতে লাগিলাম।

খবর দিবার কোন আবশ্যক নাই বলিয়া যখন ক্ষীরোদচন্দ্র মহাপুরুষকে বলিলেন তখন তিনি ক্ষীরোদের সহিত যেসমস্ত কথাবার্ত্তা বলিয়াছিলেন সংক্ষেপে তাহার একটু আলোচনা করিব।

মহা—তুমি বাড়ী হইতে আসিয়া এরূপ বিপদে পড়িলে এ সংবাদ তাহাদিগকে না দিলে যে তাঁহারা বিশেষ উদ্বিগ্ন হইবেন?

ক্ষীরোদ—দেব! আমার বিষয় ভাবিয়া উদ্বিগ্ন হবার মত কেউ আমার সংসারে নাই। আমার দুঃখে দুঃখী একমাত্র আপনাকে দেখিতেছি। সুতরাং আমাকে আর বঞ্চিত না করিয়া সদুপদেশ প্রদান করিয়া আমার যাহাতে আত্মার উন্নতি হয় তাহাই করুন।

মহা—বৎস, তোমার হঠাৎ এমন পরিবর্ত্তন কেন হইল বুঝিতেছি না, মঙ্গলময় শ্রীভগবানের কোনও মঙ্গল ইচ্ছা নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে রহিয়াছে, যাহা হউক তোমার যাহা সন্দেহ হয় তাহা বল যথাসাধ্য উত্তর দিতে চেষ্টা করিব।

ক্ষীরোদ—প্রভু একটী কথা দয়া করিয়া আমাকে বলুন, প্রকৃত অন্ধ কে?

মহা—বৎস, বেশী শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রমাণ আনিব না, সহজ কথায় বলি—দেখিবার সাধ প্রাণে ষোল আনা থাকিলেও যিনি দেখিতে পান না, তিনিই অন্ধ।

কথাটা আর একটু খুলিয়া বলি—বাহ্যিক চক্ষু থাকিলেই যে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা নহে। যে জিনিষ তুমি দেখিবে তাহার রূপ আকৃতি যদি তোমার চক্ষুর গোলকে কেন্দ্রীভূত না হয় তাহা হইলে সে জিনিসের সত্তা তোমার যথার্থ গোচরীভূত হয় না। অর্থাৎ সে দেখা তোমার দেখাই হয় না। কোন জিনিসের আকার যেমন তেমন করিয়া দেখা আর তাহার স্বরূপসত্তা অবলোকন করা, এই দুইটীতে অনেক পার্থক্য। যাহার চক্ষু আছে এবং যিনি যথার্থ পদার্থের স্বরূপ সত্তা উপলব্ধি করিয়া দেখিতে জানেন তিনিই প্রকৃত চক্ষুষ্মান, আর যাঁহার চক্ষু থাকিয়াও পদার্থের স্বরূপ সত্য উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা নাই অর্থাৎ যিনি দেখিবার মতন করিয়া দেখিতে পারেন না তিনিই অন্ধ। আর একটা কথা তোমাকে বলিয়া রাখি দেখিতে পারিলেও তাহা সকলে ধারণা করিয়া রাখিতে পারে না।

ক্ষীরোদ—আচ্ছা প্রভো! এই যে দেখিবার ক্ষমতা এটা কি মানুষ নিজের ইচ্ছা মত করিয়া লইতে পারে?

মহা—না, মানুষের নিজের ইচ্ছায় কিছুই হয় না, নিজের ইচ্ছার সহিত যখন ভগবৎকৃপা যোগ হয় তখনই ক্রিয়া ফলবতী হয়। গীতার মধ্যে ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন ব্যাপারটা আলোচনা করিয়া দেখ না কেন? ভগবান নিজ সখা পরমভক্ত অর্জ্জুনকে যখন ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদর বিরাট বিশ্বস্তব মূর্ত্তি দেখাইতে গেলেন, অর্জ্জুন তখন তাহার সাধারণ চক্ষে তাহা দেখিতে পারেন নাই তাই দয়াময় দয়া করিয়া তাহাকে বলিলেন—

"দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।"

অর্থাৎ—আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু প্রদান করিতেছি তুমি আমার যোগৈশ্বর্য্য দর্শন কর। অর্জ্জুন ভগবানের কৃপায় দিব্য চক্ষু পাইয়া তাঁহার দেব দানব-মানবের অগোচর অনন্তউদ্ভাসিত বিরাট বিশ্ব বিমোহনরূপ দেখিলেন বটে, কিন্তু ধারণা করিয়া রাখিতে পারিলেন কৈ? তাই তাঁহাকে চমকিত হইয়া বলিতে হইল—

"দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো।"

অর্থাৎ হে বিভো! তোমার বিরাট বিশ্ব-বিমোহন মূর্ত্তি দর্শন করিলাম বটে, কিন্তু আমার অন্তরাত্মা বিশেষ বিচলিত হইয়াছে, সুতরাং—

"তদেব মে দর্শয় দেবরূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস।"

হে জগন্নিবাস! তোমার সেই মনোহর পূর্ব্বরূপ (কৃষ্ণরূপ) দেখাইয়া আমার প্রতি প্রসন্নতা বিস্তার কর। তাই বলিতে ছিলাম যে, দেখিলেই বা পদার্থের

স্বরূপ সত্তা ধারণা করিতে পারে কয় জন। চক্ষু থাকিলেই সে সব দেখিতে পায় না, চক্ষুর আয়ত্তীভূত যতটুকু ততটুকুই চক্ষু দেখিতে পায় তাহার বেশী সে পারে না।

ক্ষীরোদ—আপনার কথামত বলিতে গেলে যাহাদের চক্ষু আছে তাহাদিগকেও ত অন্ধ বলিতে হয়।

মহা—শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"সৎসঙ্গশ্চ বিবেক নির্ম্মলং নয়নদ্বয়ং।
যস্যনাস্তি নরঃ সোঽন্ধঃ কথং নাপদ মার্গগঃ॥"

অর্থাৎ সৎসঙ্গ ও বিবেক এই দুইটী মানবের দুইটী নির্ম্মল চক্ষু যাঁর এ দুইটী চক্ষু নাই সে ব্যক্তির অন্য যাহাই থাকুক না কেন সে অন্ধ।

ক্ষীরোদ—তবে আমার উপর ভগবানের অপার করুণা। যদিও দুইটী চক্ষু এখনও লাভ হয় নাই বটে, কিন্তু সৎসঙ্গরূপ চক্ষু দয়া করিয়া তিনি দিয়াছেন। এখন আর আমাকে বঞ্চিত করিবেন না। সৎসঙ্গ দ্বারাই তো দ্বিতীয় চক্ষু "বিবেক" লাভ করা যাইবে? কৃপাকরিয়া আপনি যাহাতে আমার অন্ধত্ব ঘুচিয়া আপনার কথা মত নির্ম্মল নয়ন যুগল লাভ হয় তাহা করুন।

এই ভাবের অনেক কথাই হইতেছিল, "আজ এই পর্য্যন্তই থাকুক আবার পরে হইবে বলিয়া সেদিনকার মত মহাপুরুষ ক্ষীরোদকে বিদায় দিলেন।" বলা বাহুল্য একথা গুলি আমরা মহাপুরুষের নিকট হইতেই সংক্ষেপে শুনিয়াছিলাম। পরে ক্ষীরোদের নিকট শুনিয়া লিখিলাম।

এদিকে আমরা যখন সেই নবকুমার বাবুর ঠাকুর বাড়ীতে বসিয়া ক্ষীরোদের নৌকাডুবীর পর উদ্ধারের বৃত্তান্ত শুনিতেছিলাম তখন মহাপুরুষ যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সংক্ষেপে বলিয়া নবকুমার বাবুকে বলিলেন—"কৈ আমাকে গান শুনাইবেন বলিয়া আশা দিয়াছিলেন তাহার ব্যবস্থা কৈ?" নবকুমার বাবু আমাকে দেখাইয়া বলিলেন, "এই যে আপনার গানের মালিক, আমি মালিক হাজির করিয়া দিলাম এখন আপনার যাহা ইচ্ছা করুন," সঙ্গে সঙ্গেই একটা হারমোনিয়ম উপস্থিত হইল আমিও শ্রীগুরুদেবকে স্মরণ করিয়া গাহিলাম—

"জাননারে মন পরম কারণ শ্রীগুরু চরণ ভরসারে।
(গুরু) সর্ব্বসিদ্ধি দাতা পরম দেবতা দয়াময় দীনশরণ রে॥
পাবে অনায়াসে চতুর্ব্বর্গ ফল
ভব-মরুমাঝে ছায়া সুশীতল
(গুরুপদ) কল্পতরু মূলে ভক্তি গঙ্গাজল সযতনে কর সেচন রে॥

নিস্তার করিতে সংসার তুফানে
পথ দেখাইতে প্রেমের ভবনে
জ্ঞান কিরণ চির বিতরণে অজ্ঞান তিমির নাশন রে ॥
দয়াময় যিনি দেব দীনবন্ধু
ভক্ত চিদাকাশ হাসন ইন্দু
যাচে এ কাঙ্গাল কৃপাকণাবিন্দু প্রেমানন্দে রবে মগন রে ॥"

গান শেষ হইল কিন্তু মহাপুরুষ নিস্তব্ধ। তাঁহার নয়নে পলক নাই, কেবল বারি। হঠাৎ "জয়গুরু, জয়গুরু" বলিয়া মহাপুরুষ নয়ন পালটিয়া বলিলেন, "বল বাবা, শ্রীগুরুদেবের নিকট প্রার্থনা বল—" আমিতো মহা ফাঁপরে পড়িলাম গুরুদেবের নিকট প্রার্থনার মত গান আমার জানা আছে বলিয়া মনে হইল না। আমি ইতঃস্তত করিতেছি এমন সময় হঠাৎ মনে পড়িল পরমভক্ত বিশ্বরূপ গোস্বামীর একখানি সুন্দর প্রার্থনা আছে বটে, আমি আর কোন কথা না বলিয়া গাহিলাম :—

শ্রীগুরু করুণাময়। (ওহে আমার)
(আমার) কি হবে কি হবে দিন যায় ভবে
বৃথা রঙ্গরস আমোদ উৎসবে
ভ্রমেও ভাবিনে কি হবে কেমনে কোন গুণে পাব ওপদ আশ্রয় ॥
(আমার) হেলায় গেল দিন তবুও রসনা
হরেকৃষ্ণ নাম না করে ঘোষণা
মিথ্যা প্রবঞ্চনা পাপ কুমন্ত্রণা কুরঙ্গে মজিয়া রয় ॥
(আমার) নাহি বুদ্ধি বল সাধন সংযম
যা আছে কেবল দম্ভ আর তম
ভ্রম পরমাদ বিসাদ বিষম অপরাধ অপচয় ॥
(আমার) অশুদ্ধ এ চিতে অসত সন্ধান
আলস্য অশুচি সদা বলবান
অশান্তি অনলে তাই সদা জ্বলে প্রাণান্ত করিয়া লয় ॥
বিশ্বরূপের এই ক্ষীণ আর্তনাদ
শুনহে কাণ্ডারী ক্ষম অপরাধ
অক্ষম এ দাসে রক্ষ দীননাথ অন্তে শমন ভয় ॥

এবার আর মহাপুরুষ স্থির থাকিতে পারিলেন না, একেবারে বালকের

প্রায় উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। সেখানে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাহারাত মহাপুরুষের ভাব দেখিয়া অবাক্। আমিও মনে করিলাম একি! গেরুয়া বসন পরিহিত জটাধারী সন্ন্যাসী, কোথায় "নেতি নেতি" বা "সোহং সোহং" করিবে এযে একেবারে সাক্ষাৎ ভক্তি মূর্ত্তিমান। এমন লোকের নিকট গান করিতে পারিলাম বলিয়া নিজকে মনে মনে বিশেষ ধন্যবাদ দিতে লাগিলাম। এদিকে অনেকক্ষণ কান্না চলিল শেষে তিনি নিজেই প্রেম গদগদ কণ্ঠে গান ধরিলেন --

জয় জয় শ্রীগুরু, প্রেম-কলপতরু
অদভুত যাঁকো প্রকাশ।
হিয়া অগেয়ান তিমির বরজ্ঞান
সুচন্দ্রকিরণে করুনাশ॥
ইহ লোচন আনন্দ-ধাম।
অযাচিত এহেন পতিত হেরি যো পঁহু
যাচি দেয়ল হরিনাম॥
দুরগতি অগতি অসতমতি যোজন
নাহি সুকৃতিলবলেশ।
শ্রীবৃন্দাবন যুগল ভজন ধন
তাহে করল উপদেশ
নিরমল গৌর প্রেমরস সিঞ্চনে
পূরল সব মন আশ
সো চরণাম্বুজে রাত নাহি হোয়ল
রোয়ত বৈষ্ণবদাস॥

উপস্থিত ভক্তবৃন্দ সকলেই ক্রমে ক্রমে সঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করিলেন। কত ভাবের কত কথাই যে কীর্ত্তনে প্রকাশ পাইল তাহার সীমা নাই। শেষে যখন কীর্ত্তন শেষ হইল তখন দেখা গেল রাত্র ১১॥ টা। মহাপুরুষ সকলকে প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিয়া সে রাত্রের জন্য বিদায় দিলেন এবং আমাকে বলিলেন "আমি যে কয় দিন কলিকাতায় থাকিব প্রত্যহই তোমার আসা চাই" আমিও "চেষ্টা করিব" বলিয়া উঠিয়া ক্ষীরোদ চন্দ্রের সহিত মহাপুরুষকে লইয়া তাহাদের বাড়ীতে গেলাম।

ক্রমশঃ

শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ভক্তি

(২০শ বর্ষ ৯ম, ১০ম সংখ্যা বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯ সাল)

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥"

আশা

নবঘন শ্যাম মূরতি মোহন
শ্রীরাধিকা ল'য়ে বামে।
আছে দাঁড়াইয়ে পদে পদ দিয়ে
ত্রিভঙ্গ বঙ্কিমঠামে॥
আঁখি ঢল ঢল চাহান চঞ্চল
বদনেতে মৃদুহাসি।
হেরিয়া হিয়ায় হেন উপজয়
(বুঝি) গগনের চাঁদ পড়িল খসি॥
চরণে নুপুর কিবা সুমধুর
ঝুনু ঝুনু রবে বাজে।
কদম্বের মূলে হেরগো যুগলে
(কিবা) সেজেছে মধুর সাজে॥
সুচিকণ কেশ সুবিমল বেশ
গলেতে মোহন মালা।
বড় সাধ মনে হেরি রাত্রি দিনে
বিরহে চিকণ কালা॥

দীন—কাঙ্গাল

সারসিকীভজন।

বৈষ্ণব সাধকগণের পথপ্রদর্শক ভজন-গুরু "প্রেম-ভক্তি-মহারাজ" শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় সনির্ব্বন্ধে বার বার তারস্বরে উপদেশ দিতেছেন—

"আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পদে মজাইয়া মন॥"

পথে ঘাটে, হাটে বাজারে, ভিখারী বৈষ্ণবের মুখে, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় অনবরত উক্ত বাক্য শুনিতে পাই কিন্তু উক্ত মহাবাক্যের প্রকৃত গুরুত্ব যে কি তাহা আমরা বড় একটা অনুধাবন করি না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মের সার রহস্য উক্ত বাংলা পয়ারের মধ্যেই নিহিত আছে। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের যে সিদ্ধান্ত শ্লোক শ্রীচৈতন্য-মত মন্থন করিয়া বিধিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে ঐ কথাই দেখিতে পাই সুতরাং বিনামূল্যের বাংলা পয়ার উপেক্ষণীয় নহে।

"আরাধ্য ভগবান্ ব্রজেশতনয় স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্
কাচিৎ রম্যা উপাসনা যা ব্রজবধুবর্গেণ কল্পিতা।
শাস্ত্রং ভাগবত প্রমাণমমলং প্রেম পুমার্থো মহান্
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভোমতমিদং তত্রাদর না পর॥

পাছে বৈষ্ণব সাধকগণ বিভিন্ন মতের আপত্তি পড়িয়া উদ্ভ্রান্ত হয়েন তাই ঐরূপে পরম কৃপালু বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্ম-মতের সার তথ্য বিধি বদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগের আরাধ্য, তাঁহার নিত্য স্থিতি হইল শ্রীবৃন্দাবনে। সেই ব্রজরাজকুমারকে ব্রজগোপীগণ যে ভাবে দেহ, মন, প্রাণ সর্ব্বস্ব দিয়া সেবা করিয়াছিলেন সেই রমণীয় উপাসনা হইল আমাদের ভজন। শ্রীমদ্ভাগবত হইতেছে প্রমাণ-গ্রন্থ এবং প্রেম হইতেছে পুরুষার্থ শিরোমণি।

আমরা ত্রিতাপ দগ্ধ সংসার পীড়িত জীব। সাধু-গুরুকৃপায় আমাদের চিত্ত যখন কৃষ্ণোন্মুখী হয় তখন আমরা ক্লেশের আত্যন্তিক নিবৃত্তি এবং বিশুদ্ধানন্দ খুঁজিয়া বেড়াই, বেদ পুরাণের মধ্যে সেই চিন্ময় সদ্বস্তু, বিশুদ্ধ আনন্দের অনুসন্ধান করি কিন্তু অনন্ত অগাধ শাস্ত্র জলধির মধ্যে ডুবিয়া আত্মহারা হইয়া, উদ্ভ্রান্ত হইয়া যাই। আমাদের আকাঙ্ক্ষা ঐকান্তিক হইলে ঠিক্ উপযুক্ত সময়ে

শ্রীগুরু মূর্ত্তিতে সর্ব্বাগ্রে শ্রীহরির করুণা বর্ষিত হয়। পরমহিতৈষী ভবকর্ণধার শ্রীগুরুদেব সমীপস্থ হইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলেন—"বৎস, অনন্ত ভবজলধি নিজ বলে সন্তরণে পার হইবার উদ্যম পরিত্যাগ কর উহাতে কেবল বৃথা পরিশ্রম এবং হতাশ মাত্রই লাভ হইবে।

এই অপার ভব জলধিতে সাধু মহাজনেরাই হইতেছেন ভেলা, সেই ভেলা কোন প্রকারে আশ্রয় করিতে পারিলে তোমাকে আর বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না। তুমি কেবল নিষ্ঠাসহকারে দৃঢ়রূপে সেই প্লবাশ্রয় করিয়া থাকিবে, নিখিল বিঘ্ন বাধা, ঝঞ্ঝাবাত, আবর্ত্ত অতিক্রম করিয়া সেই ভেলা তোমাকে অভীষ্ট স্থানে সুনিশ্চয় পৌঁছাইয়া দিবে; ইহা আমার মুখের কথা নহে অভ্রান্ত ঋষিবাক্য—বেদবাণী।

"মহৎ কৃপাভিন্ন কোন কর্ম্মে শক্তি নয়।
কৃষ্ণ ভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥"

তবে একটা কথা বলিয়া রাখি এই ভবসংসার জলধিতে নানা জাতীয় বহু প্লব ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, চিত্তের বিক্ষেপে আকু পাকু করিয়া না দেখিয়া শুনিয়া যাহা তাহা আশ্রয় করিও না; বেশ ধীর ভাবে বিচার করিয়া ধরিতে না পারিলে হয় তো অতি দ্রুতগামী মেল জাহাজ না ধরিয়া একখানি মালবাহী গাধা বোটের আশ্রয় করিবে তখন তোমাকে বিষম ফেরে পড়িতে হইবে। ছয় দিনের পথ যাইতে তোমাদের ছয় যুগ কাটিয়া যাইবে, আর অনেক প্রকার লাঞ্ছনাও ভোগ করিতে হইবে। এই মেল জাহাজ চিনিয়া লওয়াও সুকঠিন নহে। যাহার কলেবরে শ্রীগৌর নিত্যানন্দের নামের উজ্জ্বল চিত্রে সুচিত্রিত, যাঁহার শীর্ষোপরে শ্রীগৌরাঙ্গ নিষ্ঠার পরিচয় স্বরূপ শিখা পতাকা প্রলম্বিত, যাহার গলদেশে বৃন্দাবনীয় ভজনের চিহ্ন স্বরূপ শ্রীবৃন্দা রচিত মালা বিরাজিত, যিনি অনুক্ষণ শ্রীরাধা কৃষ্ণ নামোচ্চারণ রূপ মধুর বংশী ধ্বনি করিতেছেন, বৎস তাঁহাকেই জানিবে আমাদের অভীষ্ট আশ্রয়। সেই গৌরগত প্রাণ বৈষ্ণব হইলেন আমাদের সহায়, আশ্রয় ও পথ প্রদর্শক বা পূর্ব্ববর্ণিত সংসার জলধির মেল জাহাজ। এই প্রেমের জগতে কৃপার অবধি নাই। বৎস, সেরূপ পথ প্রদর্শকের জন্য তোমায় খুঁজিয়া বেড়াইতেও হইবে না। পরমদয়ালু শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরের কৃপায় তাঁহারাই মাদৃশ অন্ধ খঞ্জ পতিত জীবকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া ফিরিতেছেন, কেবল আমাদিগকে সরল প্রাণে ঐকান্তিক ভাবে তাঁহাদের শরণ প্রার্থনা করিতে হইবে। অমনি দেখিবে স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গ-পার্ষদ শ্রীরূপ রঘুনাথের

অজস্র কৃপা আসিয়া আমাদিগকে একেবারে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিবে। এই স্থানে কিন্তু একটী কথা বলিয়া রাখি ; এই সকল মহাপ্রাণ ভজন-গুরু বৈষ্ণবদের নিকট যাহাতে কোন প্রকারে অপরাধ না জন্মে, তৎপক্ষে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে তাই পরমারাধ্য উক্ত ঠাকুর মহাশয় সাবধান করিয়া বলিয়াছেন—

"হইয়াছেন হবেন প্রভুর যত দাস।
সবার চরণ বন্দো দন্তে করি ঘাস॥"

এ রাজ্যে প্রকট অপ্রকট বলিয়া কোন কথা নাই, তাঁহারা সকলেই আমাদের চিরবরেণ্য সকলেই আমাদের হিতৈষী শিক্ষাগুরু। তাই ঠাকুর মহাশয় পুনরপি বলিতেছেন—

"তা সবার পাদপদ্ম শিরে রহু মোর।
যাহার প্রভাবে নাশে কলি মহাঘোর॥"

অতএব বৎস, মহাপ্রভুর পরিকরের পদানুশরণ করিয়া চলো অচিরেই অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে।

আনন্দ পিপাসু জীব কিছুতেই থামিতেছে না দেখিয়া, অনেক তত্ত্ব-বিচারের পর উপনিষৎ পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বর্ণনে বলিতেছেন—

"রসো বৈ সঃ রসংহ্যেবায় লব্ধানন্দী ভবতি।" তিনি রস স্বরূপ সেই রসকে আশ্রয় করিলে জীব পরমানন্দ লাভে কৃতার্থ হইবে। রসই আনন্দ, আনন্দই ব্রহ্ম। বেদ-শিরোভাগ উপনিষদের প্রতিধ্বনি করিয়া পঞ্চম-বেদ শ্রীমদ্ভাগবত আরো আশার ও আনন্দের সংবাদ দিতেছেন—

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাং
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণব্রহ্ম সনাতনম্॥ ভাঃ ১০।১৪।৩৪

সেই চিদানন্দঘন পরব্রহ্মের অনুসন্ধানে তাইরে আর স্বর্গ মর্ত্ত চড়িতে হইবে না, ধ্যান সমাধি যোগে অখিল ভুবন খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে না, সেই অনন্ত কূটস্থ নিখিল ভুবনাশ্রয় আনন্দ স্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম এই ভৌমব্রজে নন্দালয়ে প্রকটীভূত। অহো নন্দব্রজের গোপগণের ভাগ্যের সীমা নাই। যোগিগণ কোটি সংবৎসর ধ্যান করিয়া যাঁহার অনুসন্ধান পান না সেই বেদ-বর্ণিত অবাঙ্মনসগোচর পুরাণ পুরুষ হইতেছেন ব্রজবাসিদিগের পরমাত্মার নিজজন। একথা হঠাৎ বিশ্বাস করিবার কথা নহে তবে ভগবদ্‌কৃপার বালাই যাই। ভক্তগণকে কৃপা করিবার জন্যই সেই সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বভূতস্থ পরব্রহ্ম ঐ দেখো ব্রজে

নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীনন্দদুলাল। এই গুপ্ত রহস্য জানিতে পারিয়াই ত্রিহুতিয়া ভক্ত পণ্ডিত রঘুপতি উপাধ্যায় শ্রীচৈতন্যদেবকে সংবাদ দিলেন—

> শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ।
> অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরংব্রহ্ম ॥
>
> (পদ্যাবলী ১২৭)

"প্রভো আর বেদ পুরাণের পিছু পিছু ফিরিতেছি না, যদি কাহারও বন্দনা করিতে হয় তবে এখন আমি ঐ নন্দমহারাজকেই বন্দনা করিব, যেহেতু স্বয়ং পরব্রহ্ম দেখিলাম ঐ নন্দমহারাজের অলিন্দে বালগোপাল মূর্ত্তিতে খেলিতেছেন, সুতরাং নন্দমহারাজের কৃপা হইলে সেই আরাধ্য বস্তু পাইতে ক্ষণমাত্রও বিলম্ব হইবে না। উক্ত সিদ্ধান্ত শ্লোকে আমরা পাইয়াছি শ্রীমদ্ভাগবত হইতেছেন গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের প্রামাণিক গ্রন্থ দর্শনাচার্য্য পূজ্যপাদ শ্রীজীবগোস্বামী তত্ত্বসন্দর্ভে তাহাই সম্যক্ প্রতিপাদন করিয়াছেন। সেই শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" এখানে গোকুলে প্রকটিত শ্রীনন্দদুলাল কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্ ইহাই পাইতেছি। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত শ্রীনন্দনন্দন কৃষ্ণের মথুরা ও দ্বারকালীলা বর্ণিত আছে সত্য, এক হইলেও লীলামাধুর্য্য ও ধাম ভেদে ইতর বিশেষ উক্ত ভাগবতেও বর্ণিত আছে, তাই বৈষ্ণবাচার্য্য দয়া করিয়া সাধকগণকে সতর্ক করিয়া বিশেষ সংগোপনে বলিতেছেন "দেখো ভাই কৃষ্ণই পরতত্ত্ব, কৃষ্ণই আমাদের উপাস্য, কিন্তু আমাদের চাই সারসিকী ভজন রসময় কৃষ্ণকেই আমরা চাই, তিনি হইতেছেন—

> "রসময় বপু কৃষ্ণ সাক্ষাৎশৃঙ্গার"

চন্দ্র দর্শনে পরিপূর্ণ জলনিধি যেমন আরো স্ফীত হইয়া উঠে তদ্রূপ ধামও পরিকর বৈশিষ্ট্যে লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণেরও বৈশিষ্ট হইয়া থাকে। ইহা বাদী তার্কিক না বুঝিতে চাহিলেও ভক্ত সাধকের বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। তাহার প্রমাণ যথা, কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—

> "যদ্যপি কৃষ্ণমাধুর্য্য মাধুর্য্যের ধুর্য্য।
> ব্রজদেবী সঙ্গে তার বাড়য়ে মাধুর্য্য ॥"

আবার শ্রীরাধৈকপ্রাণ শ্রীলরঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীচরণাশ্রিত উক্ত ভক্ত কবিরাজ গোস্বামী আরো মাত্রা বাড়াইয়া বলিতেছেন—

রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ।
অন্যথা বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং মদনমোহিতঃ॥

[গোবিন্দলীলামৃত ৮।৩২]

গালাগালিটা কিছু বেশী চড়া হইয়া গিয়াছে। হইবে না কেন? তাঁহার শিক্ষা গুরু শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী যে রাধাবিরহিত কৃষ্ণকে আদৌ আমলেই আনেন নাই। তিনি খুব দৃঢ়ভাবে বলিতেছেন যে, আমার আর একটা সঙ্কল্প বলি শুন—আমি বহুকাল যাবত কৃষ্ণবিরহী হইলেও প্রচুর বিভবশালী যদুপতিকে দর্শন করিবার জন্য তিনি স্বয়ং দ্বারকায় যাইতে আদেশ করিলেও রাধাকৃষ্ণের ধারবাহিক লীলা যে স্থানে চিরপ্রবাহিত সেই মধুর ব্রজধাম ছাড়িয়া ক্ষণকালের জন্যও আমি যাইতে পারিব না। সুতরাং কেবল কৃষ্ণকে পাইলে হইবে না গোপীজনবল্লভ রাধানাগর শিখিপিঞ্ছবিভূষণ গোপবেশ বেণুকর শ্রীনন্দদুলালকে পাইতে হইবে। এই স্থানে প্রসঙ্গক্রমে ধামের মহিমা আসিয়া উপস্থিত হইল। ভক্তগণের কৃপা হইলে এ বিষয়ে পরে আলোচিত হইবে।

শ্রীবামাচরণ বসু।

আশা কালের বাসা

"দিনযামিন্যৌ সায়ং প্রাতঃ,
শিশির বসন্তৌ পুনরায়াতঃ।
কালক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ু,
তদপি ন মুঞ্চত্যাশা বায়ু"॥ "মোহমুদ্গর।"

"দিবস যামিনী আর সায়াহ্ন প্রভাত। শিশির বসন্ত পুনঃ করে যাতায়াত॥
এইরূপে খেলে কাল ক্ষয় পায় আয়ু। তথাপি মানব নাহি ছাড়ে আশা বায়ু"॥

পল, দণ্ড, প্রহর, প্রাতঃ, সন্ধ্যা, দিন, রাত্রি, পক্ষ, ঋতু, অয়ন, অব্দ প্রভৃতি সময়কে সৌর গতিতে বিভাগ করিয়া, অনিবার্য্য কাল অপ্রতিহত বেগে প্রতি নিয়তই ক্রীড়া করিতে করিতে জগৎবাসী জীবের আয়ু হরণ করিতেছে। পরন্তু জীব মোহাচ্ছন্ন বশতঃ আয়ু বৃদ্ধি পাইতেছে ভাবিয়া আশা বায়ুর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া কালের কুটিল গতিকে তুচ্ছজ্ঞান পূর্ব্বক কত শত

অভিনব মনোরথে যে মনোনিবেশ করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। মনোরথের পরিপূর্ণতা বা অপরিপূর্ণতা জীবের ইচ্ছাধীন নহে, কর্ম্মাধীন। কর্ম্ম-সূত্রে কখন আশা পূর্ণ হয়, কখন হয় না। সুতরাং কর্ম্ম সূত্রাবদ্ধ সুখদুঃখের উৎপত্তি হইল আশা হইতে। আশা বায়ু অন্তরে প্রবাহিত হইয়া জীবকে উৎসাহিত করে; কিন্তু কাল ঐ প্রবাহকে কর্ম্ম সূত্রানুসারে নিজ স্রোতে মিশাইয়া কখন কখন বৈপরীত্য ঘটাইয়া দেয়। তাই রঘুবংশাবতংশ শ্রীরামচন্দ্র, দৈব প্রেরিতা দুষ্টা সরস্বতী আক্রান্ত প্রিয় মহিষী কৈকেয়ীর বশবর্ত্তী পিতার আদেশে রাজ্যাভিষিক্ত না হইয়া বনগমন সময়ে জীবের চৈতন্য সম্পাদনের নিমিত্ত বলিয়াছিলেন যে :—

"যচ্চিন্তিতং তদিহ দূরময়ং প্রয়াতি,
যচ্চেতসা ন গণিতং তদিহাভ্যুপৈতি।
প্রাতর্ভবামি বসুধাধিপ চক্রবর্ত্তী,
সোহং ব্রজামি বিপিনে জটিলস্তপস্বী॥"

অর্থাৎ যাহা হইবে বলিয়া আশা করিয়াছিলাম, তাহার কিছুই হইল না; কিন্তু মনেও কখন যাহা ভাবি নাই তাহাই ঘটিল। রজনী প্রভাতা হইলে কোথায় পৃথিবীর অধীশ্বর হইব, তাহা না হইয়া জটা ধারণ পূর্ব্বক তপস্বীর বেশে অরণ্য-বাসে চলিলাম। অতএব দেখা যাইতেছে যে আশানুরূপ ফল ফলে না। কারণ ফলাফল কর্ম্মসূত্রে গ্রথিত হইয়া বিধাতার হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। তিনি কাহাকে কখন কি ফল প্রদান করিবেন তাহা জীবের জানিবার উপায় নাই সুতরাং যাহা জানিবার উপায় নাই এবং যাহা বিধাতা কর্ম্ম-সূত্রানুসারে বিধান করিয়া থাকেন, তাহার আশায় বৃথা কালযাপন না করিয়া কালের কাল মহাকালস্বরূপ উত্তম শ্লোক ভগবানের বার্ত্তায় কালযাপন করাই শ্রেয়ঃ। কেন না শাস্ত্র স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন যে—

"আয়ুর্হরতি বৈপুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ।
তস্যর্তে যৎক্ষণোনীত উত্তম শ্লোক বার্ত্তয়া॥"

ভাবার্থ এই যে 'যাহারা ভগবানের গুণানুবাদাদি শ্রবণ ও কীর্ত্তনে কাল-যাপন করেন, সূর্য্যদেবের উদয়াস্ত দ্বারা বিভক্তকাল তাহাদের আয়ু ভিন্ন অন্য সকলেরই আয়ু বৃথা হরণ করিতেছেন। অতএব আয়ুক্ষয়কারী আশাবায়ু

পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবানের গুণানুবাদে সমগ্রশক্তিপাত করাই মুখ্য কর্ম্ম। যে কর্ম্মের অনুষ্ঠানে জীবের সংসারাসক্তি ও বিষয় বাসনা লয়প্রাপ্ত হয় এবং ভগবৎ-প্রাপ্তির আশা স্বতই বৃদ্ধি হইয়া থাকে সেই আশাই প্রকৃত আশা—ঐ আশা বৃদ্ধির সঙ্গে ব্যাকুলতা আসিয়া উপস্থিত হয়, ব্যাকুলতা আসিলে—অজাত-পক্ষ পক্ষী যেমন মাতার জন্য ব্যাকুল হয়, অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত শিশু সন্তান যেমন মাতৃস্তন্য দুগ্ধের জন্য ব্যাকুল হয়, বিরহ কাতরা যুবতী যেমন প্রবাসগত পতির জন্য ব্যাকুলা হয়, ভগবানের দর্শন জন্য সংসারাসক্তি শূন্য ভগবদ্ভক্তের প্রাণও সেইরূপ ব্যাকুল হইয়া উঠে। ব্যাকুলতা আসিলে অভয়দাতা ভগবানের দয়া হয়। সুতরাং ভগবদ্ভক্তের আর কোন ভয় এমন কি কালভয় পর্য্যন্ত থাকে না। এ কথা কালভয়হারী হরি নিজ মুখেই সখা অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন যথা—

"কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্ত প্রণশ্যতি।"

অতএব সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে করিতে মানবমাত্রেরই ইহা প্রতিনিয়ত স্মরণ রাখা উচিত যে—

অসার আশায় কাটাইলে কাল।
শিয়রে বসিয়া আয়ু হবে কাল॥
কাল গতিবিধি যে বুঝে এ ভবে।
তাহার বিনাশ কভু না সম্ভবে॥

শ্রীভূপতিচরণ বসু

নবদ্বীপ-বিহার।

যিনি অখিল রসামৃত-মূর্ত্তি তাঁহাকে চিনিবার উপায় নাই, চিনাইবারও ভাষা নাই। যেমন বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার দ্বারা শ্বেতবর্ণ সূর্য্য কিরণ-মধ্যে বিবিধ বর্ণের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায় সেইরূপ ভাগ্যক্রমে সাধু গুরুকৃপা হইলে সেই সর্ব্ব-রসপূর্ণ "রসোবৈসঃ" মধ্যে নিখিল রসের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ দেখিয়া ভক্ত হৃদয় আনন্দ-রসে আত্মহারা হইয়া যায়। যিনি যেরূপ রসের আশ্রয় তাঁহার সেই রস-ভাবিত চিত্তে রসস্বরূপের সেই জাতীয় রসময় বিগ্রহ প্রকাশিত হয়েন। দ্বাপর-লীলায় আমরা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মধ্যে ঠিক্ এই চিত্রের বিকাশ দেখিতে পাই। সর্ব্ব-রস কদম্বমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ কংসরাজের মল্লরঙ্গ ভূমিতে প্রবেশ করিলেন, তথায় পাত্র-

মিত্র, সজ্জন দুর্জ্জন শাস্য, শাসক প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবের জনগণ সমবেত আছেন তাঁহারা নিজ নিজ ভাব অনুরূপ মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। সেই সুকোমল বরবপুকে—

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণিনাং পরদেবতেতিবিদিতোরঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥

ভাঃ ১০।৪৩।১৮

অর্থাৎ মল্লগণ বজ্রসার, যুবতীগণ মূর্ত্তিমান মদন, নরগণ নরাধিপ, গোপগণ নিজজন, দুর্বৃত্ত নরপতিগণ আপনাদিগের শাস্তা, বসুদেব দেবকী নিজেদের প্রাণাধিক প্রতিপাল্য শিশু, কংস সাক্ষাৎ মৃত্যু বলিয়া দেখিতে লাগিলেন।

বৈষ্ণব মহাজনেরা বলেন লীলাবিহারীর লীলা নিত্য, প্রভুর নূতন আবির্ভাবের সহিত লীলাও নূতন হইয়া প্রকট হইতে চায়। ভগবানের ব্রজ-লীলায় যেরূপ অভিনয় হইয়াছে নবদ্বীপ বিহারেও লীলা ঠিক সেইরূপই অভিনয় করিতে চাহে, তবে প্রভু এবার ছদ্ম বেশে তাই লীলাও প্রচ্ছন্ন। ধরা পড়িবার ভয়ে নানাপ্রকার লৌকিক আবরণের অবতারণা করিয়া প্রভু আত্মগোপন করিয়া রস বিশেষ আস্বাদন করিতেছেন। সেই কালিন্দীর জলকেলি এবার ভাগ্যবতী জাহ্নবী সলিলে হইতেছে। সেই গোপ-কুমার কুমারীগণ অধুনা সখা, শিষ্য, নদীয়াকুমারী। সেই বাৎসল্যময়ী মা যশোদা এক্ষণে এই শচী দেবী। সেখানে ক্ষীর সর নবনী লইয়া নন্দরাণী যেমন গোপালের পথ তাকাইয়া অর্দ্ধপথে যাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন, এখানেও নিমাইয়ের ভালবাসারূপ অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া স্নেহময়ী জননী নিমাইয়ের পথ তাকাইয়া রাজপথ-দ্বারে যাইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। প্রভু নিজ প্রিয় সখাগণ সঙ্গে সখ্য ও মধুর রসাস্বাদনে মাতিয়াছেন এদিকে বাৎসল্য রস পিয়াইবার জন্য শুদ্ধবাৎসল্যময়ী ছট্‌ফট্ করিতেছেন। সর্ব্বরসাস্বাদক প্রভু কোন্ দিক সাম্‌লাইবেন। বাৎসল্যেরটান যখন বড় বেশী হইল তখন কোন প্রকারে জলবিহার সারিয়া মায়ের নিকট ছুটিলেন। এইখানে কিন্তু একটুকু ঢাকাঢাকি করিতে হইল। প্রভু লোক-শিক্ষার জন্য মানবাচার করিলেন, ভক্তি-নিষ্ঠ মিশ্রনন্দন ভক্তিভরে শ্রীবিষ্ণু পূজা করিয়া তুলসীকে জল দিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া তবে প্রসাদ পাইতে বসিলেন।

"গঙ্গাজলে বিহার করিয়া কথোক্ষণ।
গৃহে আসি করে প্রভু শ্রীবিষ্ণু পূজন॥"

"তুলসীরে জল দিয়া প্রদক্ষিণ করি।
ভোজনে বসেন গিয়া বলি হরি হরি॥"

সেখানে শ্রীরাধারাণীর সযত্ন রচিত অন্নব্যঞ্জন এখানে শ্রীমতী লক্ষী দেবীর প্রস্তুত বিবিধ উপচার। সেখানে মা যশোমতি নিকটে বসিয়া কত সোহাগ ভরে খাওয়ান, এখানেও সেই স্নেহ প্রতিমা শচীদেবী প্রাণধনকে কত আদর করিয়া খাওয়াইতেছেন।

কৃষ্ণলীলায় বাৎসল্য রসের পরে আবার সখ্যরসাস্বাদন তবে মাঝে সুচতুরা সখিগণের বুদ্ধিনৈপুণ্যে একটুকু সংক্ষিপ্ত মধুর রসাত্মক লীলার অভিনয় দেখা যায় শ্রীগৌরাঙ্গলীলায়ও ঠিক্ তাহাই দেখিতে পাই। আহারান্তে প্রভু একটুকু বিশ্রাম জন্য শয়ন মন্দিরে চলিলেন অমনি পতিসেবা নিরতা লক্ষ্মীদেবী মাল্য তাম্বুলাদি লইয়া প্রাণেশ্বরের সেবায় নিযুক্ত হইলেন।

"ভোজন অন্তরে করি তাম্বুল ভক্ষণ।
শয়ন করেন লক্ষ্মী সেবেন চরণ॥" চৈঃ ভাঃ

ওদিকে সাখ্যরসাস্বাদনের জন্য আবার প্রভুর মন টানিতেছে। সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে লইয়া নদীয়া বিনোদিয়া নগর ভ্রমণে বাহির হইলেন। মাঝে মাঝে গদাধরও সঙ্গে থাকিতেন কখন জাহ্নবীসৈকতে বসিয়া ইষ্ট গোষ্ঠী হইত কখনও বা কুল-মজানো ঠাকুরটী প্রিয় গদাধরের স্কন্ধে বামহস্ত বিন্যস্ত করিয়া তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে রূপের লহর তুলিয়া সখাগণের সঙ্গে রঙ্গরস করিতে করিতে চলিয়াছেন। সেই ভুবনসুন্দর রূপ লাবণ্যের মধ্যে এমনই এক প্রকার অপূর্ব্বত্ব ও চমৎকারিত্ব আছে যে, দর্শন মাত্রেই সকলে, বিমুগ্ধ ও তটস্থ হইয়া পড়ে। অন্য পরে কা কথা, যবনেও প্রভুর সেই অত্যুদার করুণ মূর্ত্তি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া কত হর্ষ প্রকাশ করে।

"সর্ব্বভূত কৃপালুতা প্রভুর চরিত।
যবনেও প্রভু দেখি করে বড় প্রীত॥"

শ্রীলবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলেন—বাঞ্ছাকল্পতরু পরম দয়াল প্রভু নগর ভ্রমণ ছলে উচ্চ নীচ সকল শ্রেণীর লোকেরই মনোবাসনা পূর্ণ করিয়া ছিলেন—

"নগর ভ্রমণ করে শ্রীশচীনন্দন।
দেবের দুর্লভ বস্তু দেখে সর্ব্বজন॥"

মথুরা নগরী ভ্রমণ ছলে যেমন বিভিন্ন জীবকে কৃপা করিয়াছিলেন এই নবদ্বীপ ভ্রমণেও সেইরূপ হইয়াছিল।

সর্বজন-চিত্তহর, সর্বভূতে কৃপাময়, সমদর্শী প্রভুর নিকট জাতির বিচার নাই; অতএব প্রভু যাহার বাড়ী সম্মুখে পাইতেছেন তাহারই গৃহে উঠিতেছেন। প্রথমে কৃতার্থ হইল বৃদ্ধ কল্যাণ তাঁতি। প্রভুকে সে ভগবান্ বলিয়া পূর্ব্বে জানে নাই কিন্তু আজ সেই তন্তুবায়কে কৃতার্থ করিয়া প্রভু এইবার গোয়াল পাড়ার দিকে চলিলেন। গোপজাতি বুঝি ঠাকুরের বেশী অন্তরঙ্গ তাই একেবারে সদানন্দের দুয়ারে যাইয়া বসিয়া পাকা ভট্টাচার্য্যের মত আদেশ করিলেন—

"আরে বেটা! শীঘ্র করি দধি দুগ্ধ আন।
আজি তোর ঘরের লইব মহাদান॥"

গোপজাতি অতি সরল, প্রীতি ও ভক্তি-প্রবণ-হৃদয়। আবার ঠাকুরের সঙ্গে কি নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে জানি না, তাহারা বালক বৃদ্ধ স্ত্রী পুরুষ সকলেই আসিয়া অসঙ্কোচে সেই মদনসুন্দর মূর্ত্তিকে ঘেরিয়া ফেলিল, যেন পরমাত্মীয় প্রিয়জনকে আজ তাহাদের স্বগৃহে পাইয়াছে। কত হাস্য পরিহাস চলিতে লাগিল; প্রভুর বামনাই আর বেশীক্ষণ টেকিল না, তাহারা যে সাহজিক প্রেম-বলে ধরিয়া ফেলিয়াছে, প্রীতির উচ্ছ্বাসে ঐশ্বর্য্য উড়াইয়া দিয়াছে—

"প্রভু সঙ্গে গোপগণ করে পরিহাস।
"মামা মামা" বলি সভে করেন সম্ভাষ॥"

গোপ বালকগণ বলিল—মামা যে এখন একেবারে পাকা বামুন সেজেছ, কেবল ক্ষীর সর খাইলে হইবে কেন? এসো, চলো ভাত খাই গিয়ে!

গোপ জাতির সেই সারসিকী প্রীতিতে নিমাই গলিয়া গিয়াছেন, জোর করিয়া ছদ্মবেশ রাখিয়া বলিলেন—আরে আমি যে বামুন, গোয়ালার ভাত খাইলে যে আমার জাতি যাইবে। শ্রীচৈতন্য ভাগবতকার শ্রীলবৃন্দাবনদাস ঠাকুর নারায়ণীদেবীর পুত্র, নারায়ণী নিমাইকে "দাদা" বলিয়া ডাকিতেন সেই সম্পর্কে নিমাই বৃন্দাবন দাসের মামা, আর শচী দেবী হইতেছেন "আই"। প্রভুকে "মামা" সম্বোধন সেই সম্বন্ধ ধরিয়া।

গোয়ালার ভাত খেয়ে শেষে কি জাত হারাবো? এই কথা শুনিয়া গোপ-বালকগণ বলিল, "আজ কাল্ বুঝি বড় জাতের গরব বেড়েছে, সেকালে যে কত এটো খেয়েছ, চলো এখন ঘরে চলো" এই বলিয়া ঠাকুরকে কাঁধে লইয়া ঘরে ঢুকিল।

"কেহো বোলে "আমার ঘরের যত ভাত।
পূর্ব্বে যে খাইলা মনে নাহিক তোমাত ॥
কেহো বোলে 'চল মামা! ভাত খাই গিয়া।
কোন গোপ কান্ধে করি যায় ঘরে লৈয়া ॥"

প্রেমের ঠাকুর ভক্তের প্রেমে গলিয়া গেলেন, সন্তোষে তাহাদের দধি দুগ্ধ ক্ষীর সর নবনী গ্রহণ করিলেন।

শ্রীবামাচরণ বসু।

আশা-ব্যসন-বাসা

"অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং
দন্ত বিহীনং জাতং তুণ্ডম্।
কর-ধৃত-কম্পিত-শোভিত দণ্ডং
তদপি ন মুঞ্চত্যাশা ভাণ্ডম্ ॥" (মোহ মুদ্গর।)

"ধবল বরণ কেশ শরীর গলিত। বদন দশনহীন দেখিতে ঘৃণিত ॥
চলিয়া যাইতে যষ্টি কাঁপে সদা করে। তবু আশাভাণ্ডনরনাহিত্যাগ করে ॥"

জীবের কালার্ণবাভিমুখীন জীবন প্রবাহের সঙ্গে বৈতরণী নদীর ন্যায় আশার প্রবল স্রোত রোগ, শোক, দুঃখ, দৈন্যাদি বাধা বিঘ্ন না মানিয়া অবিরাম গতিতে নিরন্তরই চলিতেছে। জীবও স্রোত চালিত পোতের ন্যায় অবশ ভাবে বিচালিত হইয়া, কখন সরল স্রোতে পড়িয়া সুখে ও কখন বক্র স্রোতে পড়িয়া দুঃখে ভাসিতেছে। এইরূপে সুখের পর দুঃখ ও দুঃখের পর সুখ, কতবারই যে জীবকে কালসিন্ধু অভিমুখে ধাবিত জীবন প্রবাহে ভোগ করিতে হয়, তাহা আশার কুহকে পড়িয়া জীবের জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত স্মৃতি পথে উদয় হয় না। সুতরাং নিশ্চেষ্ট ভাবেই আশাতে গা ভাসাইয়া ক্রমান্বয়ে সুখ ও দুঃখ জীবকে ভোগ করিতে হয়। এই সুখ দুঃখের মূলীভূত কারণ যে আশা, তাহা বুঝিতে পারিয়া যাঁহারা আশাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক নৈরাশ্যকে অবলম্বন করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহারাই আশা সম্ভূত জাগতিক সুখ দুঃখের ভোগ হইতে নিস্কৃতি লাভ করিয়া বিশুদ্ধ আনন্দ ও প্রকৃত শান্তিতে ডুবিয়া, জীবনকে কাল-সিন্ধুর অভিমুখ হইতে ফিরাইতে সমর্থ হইয়াছেন এবং জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য

সাধন করিয়া মনুষ্য পদবীতে আরূঢ় হইতে পারিয়াছেন। তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, আশাই পরম দুঃখকর আর নৈরাশ্যই পরম সুখদায়ক। তাই নৈরাশ্যাবলম্বিনী পিঙ্গলা নাম্নী এক বেশ্যাকে গুরু করিয়া অবধূত ব্রাহ্মণ সুমেধা যদুকে বলিয়াছেন যে, 'বেশ্যা পিঙ্গলা একদিন সন্ধ্যার পর হইতে নিশিথকাল পর্য্যন্ত অর্থাভিলাষনী হইয়া পর পুরুষের আগমন অপেক্ষায় থাকিয়া যখন নিরাশা হইল তখন তাহার মনে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল এবং ভাবিল এতক্ষণ যদি এই কুপথের পথিক না হইয়া ঈশ্বর চিন্তায় যাপন করিতাম তাহা হইলে এত কষ্ট পাইতে হইত না। এই ভাবিয়া সে সেই কুৎসিৎ বৃত্তি তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিল এবং শান্তি অবলম্বন করিয়া স্বীয় শয্যায় উপবেশন পূর্ব্বক সারা নিশা বৈরাগ্য চিন্তা করিতে লাগিল। হে মহারাজ! কান্তের আশা পরিত্যাগ করিয়া পিঙ্গলা বৈরাগ্য চিন্তা করিতে করিতে সে নিশা সুখে নিদ্রিত হইয়াছিল। আশাই পরম দুঃখ, নৈরাশ্যই পরম সুখ। বেশ্যাপিঙ্গলা হইতে আমি এই শিক্ষা করিয়াছি।

"আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্।
যথা সংছিদ্য কান্তাশাং সুখং সুষাপ পিঙ্গলা ॥" ভাঃ ১১।৮।৪৩

অতএব আশার প্রবল স্রোত যাহাতে বন্ধ হইয়া যায় অর্থাৎ কোন বস্তুতেই মমতা বা অত্যাশক্তি যাহাতে না জন্মায়, জীবের তাহাই করা একান্ত কর্ত্তব্য। কারণ মনুষ্যদিগের প্রিয়তম বস্তু সমূহের পরিগ্রহ নিশ্চয়ই দুঃখের নিমিত্ত হয়। যিনি ঐ পরিগ্রহকে দুঃখের হেতু জানিয়া পরিগ্রহ রহিত হয়েন, তিনি অনন্ত সুখ লাভ করিয়া থাকেন।

"পরিগ্রহো হি দুঃখায় বদ্‌যৎ প্রিয়তমং নৃণাম্।
অনন্তসুখমাপ্নোতি তদ্বিদ্বান্ যস্ত্বকিঞ্চনঃ" ॥ ভাঃ ১১।৯।১

আশাপাশ জড়িত মমতা কেবল দুঃখের কারণ নয়; ইহাতে ঘোর বিবাদ ও বিপদ এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। তাই ঐ অবধূত ব্রাহ্মণ কুররী পক্ষীর দৃষ্টান্তে ঐ সুমেধা যদুকে বলিয়াছিলেন যে, 'কুররী পক্ষী মাংস বা আমিষকে ভালবাসে বলিয়া উহাদের মধ্যে কেহ এক খণ্ড আমিষ লাভ করিলে, অন্য যাহারা তাহা পায় নাই, তাহারা উহাকে বধ করিয়া মাংস হরণ করে। বিপদকালে মাংসখণ্ড পরিত্যাগ করিলে পর যেমন তাহার মৃত্যু ঘটে না, তদ্রূপ লব্ধ বস্তুতে মমতাই আত্মনাশ ও বিবাদের কারণ; ইহা

জীব-সংসারে নিত্য বর্ত্তমান আছে। কোন বস্তুতে একান্ত আশক্ত হইলে, পরিণামে ঘোর বিপদ ঘটে। ইহাই আমি কুররীর নিকট শিক্ষা করিয়াছি। সুতরাং কুররী পক্ষী আমার একটি গুরু।'

"সামিষং কুররং জঘ্নুর্বলিনোহন্যে নিরামিষাঃ।
তদামিষং পরিত্যজ্য স সুখং সমবিন্দত॥ ১১।৯।২

আশা মরীচিকার কুআশায় জীব এমনই অন্ধ ও মুগ্ধ হইয়া যায় যে, আপনাকে আপনি বিস্মৃত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবুও আশা পরিত্যাগ করিতে পারে না। অধিক কি বলিব ; কতশত জীব ঐ আশার ছলনায় ভুলিয়া নিত্য নিত্য মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছে দেখিয়াও জীব জীবিত থাকিবার আশা যখন পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে না, তখন ইহা অপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় জগতে আর কি আছে! তাই পাণ্ডুবংশাবতংশ অজাতশত্রু সাক্ষাৎধর্ম্মের অবতার কুন্তী নন্দন যুধিষ্ঠির বকরূপী ধর্ম্মের প্রশ্নোত্তরে জীবকে সতর্ক করিবার জন্য অতি বিশদভাবে বলিয়াছিলেন যে :—

"অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যম মন্দিরং।
শেষাস্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্য মত পরম্"॥

যে জীবনের সহিত মরণের অবশ্যম্ভাবী সম্বন্ধ, সেই জীবন দেহরূপ গেহকে আশ্রয় করিয়া বাল্য হইতে ক্রমশঃ যৌবন ও প্রৌঢ়াদি দশাকে অতিক্রম করিয়া যখন বৃদ্ধ দশায় উপনীত হয়, তখন কেশ শুভ্রবর্ণ, শরীর গলিত, দশন পতিত, বাক্য জড়িত, দৃষ্টি সঙ্কুচিত ও অক্ষমতা বশতঃ গমনাগমনের অবলম্বন করধৃত যষ্টি কম্পিত হয় ; পরন্তু বলবতী আশার প্রতি প্রণয় প্রাণাপেক্ষাও এত প্রগাঢ় হয় যে, কিছুতেই তাহা পরিত্যাগ করা যায় না। তাই আশার ছলনায় ভুলিয়া কোন ফলই লাভ হয় না, প্রত্যুত জীবনটী কালসিন্ধুতে মিশিয়া যায়। কিছুতেই আর ফিরাইতে পারা যায় না। অতএব ব্যসনের বাসস্থান স্বরূপ আশাকে বর্জ্জন ও শান্তির নিকেতন স্বরূপ নৈরাশ্যকে অবলম্বন যে শাস্ত্রানুমোদিত ও জীবের পক্ষে অতীব শুভপ্রদ তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

শ্রীভূপতি চরণ বসু

আলোচনা

(১)

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় শ্রীচৈতন্য যুগের বঙ্গসাহিত্য লইয়া বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার এ অনুসন্ধানে বঙ্গবাসী অলঙ্কৃত হইয়াছে। গত ১৩২৮ পৌষ সংখ্যা ভারতবর্ষে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের কথায়—তিনি বিশেষ করিয়া ভাবিবার জন্য আমাদিগকে একটী উপহার দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য যুগের অমূল্য গ্রন্থরাজী বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের একটা বিশাল অধ্যায়। মহাপ্রভু তাঁহার পবিত্র জীবনের অষ্টাদশ বর্ষ নীলাচল ধামে শ্রীজগবন্ধুর মুখারবিন্দ দর্শন করিয়াই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে শত বৎসর ধরিয়া তাঁহার অমিয় জীবনের প্রভাবে মহিমান্বিত বৈষ্ণব কবিগণের চেষ্টায় শত শত গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল। উড়িয়া কবি সদানন্দ মহাপ্রভুর হরিনাম মূর্ত্তি নাম দিয়াছেন এবং আজ পর্য্যন্ত উড়িষ্যার গ্রামে গ্রামে চৈতন্য দেবের শ্রীমূর্ত্তি পূজিত হইয়া থাকে।

দীনেশবাবু বলিতেছেন—এই সমস্ত অমূল্য গ্রন্থরাজীর অতি নগণ্য অংশ মাত্রই ত এপর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে তাহা ব্যতীত আমেরিকান্ ও জার্ম্মাণ পর্য্যটকগণ উড়িয়া পাণ্ডাদের নিকট হইতে বহুসংখ্যক প্রাচীন উড়িয়া পুঁথি অল্পমূল্যে কিনিয়া লইয়া যাইতেছেন। ইহা কি নিতান্ত পরিতাপের ও জাতীয় জীবনের অবনতির পরিচায়ক নহে? • •

তিনি আরও বলিতেছেন—"চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্য মঙ্গল, চৈতন্য ভাগবত প্রভৃতি পুস্তক পাঠ করিলে জানা যায় যে—তাঁহার প্রধান ভক্ত রাজাধিরাজ প্রতাপরুদ্র তাঁহার জীবনের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ঘটনাগুলিও লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু পুরী হইতে কোন স্থানে ভ্রমণ করিতে বাহির হইলেই প্রতাপরুদ্র সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গরাজ, হরিচন্দন প্রভৃতি তাঁহার মন্ত্রীগণকে প্রভুর জীবন সংক্রান্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য নিযুক্ত করিতেন। পুরীরাজের পুস্তক শালার প্রাচীন পুঁথি ও কাগজপত্র খুঁজিলে এখনও সেই সকল তথ্য উদ্ধার করা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। • • • • আমাদের দেশের ইতিহাসের উপকরণ এমন কি যাঁহার পদধূলির জন্য কোটি কোটি লোক লালায়িত, সেই ভগবান চৈতন্য

দেবের জীবনের লুপ্তকা হনী আমাদের অবহেলায় হাতছাড়া হইয়া যাইতেছে। আমাদের জাতির ঘুম ভাঙ্গে নাই। আমরা শুধু করতাল বাজাইয়া, মৃদঙ্গ ঠুকিয়া ভক্তির তাল রক্ষা করিতেছি মাত্র। যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহার অতি সামান্য জিনিস—এক খানি গামছা কিংবা এক জোড়া পাদুকা পাইলেও তাহার প্রতিষ্ঠা করিতে চায়। আমরা কি চৈতন্যদেবকে সেইরূপ ভালবাসিতে পারিয়াছি? তাহা হইলে কি তাঁহারা জীবনাখ্যানকে এইরূপ অবলীলাক্রমে হারাইয়া ফেলিতে সম্মত হইতাম?"

আজি বিংশশতাব্দীর এই নবীন উন্নতির যুগে মহাপ্রভু শিক্ষিত ভক্ত সম্প্রদায়ে প্রসার লাভ করিতেছে বলিয়াই জানি। শ্রীগৌরাঙ্গ বাঙ্গালীর ঠাকুর তাঁহার জন্মস্থান নবদ্বীপে তাঁহার কিরূপ অর্চ্চনা চলিতেছে জানি না। কারণ সেবাইতগণ যদিও আপনাদিগকে সনাতন গোস্বামীর বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন তত্রাচ সকলেই জানেন তাঁহারা শাক্ত। বিশেষতঃ সনাতন-নন্দিনী বিষ্ণুপ্রিয়া বা তাঁহার স্বামী শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের সামান্য কিছু নিদর্শনও তাঁহাদের নিকট পাওয়া যায় না। অধিক কি তাঁহারা আপনাদের বংশ পরিচয় ধারাতত্ত্বেও অনেক গোলমাল করিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে শ্রীশ্রীবৈষ্ণব সঙ্গিনীতে আলোচনা করিয়াছিলাম। নবদ্বীপ যাত্রী মাত্রেই জানেন তাঁহাদের বাহাদুরি—কেবল মাত্র লোক ঠ্যাঙ্গাইয়া ভেট আদায়েতেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। অপরদিকে নীলাচলে উড়িয়াগণের নিকট মহাপ্রভুর কান্থা খড়ম প্রভৃতি অনেক নিদর্শনই পাওয়া যায়। সুতরাং মহাপ্রভুর বিস্তৃত ভাবে ইতিহাস লিখিবার যাহা কিছু উপকরণ এখনও পর্য্যন্ত তাহা নীলাচলেই আছে। প্রভুর শিক্ষিত ভক্ত সম্প্রদায় এখনও যদি এ দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া এই অমূল্য রত্ন রাজীর রক্ষা কল্পে মনোযোগ দেন তাহা হইলে —উন্নতি ও গৌরবের পরিপন্থা—একটা মহান্ সাধনায় আমরা সিদ্ধ হইতে পারিব।

(২)

আমাদের এই পবিত্র দেশে সংযম সাধনাই চরম লক্ষ্য ছিল—ভোগ বিলাসের কথা তাহাতে স্থান পাইত না। হিন্দুস্থান আত্মসুখের জন্য কখনও লালায়িত ছিলনা, ত্যাগেই তাহাদের আনন্দ ফুটিয়া উঠিত। আর তাই স্বার্থ ত্যাগী দরিদ্র ব্রাহ্মণই তাহাদের শিরোভূষণ ছিল। সে সমাজে

কাঞ্চন অবজ্ঞেয় না হইলেও—কাঞ্চন-কৌলীন্য স্বীকৃত হয় নাই। হিন্দু-রাজা সত্যরক্ষার্থে পত্নী-পুত্র পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়াছেন; শরণাগত সামান্য একটী পায়রাবতের প্রাণ-রক্ষার্থে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। আর হিন্দু রমণীর পতি-ভক্তির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত না হয় এখানে না-ই তুলিলাম।

অধিক দিনের কথা নহে ৫০ বৎসর পূর্ব্বেও যাহা ছিল, এখন তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। তখন প্রায় প্রতি গ্রামেই অতিথিশালা ছিল। প্রত্যেক গৃহস্থই অতিথিসেবা করা পরম পুণ্য কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। উচ্চবর্ণের গৃহে ক্রিয়া কর্ম্ম উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া নীচ জাতিগণ আগমন করিলেও গৃহস্বামী ও তাঁহর আত্মীয় স্বজন সকলের নিকটই করজোড়ে ত্রুটীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন। অতিথি যে নারায়ণ—এ জ্ঞান, এ অপূর্ব্ব সামাজিকতা অন্য কোন দেশে নাই।

তখন অধ্যাপকগণ অন্নদান ও বিদ্যাদান মহাপুণ্য কার্য্য বলিয়া জানিতেন, এখন তাঁহাদিগকে স্বীয় উদরান্নের জন্যই দাসত্ব স্বীকার করিতে হইতেছে। তখনকার নির্দ্দোষ আমোদ আহ্লাদ, যাত্রাগান, সকল কার্য্যে একপ্রাণতা এ সমস্ত এক্ষণে স্বপ্ন বলিয়াই বিবেচিত হয়।

মাতা পিতা প্রভৃতি গুরুজনবর্গকে তখনকার লোকে যেমন ভক্তি-শ্রদ্ধা করিত এখন তাহা বিরল হইয়া আসিতেছে। আমরা জগৎস্বামী শ্রীশ্রীচৈতন্য-দেবের জীবনী আলোচনা করিয়া জানিতে পারি, তিনি প্রত্যেক কার্য্যেই জননীর মতামত গ্রহণ করিতেন। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার সময় মাতার অনুমতি লইয়াছিলেন আবার সন্ন্যাসের পর যাত্রাকালেও মাতার মত জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন। মাতা চিন্তা করিয়া নীলাচল বাসের অনুমতি দিলেন কিন্তু একমাত্র পুত্রকে ছাড়িয়া কিরূপে গৃহে থাকিবেন ইহা ভাবিয়া অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন, তাহাতে প্রভু বলিলেন—মা তুমি দুঃখ করিও না, আমি তোমাকে ছাড়িয়া কখনও থাকিব না। আমার জন্য যখনই তোমার উদ্বেগ বাড়িবে তখনই দেখিবে আমি তোমার নিকটে আছি। বিশেষতঃ তোমার প্রদত্ত অন্ন-ব্যঞ্জন ভোজনে, নিতাইর নৃত্যকালে এবং রাঘব-ভবনে আমি সর্ব্বদাই উপস্থিত থাকিব। শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার কথা রাখিয়া ছিলেন। জগৎকে শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি শিখাইবার জন্য লীলায় সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু মাকে কোন দিনই ভুলেন নাই। বৎসর বৎসর জগদানন্দকে মাতার তত্ত্ব লইতে পাঠাইতেন। নবদ্বীপ হইতে নীলাচলে কেহ আসিলে সর্ব্বাগ্রে মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করিতেন—প্রভুর আমাদের মাতৃভক্তি

অসাধারণ ছিল। অতীতের কথা অনন্ত হইয়াই মনে জাগে কিন্তু আজ এই পর্য্যন্ত।

শ্রীভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা।

পাগলের উক্তি

হে পথভ্রান্ত পথিক! জীবনের শুভ সূত্রপাত হইতেই তো তুমি চলিয়াছ, কিন্তু একবারও কি ভাবিয়া দেখিয়াছ যে, কোথায় যাইতেছ? তোমার গন্তব্য· স্থানই বা কোথায়? আর কিজন্যই বা তুমি এমন দেবদুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম পাইয়াছ? কোন বস্তুর প্রত্যাশায় ইতঃস্তত ছুটাছুটি করিয়া ক্লান্ত হইতেছ এবং কোন বস্তু পাইলেই বা তোমার চিরসঞ্চিত আশা পূর্ণ হইবে? এসকল প্রশ্ন কি কখনও তোমার হৃদয়ে উঠিয়াছে?

মানব মাত্রেরই এবিষয় চিন্তাকরিয়া দেখা উচিত। কেন আসিয়াছি, কেন একার্য্য করিতেছি, তাহা যদি না বুঝি—না জানি তবে যথার্থই যেন একটা অভাব থাকিয়া যায়। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারাযায় যে, সকলেই সুখের জন্য লালায়িত, কিসে আমার শারিরীক সুখ হইবে, কিসে পারিবারিক সুখ পাইব, কেমন করিয়া আমার সংসার মধ্যে সুখের অফুরন্ত স্রোত ছুটাইয়া দিতে পারিব এই ভাবের নানা চিন্তাতেই মানুষ ব্যস্ত। কিন্তু হয়তো কেহ ইচ্ছামত সুখভোগ করিবার অবসর পায়, কেহ পায় না, যে পায় তাহারও কি ভোগ করিয়া ভোগের ইচ্ছা মিটিয়া যায়? না— তাহা যায় না—বলিতেগেলে বলিতেহয় তাহা যাইতেও পারে না। আজ যার কিছু নাই সে সামান্য কিছু পাইবার প্রত্যাশাকরে কিন্তু যেমন কিছু পায় অমনি তাহাতে বিতৃষ্ণা আসিয়া তদতিরিক্ত কিছু পাইবার জন্য লালায়িত হয়! শাস্ত্রও তাহাই বলিয়াছেন :—

নিঃস্বোপ্যেকশতং শতী দশশতং লক্ষং সহস্রাধিপো
লক্ষেশঃ ক্ষিতিপালিতাং ক্ষিতিপতিশ্চক্রেশতাং কাঙ্খতি।
চক্রেশঃ সুর রাজতাং সুরপতি ব্রহ্মাস্পদং বাঞ্ছতি
ব্রহ্মা শিবপদং শিব বিষ্ণুপদং তৃষ্ণাবধিকোগতঃ॥

এইতো :শাস্ত্রের কথা, কিন্তু ভ্রান্ত মানব! এ কথাগুলি কি একবারও

তোমার চিন্তার মধ্যে আসে ? না আসুক, কিন্তু তুমি কি মনে কর এইভাবে সুখভোগ চিরদিন করিতে পারিবে ? না তাহাও ত পারিবে না !—

"সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখং।
চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ ॥

সুখ কি তোমার চিরকাল থাকিবে ? না তাতো থাকিবে না। সুখের অন্তরালে ঐ যে দুঃখের ভীষণ অন্ধকার দেখা যাইতেছে।

এমন একদিন অবশ্য আসিবে, যে দিন সাংসারিক সমস্তসুখভোগ তোমাকে বাধ্য হইয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে, সেদিন কোথায় রহিবে তোমার গৃহ পরিজন, কোথায় রহিবে তোমার ভোগবিলাসের সামগ্রী। যে গৃহপ্রাঙ্গণ আজ তোমার আনন্দ ধ্বনিতে পূর্ণ, উহাই একদিন আত্মীয় স্বজনগণের হাহাকার রবে পূর্ণ হইবে, স্নেহের পুতুলি পুত্রকন্যা, প্রিয়তমা ভার্য্যা, স্নেহময়ী জননী প্রভৃতির শোকাশ্রুতে ধরাতল অভিষিক্ত হইবে। ভাবুক কবি যথার্থই গাহিয়াছেন

"একদিন হায় এমন হবে এ মুখে আর ব'ল্‌বে না।
এ হাতে কাজ ক'রবে না ভাই এ চরণ আর চ'লবে না ॥
নামধ'রে ডাকবে সবে শ্রবণে তা শুনবে না
পুত্র মিত্র জগৎচিত্র নেত্র তোমার হেরবে না।
অবশ হবে এ রসনা আস্বাদন আর পাবে না।
ভাল মন্দ কোন গন্ধ নাসিকাতে লবে না ॥
রাজ সিংহাসন ছাই মাটি বন এ বিচার আর থাক্‌বে না।
বন্ধনে দহনে দেহে যাতনা জানাবে না ॥
হবে সাঙ্গ অবশাঙ্গ সঙ্গে কিছু যাবে না।
এইবেলা ডাক ডেকে নে ভাই, সময় গেলে আর হবে না ॥"

এসকল শুনিয়া হয়তো তুমি বলিবে তবে প্রকৃত সুখ কোথায়ও নাই ; কিন্তু শাস্ত্র বলিয়াছেন :—

"ধর্ম্মাদ্ধিসুখং" ধর্ম্মাচরণেই প্রকৃত সুখ। আর ধর্ম্মহীন মনুষ্য, মনুষ্যপদ বাচ্যই নয়। নীতিশাস্ত্রকার বলেন :—"ধর্ম্মেন হীনা পশুভিঃ সমানা"

আহার নিদ্রাদি পশু পক্ষিতেও যেমন আছে মনুষ্যতেও তেমন আছে এ সকল ব্যাপারে মানুষ শ্রেষ্ঠ নয় একমাত্র ধর্ম্মই হইল মানবের মানবত্বের প্রধান উপকরণ। ভাই ! যদি সুখ চাও, আর কোথায়ও সুখ পাইবে না। সুখ এক মাত্র ভগবৎ আরাধনায়—ভগবৎ প্রীতিতে।

জগতে আসিবার সময়ও একা আসিয়াছ যাইতেও হইবে একা। সঙ্গে যাইবে মাত্র নিজ নিজ কর্ম্ম—আর পর জন্মে সেই কর্ম্মফলানুযায়ী সুখদুঃখ ভোগ হইয়া থাকে। অসৎকর্ম্মবসে দুঃখ ও সৎকর্ম্মবসে সুখ, এইতো শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। তাহা হইলেই এমন কাজ করিয়া জীবনাতিবাহিত করা উচিত যাহার ফলে ইহজীবনেও সুখ পর জীবনেও সুখ, ভোগ হয়।

শ্রী—পাগল।

বস্ত্রহরণ ও শ্রীরাসলীলা

ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের সমুদ্ভবে জীব-হৃদয় যখন একান্ত কাতর ও ব্যথিত হয়, তখনই ধর্ম্মের সংস্থাপন, অধর্ম্মের বিনাশ, দুষ্টের দমন ও সাধুদিগের পরিত্রাণের জন্য ভগবান যুগে যুগে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। অগাধ-বোধ্য যোগী-হৃদয়ে মুনির নির্ম্মল মানসে তাঁহার স্বরূপ ও সত্ত্বার আভাস মাত্র প্রতিভাত হয়, কিন্তু ভক্ত-হৃদয়ই তাঁহার প্রিয়তম বিশ্রামের স্থান। এই সত্ত্বনিধি শ্রীভগবানের অসংখ্য অবতার, যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া ভূভার হরণাদি কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন।

নিত্যধামে নিত্যলীলাময় শ্রীভগবান, প্রিয় পরিজন ও পার্ষদগণ সহ বাল্য, পৌগণ্ড ও কৈশোরময় অনন্তলীলা প্রকটন করিয়া বিহার করিয়া থাকেন। সর্ব্বযুগে সর্ব্বকালে তাঁহার স্বয়ং অবতরণ সংঘটন হয় না; তাঁহার স্বয়ং আবির্ভাব কালে যুগাবতারগণ তাঁহাতেই অন্তর্নিবিষ্ট হয়েন।

দ্বাপরের অন্তঃভাগে মহীপাল রূপধারী দৈত্যগণের প্রবল পীড়নে ও তাহাদের শত শতাযুত সেনাগণের ভূরিভারে বসুমতী প্রকম্পিতা হইতে লাগিলেন। এই অত্যাচার-স্রোত-কাতরা ধরণীদেবী গো-মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক ব্রহ্মার সমীপে অশ্রুমুখী হইয়া নিজ দুঃখবার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিলেন। ধরণীর দুঃখ-বার্ত্তা শ্রবণে সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা করুণার্দ্র হৃদয়ে দেবগণ সমভিব্যাহারে ভগবান ত্রিলোচনকে সঙ্গে করিয়া ক্ষীর-পয়োধি-তীরে যাত্রা করিলেন এবং জগৎপতি দেব দেব কামবর্ষী ক্লেশনাশন পরমপুরুষকে পুরুষসূক্ত নামক বেদমন্ত্র দ্বারা সমাহিত চিত্তে স্তব করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে গগন-মণ্ডলে সমুচ্চারিত অশরীরি বাণী শ্রবণ করিয়া দেবগণকে নিকটে আহ্বান

পূর্ব্বক বলিলেন, পরম পুরুষ ভগবান যেরূপ আদেশ করিয়াছেন তদনুরূপ অনুষ্ঠান কর। ধরণীর দুঃখবার্ত্তা পুরুষোত্তম পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন সেই ঈশ্বরের ঈশ্বর নিজ কালশক্তি সহকারে ভূভার হরণের জন্য যতদিন ভূতলে বিচরণ করেন, তোমরাও তদংশ সম্ভূত দেবগণ তৎপার্ষদবৃন্দের সহিত যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়া তাবৎকাল অবস্থান কর। পরম পুরুষ মথুরা মণ্ডলে বসুদেব গৃহে অবতীর্ণ হইবেন, অমর স্ত্রীগণ তদীয় প্রিয় কার্য্য সাধনার্থ তথায় জন্মগ্রহণ করুন। সহস্রবদন অনন্তদেব শ্রীবলরাম তাঁহার প্রিয় সাধন মানসে তাঁহার অগ্রজ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন এবং ভগবতী বিষ্ণুমায়াও প্রভু-শক্তি দ্বারা কার্য্য বিশেষ সংসাধনার্থ জন্মগ্রহণ করিবেন।

প্রজাপতি ব্রহ্মা দেবগণকে এই আদেশ দানে, এবং ধরণীকে সান্ত্বনা বাক্যে আশ্বস্ত করিয়া স্বধামে প্রস্থান করিলেন।

শ্রীভগবান কোন্ প্রয়োজনে কি কার্য্য সাধন করেন তাহা ক্ষুদ্র মানব-বুদ্ধির অগোচর। সেই অসীম অনন্ত কৃপাজলধির সমাচার আমাদের ধারণাতীত। দশ হস্ত রজ্জুবদ্ধ জীব দশ হস্তের অধিক অতিক্রম করিতে কোন ক্রমেই সমর্থ নহে। দারুণ অবিশ্বাস, বিশ্বাস পথে দণ্ডায়মান হইয়া আমাদের গতিরোধ করিয়া রাখিয়াছে। ডুবিয়া যাউক জীবের এই গভীর অবিশ্বাস। অনন্ত বিশ্বাস সমুদ্রের মহাকাল সমুদ্রে জীব একটী জলবুদ্‌বুদ্‌মাত্র, শত-কোটী সহস্র-কোটী মুখ ব্রহ্মার জীবনীও এই অকূল কাল-সমুদ্রের অতল তলে তলাইয়া রহিয়াছে।

নিগূঢ় ব্রজলীলার গুঢ় মর্ম্ম সূত্ররূপেই শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত হইয়াছে। উহাতে শ্রীভগবানের ভগবত্ত্বাই বিশেষরূপে বর্ণিত, লীলা-রস-মাধুরী তাদৃশ স্ফুটতর নহে।

একদিন সুরধুনী তীরে ভাগ্যবান রাজা পরীক্ষিত শুকমুখচ্যুত এই গলিত অমৃত পান করিয়া প্রায়োপবেশন জনিত ক্লেশ ও তক্ষক দংশন ভীতি বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তৎকালে ব্রজ-রসের নিগূঢ় মর্ম্ম বুঝিবারমত লোকের সংখ্যা অতি অল্পই ছিল। জ্ঞান, যোগ, কর্ম্ম, আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি ও মোক্ষ কর্ম্মই বিশেষ ভাবে সমাচরিত হইত। ব্রজ-সুধারস পানে পরিশুষ্ক কণ্ঠ সুশীতল করা অনেকের ভাগ্যেই ঘটে নাই। বেদপরায়ণ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ শুষ্কজ্ঞান চরু ও হোমকেই সাধনার অঙ্গ ভ্রমে সাধ্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। যে ভুবনমোহন রূপ দর্শন করিয়া গো, মৃগ, দ্বিজ ক্রমের হৃদয়েও পুলক

বিভ্রম উপস্থিত হয় সেই ত্রৈলোক্য সুভগ পরম বাঞ্ছনীয় রূপ মাধুরী কাহার হৃদয় না সম্মোহিত করে। এই জড়চিত্ত, চিন্ময় জ্যোতির বিমল আলোকে আলোকিত না হইলে সেইরূপ দর্শনের সৌভাগ্য জন্মে না। "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং" এই স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণই রস স্বরূপ, রসের বিষয় ও আশ্রয়। আমরা এই বিষয় ত্যাগ করিয়া অবিষয়কে বিষয় জ্ঞানে বিষম ভ্রমে পতিত ও ত্রিতাপ জ্বালায় নিরন্তর পরিদগ্ধ হইতেছি। শান্তিহারা নরনারীর হৃদয় জুড়াইবার স্থান নাই। জড়রূপের চরণ তলে আত্মবিক্রয় করিয়া আমরা বসিয়া আছি, রসের অনুসন্ধানে ইতঃস্তত ধাবমান হইয়া অসার রসহীন শুষ্ককণ্ঠ হইয়া কাতরে ক্রন্দন করিতেছি। গন্ধের অনুসন্ধানে দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করিয়া হরিণের দশা প্রাপ্ত হইতেছি, শব্দের অনুসন্ধানে ভ্রাম্যমান হইয়া ব্যাধবাণ-বিদ্ধ কুরঙ্গীর দশাগ্রস্ত হইতেছি। স্পর্শ লোভে ব্যাকুল প্রাণে সুখস্পর্শ জ্ঞানে বিষবৃক্ষসঙ্গ লাভ করিয়া হতজ্ঞান হইতেছি—জুড়াইবার স্থান কোথায়ও নাই!

যাঁহার জ্যোতিকণা হৃদয়ে ধারণ করিবার জন্য যোগী যোগ নয়নে জাগিয়া অবস্থিতি করিতেছেন, জ্ঞানী জ্ঞানানলে বিশ্বভস্ম করিয়া বিভূতিভূষণে ভূষিত হইয়াছেন, যাঁহাকে মনে মনন করিয়া মুনিগণ মৌন, তাপস তপস্যারত, সর্ব্বরূপ-সার সেই শ্যামলসুন্দর রূপ, সেই ভুবন মোহন কৃষ্ণরূপ যাহার নয়ন পথে পতিত হইয়াছে তাঁহারই জীবন জনম ও নয়ন সার্থক।

যে হেরেছে তার ললিত ত্রিভঙ্গ,
গৃহ সুখ তার হইয়াছে ভঙ্গ,
উড়্ মন পাখী পিঞ্জরেতে থাকি
উদাসে ছুটিবে গগন পার।
করিতে সন্ধান কাতর পরাণ
সে জনে, যে জন (প্রাণ) হ'রেছে তার।

যে রূপের আকর্ষণে বিশ্ব আকৃষ্ট, পবন তপন ভ্রাম্যমান, যে রূপের কণিকা-পাতে সপ্তসিন্ধু উথলিত, যাঁহার পদারবিন্দ নিঃসৃত তুলসী সৌগন্ধে সনকনন্দনা-দির চিত্ত বিমোহিত, যাঁহার বংশীধ্বনি শ্রবণে বিধাতা বিস্মিত, মুনিগণ-চিত্ত বিমুক্ত পথে স্বরানুসন্ধানে অনুব্রত, কোটীচন্দ্র সুশীতল যাহার অঙ্গ, মদন সন্তাপ জুড়াইবার সেই অমোঘ ঔষধি, সেই সুকোমল চরণ তল ভিন্ন ব্রজাঙ্গনার আর স্থান কোথায়?

অরূপের রূপের আলোকে গোপী-পতঙ্গ প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া পূত ও পবিত্র হইয়াছেন। এই শ্যাম-স্নিগ্ধ-ঘনদ্যুতি-পরিমণ্ডিত রূপ রতন, কত প্রেমের বিভাবনে, তারুণ্য কারুণ্য এই লাবণ্যামৃতে উদ্ভাসিত বদন কমল লইয়া প্রকটিত হইয়াছেন। ভক্তগণের অন্তরের গুঢ়ধন এই রূপরতন, প্রকটলীলা হইতে প্রপঞ্চে সমুদিত। "যেরূপ নেহারি, নিজে মত্ত হরি বাঞ্ছা করে নিজে নিজ আলিঙ্গন" সেই সর্ব্বচিত্তাকর্ষক রূপ গোপীগণের চিত্ত হরণ করিবে ইহা আর আশ্চর্য্য কি ?

গোপীগণ সামান্যা রমণী নহেন, আনন্দ-চিন্ময়-রস-ভাবিতা মধুর মুরতি সকল নব নটবর কিশোর সুন্দরের নরলীলায় সহায়তাকারিণী গোপীনাম ধারিণী শ্রীকৃষ্ণ বল্লভা, আভীর কিশোরা, "কত যুথ তার" না যায় গণন। নিত্য প্রিয়াগণ ব্যতীত কত শ্রুতিচরী, ঋষিচরী, সাধন সিদ্ধ মুনি ঋষি ও দেবকন্যাগণ দেব দেব অখিলপতি ভগবান গোপীজন বল্লভের সহিত গোপাঙ্গনা রূপে ভূলোকে অবতীর্ণা হইয়া মধুর প্রেমের লীলাভিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই ভুবন মোহন রূপে পুরুষ যোষিৎ কাহার না চিত্ত সমাকৃষ্ট হয়! দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণের চিত্ত রাম রূপে হরণ করিয়াছিল। তাঁহারা নিজের অস্তিত্ব ভুলিয়া স্ত্রীরূপে সেই রামরূপে বিলাস বাসনা করিয়াছিলেন। তাঁহারাই ঋষিচরী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। শ্রুতিময়ীগণ এ পর্য্যন্ত স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিতি করিয়া শ্রীভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন এবার ভগবান গোপ তাঁহারা গোপী।

অনেক দিনের কথা নহে, রাধা ভাব কান্তি ভাবিত শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর সিন্ধুতটে গম্ভীরা মন্দিরে, স্বরূপ রামানন্দ সহ নিভৃতে দিবানিশি যে রসের আস্বাদন করিয়াছেন, যাহার কণিকা প্রসাদে জগৎ পরিতৃপ্ত, সেই "অনর্পিতচরীং চিরাৎ" মধুরোজ্জ্বল রসের আস্বাদনে ভক্তদিগকে পরিতৃপ্ত করিতে কৃপাপূর্ব্বক যে গৌরহরি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনিই সেই ব্রজের হরি গোপীগণের প্রাণ বল্লভ শ্যামলসুন্দর। যিনি বুঝিয়াছেন তিনিই গাহিয়াছেন, "যদি গৌর না হইত, কেমন হইত, কেমনে ধরিতাম দে"। আমরাও সেই সুরে সুর মিলাইয়া গাহিতেছি "যদি গৌর না হইত" শ্রীরাধার প্রেম মহিমা ও রসসার মাধুর্য্য রসের আস্বাদন দানে তবে কে আর এই ত্রিতাপদগ্ধ জগতকে সুশীতল করিত। মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের প্রখর কিরণ হিমাংশুর সুশীতল কিরণ পাতে প্রশমিত না হইলে কি ব্রজলীলা এত মধুর হইত ?

দুর্ঘট-ঘটন পটীয়সী শ্রীভগবানের অচিন্ত্য স্বরূপ চিৎশক্তিই যোগমায়া নামে

অভিহিতা। যাহার মায়ায় সর্ব্বজ্ঞ সর্বৈশ্বর্য্যশালী পূর্ণকাম পূর্ণ ভগবান অসর্ব্বজ্ঞ ও মুগ্ধের ন্যায় আচরণ করিয়াছেন সেই যোগমায়ার প্রভাব কথায় কি প্রকাশ হইবে। শ্রীচরিতামৃতকার বলিয়াছেন—

মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতিভাবে।
করিবেন যোগমায়া আপন প্রভাবে।
আমিও না জানি, না জানে গোপীগণ।
দুঁহার রূপগুণে দুঁহার নিত্য হরে মন॥

যোগমায়াই ব্রজলীলার দূতি, এ খেলা তাঁহারই, নতুবা স্বয়ং ভগবান মুগ্ধের ন্যায় শীতের রাত্রিতে কাঁপিতে কাঁপিতে জটিলার মন্দিরের নিকটস্থ বদরীবৃক্ষ মূলে দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীরাধার কঙ্কণঝঙ্কারে জটিলার জাগরণ আশঙ্কায় ভীত চিত্ত হইবেন কেন? বাল্যলীলায় পুতনাবধ, শকট ভঞ্জন, বদনে ব্রহ্মাণ্ড দর্শন, যমলার্জ্জুন পাতন প্রভৃতি কতই ঐশ্বর্য্য লীলা প্রকট করিয়াছেন। ব্রজবাসী স্বচক্ষে দেখিয়া অন্তরে বুঝিয়াও বুঝিতে পারেন নাই। মাতা যশোমতী দামদ্বারা দামোদরকে বন্ধন করিতে গিয়া বুদ্ধি হারাইয়া ছিলেন তথাপি কৃষ্ণকে "আমার গোপাল ভিন্ন" ভাবিতে পারেন নাই। যাঁহার পদরজ শিব বিরঞ্চি বাঞ্ছিত, বলদেব ও লক্ষ্মীর মস্তক ভূষণ তীর্থের মহীতীর্থ, নন্দের বাধা মস্তকে ধারণ করিয়া সে কতই আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। তথাপি নন্দ তাঁহাকে নন্দলালা ভিন্ন ভাবিতে পারেন নাই।

অর্জ্জুন যে বিশ্বময়ের বিশ্বরূপ দর্শনে স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি হইয়াছিলেন, যে ভগবান পরিহাসচ্ছলে পরিত্যাগ করিবেন ভয় দেখাইলে দেবী রুক্মিণী দুঃখ, ভয় ও শোকে ম্রিয়মাণা হইয়া ধরায় পতিতা হইলে তাঁহার হস্তের বীজন ও বলয় কোথায় ছুটিয়া পড়িয়াছিল, দেবকী বসুদেব প্রণত যে পুত্রদ্বয়কে ভগবান জ্ঞানে আলিঙ্গন করিতে শঙ্কিত হইয়াছিলেন, সেই শ্রীভগবান আবার শ্রীদামাদি রাখাল বালকের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাহাদিগকে স্কন্ধে করিয়া বহন করিয়াছেন। সৌভাগ্য গর্ব্বগর্ব্বিতা গোপীগণ "ন পারয়েহহং চলিতুং" বলায় ভগবান তাঁহাগিকে স্কন্ধে করিয়াও বহন করিয়াছেন। কি আশ্চর্য্য রসের কতই বৈচিত্র, একস্থানে ভয় ও সম্ভ্রমযুক্ত নতি প্রণতি অন্যস্থানে পরম আত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার। রসই জগতের সার বস্তু, রসহীন হইলে সকলই নীরস। যে আনন্দ চিন্ময় রস হইতে অখিল

জগতের উৎপত্তি; জীব তাহা হইতেই জাত, জীবিত ও তাহাতেই প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে। জীবহৃদয় এই রসানন্দ পান করিবার জন্যই ব্যাকুল। অখিল ব্রহ্মাণ্ডের জীব ইহাই লক্ষ্য করিয়া অজানিত পথে ধাবিত হইতেছে।

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি" ইত্যাদি। বৃন্দাবন লীলা মধু হইতে সুমধুর, প্রেমানন্দরসের শেষ লীলা, যেখানে স্বয়ং ভগবান মুগ্ধ, সেখানে অন্যে সম্মোহিত হইবে ইহাতে আর বৈচিত্র কি আছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রামানন্দ রায়কে সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে, রামানন্দ রায় স্তরের পর স্তর অতিক্রম করিয়া যে তত্ত্বে অবশেষে উপনীত হয়েন সাধন-তত্ত্বের ও রস তত্ত্বের তাহাই শেষ সীমা। রামানন্দ রায়ের মুখে "ব্রহ্ম-ভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।" শ্লোকে যাহা ব্রহ্ম জ্ঞানীর চরম অবস্থা শ্রবণ করিয়া 'ইহ বাহ্য' বলিয়া মহাপ্রভু উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ধ্যান, জ্ঞান ও কর্ম্মকাণ্ড সকল কাণ্ডের পর পারেই এই রসামৃত অবস্থিত। যখন মহাপ্রভু রামরায়ের মুখ হইতে পুনরায় "কৃষ্ণভক্তি রসভাবিতা মতি ক্রীয়তাম্" শ্লোক শ্রবণ করিলেন, তখন তাহাতে কিঞ্চিৎ সম্মতি প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিলেন "এহ হয় আগে কহ আর"। শান্ত চিত্ত মুনিগণ তাঁহাদের পরম শান্ত মানসে ভগবানের সত্তার আভাস মাত্র উপলব্ধি করিয়া সুস্থ চিত্ত হইয়াছেন, প্রকৃত প্রস্তাবে ভগবানের সহিত তাঁহাদের কোন বিশেষ সম্বন্ধই সংস্থাপিত হয় নাই। "সম্বন্ধে বিবদ্ধ হ'লে কৃষ্ণসনে, কৃষ্ণ তারে ভাবে বলি নিজ জনে।" দাস্যভাব হইতেই এই সম্বন্ধ আরম্ভ, তাহার পর সখ্যে গাঢ়তর, ও দৃঢ়তর, বাৎসল্যে তদপেক্ষা অধিক গাঢ় ও দৃঢ়, মধুরে মধুরতর এবং পরিশেষে ভাবময়ীর মহা-ভাবেই তাহার পরি সমাপ্তি। কোটী ভাব-দেহে শ্রীমতী যে ভাব ধারণ করিতে গিয়া আত্মহারা হইয়া পড়েন, যাহা সখিগণেরও অবোধ্য জীবের সাধনার গতির দৌড় আর কত দূর যে তাহা বুঝিতে সমর্থ হইবে। জগতে দম্পতি প্রেমের সেই কলিকায় এক বিন্দুপাতে ভাষায় কিঞ্চিন্মাত্র আভাস অনুভূত হইতে পারে। সেই ভুবন সুন্দর পরমসুন্দরকে হৃদয়ে স্থান দিতে কোন সুন্দরীই না ইচ্ছা করেন। "এ হেন সুন্দরে, পরম আদরে হৃদে আছে যার স্থান। রাখুক যতনে মানিকরতনে, করিয়া সর্ব্বস্ব দান॥" শুকদেব বলিলেন,—

"হেমন্তে প্রথমে মাসি নন্দব্রজকুমারিকাঃ।
চেরুর্হবিষ্যং ভুঞ্জানাঃ কাত্যায়ন্যর্চ্চনব্রতম্॥" ভাঃ ১০।২২।১

হেমন্ত ঋতুর প্রথম অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসে নন্দরাজের ব্রজবাসী কুমারী সকল কাত্যায়নী দেবীর অর্চনা রূপ ব্রত আচরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা অরুণোদয়ে কালিন্দী সলিলে অবগাহন পূর্ব্বক তত্তীরে কাত্যায়নী দেবীর বালুকাময়ী প্রতিমা সংস্থাপন করিয়া গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা দেবীর অর্চনা করিয়াছিলেন। প্রতিদিন অরুণোদয়ের পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিয়া নিজ নিজ নামোচ্চারণ পূর্ব্বক সকলকে জাগাইয়া উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণগুণ গান করিতে করিতে যমুনাতীরে উপনীত হইয়া স্নানান্তর পূজাকালে দেবীর নিকট যে প্রার্থনা করিতেন তাহাতে তাঁহাদের অন্তরের কামনা ব্যক্ত হইয়াছে।

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ। ভাঃ ১০।২২।৪

(করে) কাত্যায়নী ব্রত নন্দ-ব্রজবালা।
ধূপ দীপ গন্ধে ভরি, পুষ্পে ডালা॥
বলে মাতঃ দেহ শ্যামে পতি দান।
জগৎ অম্বিকে, ভুবন পালিকে,
জানত জননি অবলার প্রাণ॥
শ্যাম সুধাকর অন্তর কামনা।
দেমা কৃপাকরি ওমা সবাসনা॥
মহা যোগিনীর তুমি অধীশ্বরি।
কর বন্ধ, সূত্রে মহামন্ত্র করী॥
মায়া জালে তব বিশ্ব বিমোহিত।
বিধি বিষ্ণু শিব চরণে প্রণত॥
কর়মা প্রসাদে নাশমা বিষাদে।
পাই যেন হৃদে নন্দকুল চাঁদে॥
শ্যাম সোহাগিনী যেবা নারী হয়।
ধন্য ভাগ্য তার ধন্য বলি তায়॥
শ্যাম-সিন্ধু জল পরম শীতল।
শ্যাম-কান্তি ভরা এ মহী মণ্ডল॥
শ্যাম শ্যাম শ্যাম নামে ভরে প্রাণ।
দেমা শ্যামা শ্যামে নয়নাভিরাম॥

শ্যাম অঙ্গ নহে　　প্রাকৃতে গঠিত।
প্রতি অঙ্গ তার　　অমৃতে পূর্ণিত॥
নহে নিরাকার　　চিন্ময় সাকার।
নর বপু ধারী　　নব নটবর॥
বৃন্দারণ্য মাঝে　　আছে মাগো সে যে।
মন্মথ-বিজয়ী　　বীর রাজ সাজে॥

এই মন্মথ-বিজয়ী বীররাজকে কোন্-গোপ-কুমারী হৃদয়রাজ রূপে পূজা করিতে বাসনা না করিয়া থাকিতে পারেন। দেবীর নিকট তাঁহাদের প্রার্থনা সর্ব্বকাম দাতা বরদাতার চরণতলে অগ্রেই পৌছিয়াছে। বরদাতা আজ স্বয়ং বররূপে ব্রতান্তে কালিন্দীতটে সখাগণসহ সমুপস্থিত, ব্রতের ফল বুঝি হাতে হাতেই ফলিল।

ব্রজবালাগণ যমুনা তটে আপন আপন বসন রাখিয়া স্নানার্থে জলে অবতরণ করিয়াছিলেন, স্নানান্তে দেখিলেন যে, তীর হইতে তাঁহাদের সমুদয় বস্ত্র অদর্শন হইয়াছে এবং সম্মুখের নীপশাখায় চিত্র বিচিত্র রূপে শোভিত হইতেছে। তাঁহাদের চিত্ত-চোর বসনচোর রূপে নীপশাখায় বসিয়া মৃদু মন্দ হাস্য করিতেছেন এবং নিক্বণরবে বংশী বাজাইতেছেন। সঙ্গে সখাবৃন্দ, কুমারীগণ প্রমাদ গণিলেন। আকণ্ঠ সলিল-নিমগ্না হইয়া থর থর কাঁপিতেছেন কিন্তু তীরে উঠিবার কোন উপায় নাই। লজ্জায় ম্রিয়মানা হইয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন—

সখি, সন্তরণ দিলে　　যমুনার জলে,
জলধর হাসে　　কদম্বের ডালে।
আঁখি মুদিত করে　　জলে ডুবলে পরে,
কমল আঁখি　　হৃদয় কমলে।
চরণে চরণ　　ছাঁদিয়া দাঁড়ায়,
সঘনে বদনে　　বাঁশরী বাজায়।

আজ কি বিপদে, কি লজ্জায় পাতিত করিয়া ভগবান এই ভাগ্যবতী গণকে কোন অসামান্য সম্পদ প্রদান করিবেন তাহা বাঞ্ছাকল্পতরুই অবগত আছেন। তাঁহাদিগকে শীতার্ত্ত এবং হত বুদ্ধি দেখিয়া ভগবান তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, হে অবলাগণ! তোমরা ব্রত-শ্রান্ত হইয়াছ, শীতে অকারণ কষ্ট পাইতেছ কেন, উঠিয়া স্ব স্ব বস্ত্র গ্রহণ কর, আমি উপহাস করিতেছি না বা মিথ্যা

বলিতেছি না, এবং এই সকল গোপ বালকগণকে জিজ্ঞাসা কর আমি কখনও মিথ্যা বলি নাই। শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ পরিহাস শ্রবণে প্রেম পরিপ্লুতা কুমারী সকল পরস্পর পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিয়া লজ্জিতা ও হাস্যমুখী হইয়া জল হইতে নির্গত হইতে সমর্থা হইলেন না এবং পরিশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া ভগবানকে সম্বোধন পূর্ব্বক বিনীত ভাবে বলিলেন, হে শ্যামসুন্দর। আমরা তোমার দাসী, তুমি যাহা বলিবে তাঁহাই করিব। আমরা শীতে কম্পান্বিত কলেবর হইয়াছি তীরে উঠিতে পারিতেছি না। হে ধর্ম্মজ্ঞ, অন্যায় আচরণ করিও না, আমাদের বস্ত্রগুলি প্রদান কর। কেহ কেহ একটু ক্রোধ ভাব দেখাইয়া বঙ্কিম নেত্রে বলিলেন হে কৃষ্ণ, আমাদের বস্ত্র প্রদান কর নতুবা ব্রজরাজকে তোমার আচরণের কথা বলিয়া দিব। অন্তর্যামী ভগবান তাঁহাদের অন্তরের ভাব বুঝিয়া বলিলেন, যদি তোমরা আমার দাসীই হও তবে আমার প্রতিপালন তোমাদের অগ্রে কর্ত্তব্য। সকলে আসিয়া নিজ নিজ বস্ত্র গ্রহণ কর নতুবা বস্ত্র দিবনা, আমি রাজার ভয় করি না, রাজা আমায় কি করিবেন! তোমরা ব্রতব্রত হইয়া নগ্নাবস্থায় জলে অবগাহন করিয়া দেবতার নিকট অপরাধী হইয়াছ—এই অপরাধ স্খলনের নিমিত্ত এক্ষণে মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক অবনত হইয়া প্রণামান্তর নিজ নিজ বস্ত্র গ্রহণ কর। ভগবানের এই বাক্য শ্রবণে নগ্নাবস্থায় স্নান ব্রতভঙ্গের হেতু জানিয়া এবং এতাদৃশ ক্লেশার্ত্তি স্বীকার করিয়াও অভীষ্ট হইতে বঞ্চিত হইবার ভয়ে ব্রতপূর্ত্তিকামা ব্রজবালাগণ ঐব্রতের এবং সমস্ত কর্ম্মের ফলভূত সর্ব্বাপরাধ নিবর্ত্তক শ্রীশ্রীভগবানকে প্রণাম করিলেন। প্রেমময় ও অপার করুণাশীল ভগবান তাঁহাদের প্রেমের বশ্যতা স্বীকার করিয়া বস্ত্রগুলি প্রদান করিয়া বলিলেন সুন্দরীগণ তোমাদের কাত্যায়নী অর্চ্চন ব্রত সুসিদ্ধ হইয়াছে তোমারা ব্রজে প্রতিগমন কর।

শ্রীভগবানের সর্ব্বগামী চক্ষুর অন্তরালে কোন বস্তুই লুকাইত রহে না। সাললাচ্ছাদনে কি লজ্জা রক্ষিত হইবে? বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বর্ত্তমান থাকিতে শ্রীভগবান কাহাকেও আপনার করেন না। "মান, লজ্জা, ভয়, তিন থাকিতে নয়।" তাই আনন্দরস প্রতিভাবিত তনু ব্রজবালাগণেরও বিড়ম্বনার সীমা নাই। শ্রীভগবানের এই সমস্ত বেদগুহ্য নিগুঢ় লীলারহস্য সাধারণের বোধগম্য নহে পরিশুদ্ধ মানস ঐকান্তিক ভক্ত ও প্রেমিকাগণেরই উহা অনুভবনীয় ও আস্বাদ্য।

ভগবান ব্রজবালাগণকে যেরূপে নাচাইলেন তাঁহারা সেই রূপেই নাচিলেন ; ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার হস্তের ক্রীড়াপুত্তলিকা ঐশ্বর্য্যগন্ধহীন মাধুর্য্য-মুরতি সরলপ্রাণা কুমারিগণকে নাচাইতে তাঁহার কিসের ভাবনা—তাঁহাদের যাহা বুঝাইলেন তাঁহারা তাহাতেই বুঝিলেন। প্রিয়তমের হস্তে লাঞ্ছিত উপহাসিত ও ব্রীড়া প্রাপ্ত হইয়াও তাঁহার প্রতি কোনরূপ দোষ দৃষ্টিই তাঁহারা করেন নাই পরন্তু পরমানন্দ যুক্তই হইয়াছিলেন। প্রিয় সঙ্গমে আকৃষ্টচিত্ত ও লজ্জাবিলাসিত নয়ন কুমারিকা সকল ব্রজে গমন করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াও সেই স্থানেই দণ্ডায়মান রহিলেন। লজ্জায় এখন পর্য্যন্তও যাহা ব্যক্ত করিতে পারেন নাই, প্রাণের কামনা একবার শ্যামসুন্দরের নিজমুখের স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি শুনিয়া যাইবেন। অন্তর্যামী ভগবান তাঁহাদের মনোগত সঙ্কল্প বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন হে সতীগণ, আমাকে পতিরূপে প্রাপ্তিরূপ মনোরথ যাহা তোমরা লজ্জাবশতঃ ব্যক্ত করিতে পার নাই তাহা আমি সমস্তই বিদিত আছি এবং আমি অঙ্গীকার করিতেছি তোমাদের ঐ মনোরথ সত্য হইবার যোগ্য। কারণ আমাতে আবেশিত চিত্ত জীবগণের কাম পুনর্ব্বার সংসার বিষয় ভোগের নিমিত্ত কল্পিত হয় না। ভ্রষ্ট যবাদি পুনরপি ভর্জ্জিত হইলে আর কোনরূপই অঙ্কুরোৎপাদনে সমর্থ হয় না। কামনান্তর রহিত এবং পরম নির্ম্মল ভগবৎ সেবারূপ কামনা—কোন ক্রমেই কর্ম্মবন্ধনের হেতু নহে। হে অবলাগণ তোমরা ব্রজে গমন কর। তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, আগামিনী শারদীয়া রজনীতে আমার অঙ্গ সঙ্গ লাভ করিতে সমর্থা হইবে।

যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমা রংস্যথ ক্ষপাঃ।
যদুদ্দিশ্য ব্রতমিদং চেরুরার্য্যার্চ্চনং সতীঃ॥ ভাঃ ১০।২২।২৭

শ্রীভগবান কর্ত্তৃক এই প্রকার আদিষ্ট ও বরদান দ্বারা প্রাপ্তমনোরথ কুমারী সকল মহৎকষ্টে তদীয় পাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে ব্রজে গমন করিলেন। দেখিতে দেখিতে শরৎকাল সমাগত হইল।

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্ল মল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥ ভাঃ ১০।২৯।১

শ্রীভগবানে অনুরাগিনী গোপী চিত্ত পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার শ্রীঅঙ্গ সঙ্গলাভার্থ সমুৎকণ্ঠচিত্তে অবস্থান করিতেছিল। জাতানুরাগ ভগবান সময় বিশেষ প্রতীক্ষা করিয়া এতাবৎকাল রমণাভিলাষ ব্যক্ত করেন নাই।

অষ্টমবর্ষ বয়সে শরদাগমে কার্ত্তিকি পূর্ণিমায় প্রফুল্ল মল্লিকা সৌরভে সুরভিত রাত্রি সকল দর্শন করিয়া যোগমায়া উপাশ্রয় পূর্ব্বক কৈশোর বয়োধর্ম্মকে সফল করিবার মানসে ব্রজকমলিনীকুল দিনমনিরূপে শ্রীনন্দ নন্দন ব্রজাকাশে উপস্থিত হইলেন।

সোপি কৈশোরক বয়ো মানয়ন্মধুসূদনং।
রেমে স্ত্রীরত্ন কূটস্থ ক্ষপাসু ক্ষপিতা হি সঃ॥

পূর্ণচন্দ্রালোকে আলোকিত বনভূমির অপূর্ব্বশোভা সম্পদ সন্দর্শনে ও অরুণ-রাগ রঞ্জিত বিধুবদন মণ্ডলে রাধাচন্দ্রাননীর বদনকমল সাদৃশ্য অনুমানে বংশীধারী সুলোচনাদিগের মনোহারী মন্মথ-মথনকারী কামময় বেণুগীতে রাগিণী পূর্ণ করিয়া সংগীত আরম্ভ করিলেন।

দৃষ্ট্বা কুমুদ্বন্তমখণ্ডমণ্ডলং রমাননাভং নবকুঙ্কুমারুণম্।
বনঞ্চ তৎকোমল গোভিরঞ্জিতং জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্॥

এই বেণুগীত শ্রবণ করিয়া সর্ব্বকার্য্যের মস্তকে বজ্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক কৃষ্ণ গৃহিত মানসা, লোলন কুণ্ডলা গোপীবৃন্দ ভোজন ভুঞ্জান, দোহন দাহন, সর্ব্ব আরব্ধ কার্য্যের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক অন্যের অলক্ষিতে একান্তচিত্তে সেই কান্ত শ্রীকান্তের চরণ তলে উপনীত হইলেন।

"শরদচন্দ পবন মন্দ, বিপিনে ভরল কুসুমগন্ধ, ফুল্লমল্লিকা মালতী যুথি মত্ত মধুকর ভোরণি। হেরত রাতি ঐছন ভাতি, শ্যাম মোহন মদনে মাতি, মুরলিগান পঞ্চমতান কুলবতি-চিত চোরণি॥ শুনত গোপী প্রেম রোপি, মনহিঁ মনহিঁ আপনা সোপি, তাঁহি চলত, যাঁহি বোলত মুরলীক কল লোলনী। বিছরি গেহ নিজহু দেহ, এক নয়নে কাজর রেহ, বাঁহে রঞ্জিত কঙ্কণ একু, একু কুণ্ডল ডোলনী॥ শিথিল ছন্দ, নিবিকবন্ধ, বেগে ধাওত যুবতীবৃন্দ, খসত বসন রসন চোলি গলিত বেণী লোলনী। ততহিঁ বেলি সখিনী মেলি, কেহ কাহুক পথ না হেরি, ঐছে মিলল গোকুল চন্দ গোবিন্দ দাস গাওনী॥"

গোবিন্দাপহৃতচিত্তা গোপাঙ্গনাগণের চিত্ত রুদ্ধ করিতে কাহারও সাধ্য হইল না। গোপী বিহঙ্গ সকল পিঞ্জর বন্ধন ছিন্ন করিয়া, পতি পুত্রের মায়া চাবে আর ধরা দিল না। কোন কোন অলব্ধ নির্গমা গোপীকা, ধ্যানযোগে ভগবানের পরম সঙ্গম লাভ করিয়া গুণময় দেহ পরিত্যাগ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ তাপের তীব্র সন্তাপে তাঁহাদের শুভাশুভ সকল কর্ম্মই দগ্ধ হইয়াছিল।

কাম ক্রোধ দ্বেষ ও ভয় দ্বারা ভাবিত হইলেও যখন ভগবানে তন্ময়তা প্রাপ্তি সংঘটন হয় তখন অধোক্ষজ হৃষীকেশ গোবিন্দের চরণে যাঁহারা সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াছেন তাঁহাদের আর ভাবনা কিসের !

ব্রজরমাগণকে এইরূপ সমীপাগত দৃষ্টে ভগবান মনোহর বাগ্‌বিন্যাশ দ্বারা তাঁহাদিগকে বিচলিত ও সম্মোহিত করিতে চেষ্টা করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হে মহাভাগ্যবতীগণ তোমাদের আগমন পরম মঙ্গলের কারণ হইয়াছে. ব্রজের ও তোমাদিগের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল ত ? আর আগমনের কারণই বা কি এবং আমা দ্বারাই বা তোমাদিগের কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে ? ঘোর তমগুণ প্রধান হিংস্রজন্তু নিবাস-ভূমি রজনীকালে স্ত্রীগণের বাসের অযোগ্য, গৃহে পতি পুত্র, পিতা ভ্রাতা তোমাদের অদর্শনে চিন্তিত ও অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইয়াছেন, সত্বর ব্রজে প্রতিগমন করিয়া তাঁহাদিগকে ভয় ও ভাবনা হইতে মুক্ত কর।"

গোপীকাগণকে নিরুত্তর দেখিয়া গোপীজনবল্লভ পুনরায় তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "অথবা এই শারদীয়া রজনীর পূর্ণ সুধাকর কিরণ-বিধৌত সুশীতল যমুনা সমীরণে কম্পবান বনভূমির শোভাই যদি তোমাদের চিত্তাকর্ষণ করিয়া থাকে, তবে তাহাও দেখা হইল। ধেনু বৎসগণ উচ্চনিনাদ করিতেছে, গাভীগণের দোহন ও বৎসগণকে দুগ্ধ দানে পরিতুষ্ট কর। অথবা আমার প্রতি স্নেহই যদি তোমাদের আগমনের কারণ হইয়া থাকে, তাহাও তোমাদের যথাবিহিত কার্য্য হইয়াছে যেহেতু সকলজীবই আমাকে প্রীতি করিয়া থাকে।" গোপীগণ তথাপিও নিরুত্তর থাকিলে, ভগবান পুনরায় তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "পতি সেবাই সতীর পরমধর্ম্ম, অন্যথাচরণে ইহলোকে এবং পরলোকে বিবিধ দুঃখের ভাজন হইতে হয়। উপরন্তু শ্রবণ মনন অনু-কীর্ত্তনাদি দ্বারা আমাতে যেরূপ প্রেম সঙ্গত হয় আমার অঙ্গ সঙ্গ লাভে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই।" ভগবানের এইরূপ বহুবার্থ সূচক সুযুক্ত বচন শ্রবণে গোপীগণ নীরব রহিলেন। ব্যাঘ্রভয় বনভয়, ধর্ম্মভয়, লোকভয় ও স্বর্গভয় কোন ভয়ই তাহাদিগের নিকট ভয়াবহ বলিয়া বোধ হইল না। পতি পুত্রের স্নেহ শৃঙ্খলত বংশীরবে গৃহেই ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

ভগবানের মুখোচ্চারিত সুকঠিন বাক্য শ্রবণে হৃদয়ে দারুণ ব্যথা প্রাপ্ত হইয়া কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়া গোপীগণ দারুণ চিন্তা সাগরে নিপতিতা হইলেন, ঘনশ্বাস প্রবাহে তাঁহাদের সুন্দর বদন কমল পরিম্লান হইয়া আসিল। কথঞ্চিৎ শোক ও দুঃখ বেগ সম্বরণ পূর্ব্বক মানিনী ও কিঞ্চিৎ কোপাবিষ্টা গোপিনীনিকর অশ্রু-

পূর্ণ লোচনে ভগবানকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "হে স্বেচ্ছাময় স্বতন্ত্রবিভো, আমাদিগের প্রতি এতাদৃশ দুরূহ বাক্য প্রয়োগ, আপনার পক্ষে সুযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। আদিদেব পুরুষপর নারায়ণ মোক্ষাভিলাষী মুমুক্ষদিগের মোক্ষাভিলাস পূর্ণ করিয়া থাকেন আমরা মোক্ষ ভিখারী নহি।

আহুশ্চ তে নলিননাভ। পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধ বোধৈঃ।
সংসার-কূপ পতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ॥ ভা ১০।৮২।৪৮

আপনার চরণতল কোটীচন্দ্র সুশীতল জ্ঞানে শরণ লইয়াছি আমাদের সেই সুচির সঞ্চিত আশালতার মূলোচ্ছেদ করিবেন না। আমরা জ্ঞানহীনা গোপাঙ্গনা জ্ঞানীগণের জ্ঞান রাজ্যের কোন ধারই ধারি না। তুমি সুখময়, পরম সুখের আলয়, তোমা কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া দুঃখময় সকল সুখই পরিত্যাগ করিয়াছি। চরণ তোমার পদমূল হইতে একপদও চলিতে চাহে না, হস্ত ব্রজে প্রতি গমন করিয়া কি কার্য্য সাধন করিবে? তাহার ক্ষমতা কোথায়! হে চিত্ত হর। তুমি সর্ব্বচিত্তই হরণ করিয়াছ শূন্য মনপ্রাণের আর কি কার্য্য করিবার শক্তি আছে?

সিঞ্চাঙ্গ নস্ত্বদধরামৃত পূরকেণ
হাসাবলোক কলগীতজহৃচ্ছয়াগ্নিম্।
নো চেদ্বয়ং বিরহজাগ্ন্যুপযুক্ত দেহা
ধ্যানেন যাম পদয়োঃ পদবীং সখে তে॥ ভাঃ ১০।২৯।৩৫

হে নাথ, হে কৃষ্ণ, তোমার বেনুগীত শ্রবণে ও সুহাস্য পূর্ণ বদনচন্দ্র নিরীক্ষণে আমাদিগের হৃদয়ে যে কামের অনল প্রজ্জলিত হইয়াছে তোমার অধরামৃত সিঞ্চনে, হে তাপনাশন সে সন্তাপ নিবারণ কর, নতুবা আমরা ধ্যানযোগ অবলম্বনে এ তাপ দগ্ধ দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তোমার চরম সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইব। হে ব্রজ বান্ধব হে গোপী প্রাণবন্ধো শ্রীর একান্ত বাঞ্ছিত তোমার পদ কমল স্পর্শের সৌভাগ্য লাভ করিয়া অন্য স্পর্শের বাসনা আর নাই। হে পুরুষ ভূষণ হয় রাখ না হয় মার তোমার সুন্দর হাস্য বিলসিত প্রসন্ন বদন কমল নিরীক্ষণ করিয়া জগতে এমন কোন রমণী আছেন যে, তোমার চরণে বিনামূল্যে আপনাকে বিক্রয় করিতে না চাহেন? দোষ আমাদের নহে—উহা

তোমার ঐ "অলকাবৃত কুণ্ডল ত্রিগণ্ড স্থলায় সুধং হসিতাবলোক"নের সর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও সুধাসার নির্ম্মিত ঐ বদন সুধাকরের।

বীক্ষ্যালকাবৃত মুখং তব কুণ্ডলশ্রী
গণ্ডস্থলাধর সুধং হসিতাবলোকম্।
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য
বক্ষঃ শ্রিয়ৈক রমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ॥ ভাঃ ১০।২৯।৩৯

এই রূপেই ত আমাদের সকলের সর্ব্বনাশ সংসাধন হইয়াছে। "যে করে আমার আশ তার করি সর্ব্বনাশ" তোমার নিজমুখের বাক্য। তোমায় আশা করাইত আমাদের এ হেন দশা ঘটিয়াছে, এক্ষণে চরণের দাসী বলিয়া তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ কর, তোমার "দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং" ও সুবিশাল বক্ষঃ আমাদিগের চিত্তে যে ক্ষোভের উদয় করিয়াছে লক্ষ্মীর চিরবাঞ্ছিত অভয় পদ সেই ভুজযুগের ও প্রশস্ত বক্ষের আশ্রয় দানে অবলাগণকে রক্ষা কর। তুমি যে বলিলে, সতীর পতিই একমাত্র গতি কিন্তু ত্রিলোকে সতীত্বগরবে গরবিনী এমন কোন ধনী আছেন যাহার হৃদয়ে তোমার সুললিত দীর্ঘস্বরযুক্ত বেণু বাদনে মদন ভাবন সমুৎপাদন না করে। যে বংশীধ্বনি শ্রবণে পাষাণ দ্রবিত, যমুনা উজানে ধাবিত, প্রতি তরুলতার অঙ্গে পুলক কণ্টক সমুদ্গত, জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর গতিরুদ্ধ ও জগতে সুখের তরঙ্গ প্রবাহিত, ললনাচিত্তাদ্রিদ্রাবক সেই সঙ্গীতধ্বনিতে কাহার চিত্ত সুস্থির থাকিতে পারে? হে দীনদয়াদ্র নাথ! তোমার দীনা একান্ত শরণাগতা কিঙ্করিগণের স্তনে ও মস্তকে তোমার পরম সুশীতল স্নিগ্ধ করপঙ্কজ অর্পণ করিয়া তাহাদের কন্দর্প ত্রাস নিবারণ কর।

গোপিকাগণের এই অতি কাতর বচন শ্রবণে করুণার্দ্র হৃদয়ে স্বয়ং আত্মারাম হইয়াও তাঁহাদিগকে ক্রীড়ানন্দ উপভোগ করাইবার জন্য, তারকাবৃত উড়ুরাজরূপে বণিতাশত যুথপতি শ্রীকৃষ্ণ যমুনাতরঙ্গ সম্পৃক্ত কুমুদামোদের কুঞ্জ বায়ু সেবিত পুলিনে প্রবেশপূর্ব্বক বিবিধ ক্রীড়াসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন এবং বাহুপ্রসারণ আলিঙ্গনাদি দান দ্বারা প্রেমাত্মক কাম উদ্দীপিত করিয়া গোপিকাগণকে অপার আনন্দে মগ্ন করিলেন।

"কাঞ্চন মণিগণে জনু নিরমাওল রমণীমণ্ডল সাজ। মাঝহি মাঝ মহা *মরকত মণি, শ্যামর নটবর রাজ॥ ধনি ধনি অপরূপ রাসবিহার। থীর বিজুরি.

সঙ্গে চঞ্চরু জলধর রস বরিখয়ে অনিবার। কত কত চান্দ তিমিরপর বিলসই তিমিরহু কত কত চন্দে। কনকলতায়ে তমালহু কত কত দুহু দুহু তনু তনু বান্ধে॥ কত কত পদুমিনি পঞ্চম গাওত মধুকর ধরু শ্রুতিভাষ। মধুকর মেলি কত পদুমিনি গাওত মুগধল গোবিন্দ দাস॥"

কিন্তু তাঁহাদের এ সৌভাগ্য বহুকাল স্থায়ী হইল না। সৌভাগ্যগর্ব্বে গর্ব্বিতা গোপিকাগণ আপনাদিগকে ত্রিলোকে সকল রমণী অপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যবতী জ্ঞান করিলেন। ভগবান তাহাদের এই ভ্রম নিরাকরণের জন্য রাসস্থলী হইতে সহসা অন্তর্হিত হইলেন।

তাঁহাদিগকে নিগৃহীত করিয়া প্রসাদ বিতরণই ভগবানের উদ্দেশ্য। তিনি এইরূপে অন্তর্হিত হইলে ব্রজাঙ্গনাগণ যুথপতি করিরাজের অদর্শনে করিনীগণের ন্যায় সন্তপ্তা হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের মনোহর আলাপ, বিহার, বিলাস ও বিভ্রমদ্বারা অনাবিষ্ট চিত্তা গোপিকাগণের হৃদয়ে কৃষ্ণ বিভ্রম উৎপন্ন হইয়াছিল, তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়া ভগবানের বিবিধ লীলা অনুকরণ পুর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে তদ্‌গুণ গান করিতে করিতে উন্মত্তের ন্যায় বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং বৃক্ষ লতা পুষ্প, তুলসী ধরিত্রী ও হরিণী যাহাকে দেখেন তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, যে শ্রীগোবিন্দ আমাদের মনপ্রাণ হরণ করিয়াছেন, সেই গোবিন্দ কি তোমাদিগকে আনন্দিত করিয়া এই পথে গমন করিয়াছেন? এইরূপে কৃষ্ণভাবময়ীগণ কৃষ্ণভাব বিভাষিত হইয়া বনে বনে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক, বনস্পতি, বনলতা, বনকুসুম যাহাকে সম্মুখে দেখেন তাহাকেই সেই সর্ব্ব ভূতান্তর্যামী ভগবানের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং চলিতে চলিতে পথিমধ্যে ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশচিহ্নে চিহ্নিত পদচিহ্ন দর্শন করিয়া তাহা তাঁহাদের প্রিয়তম গোপরাজনন্দনের চরণ চিহ্ন বলিয়াই বুঝিতে পারিলেন। অনন্তর সেই চিহ্ন ধরিয়া অনুগমন করিতে করিতে শ্রীরাধিকার পদচিহ্ন সম্মিলিত ভগবানের পদচিহ্ন দর্শনে ব্যথিত হৃদয় হইয়া সেই ভাগ্যবতীর অশেষ ভাগ্যের প্রশংসা করিয়া নানারূপ কল্পনা জল্পনা করিয়া বলিতে লাগিলেন।

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥ ভাঃ ১০।৩০।২৮

পরিশেষে সেই ভাগ্য-মদগর্ব্বিতা শ্রীমতীও ভগবান কর্ত্তৃক বনে পরিত্যক্তা

হইলে অন্যান্য গোপীসকল অন্বেষণ করিতে করিতে তাঁহার সহিত মিলিতা হইলে এবং সকলে প্রেমাকুলা হইয়া অশেষ প্রকার বিলাপ করিতে করিতে বৃন্দারণ্যে কৃষ্ণতত্ত্বানুসন্ধানে রতা হইলেন। কৃষ্ণগতপ্রাণা গোপাঙ্গনাগণ হা নাথ! হা গোপীবল্লভ! হে গোবিন্দ! তব অদর্শনে ব্যথিতমানসা আমাদের দর্শন দান করিয়া জীবনরক্ষা কর—এই বলিয়া কাতরকণ্ঠে কৃষ্ণগুণ গান করিতে করিতে পুনরায় যমুনাপুলিনে আগমন করিলেন এবং ভগবানের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া পথপানে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহারা কৃষ্ণ প্রেমানুরাগে একান্ত তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়া গৃহ পরিজন পতিপুত্র সমস্তই বিস্মৃত হইয়াছিলেন এবং প্রিয়তমের দর্শন লালসোৎকণ্ঠিতা হইয়া বহুবিধ গান ও প্রলাপ সহকারে সুস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন সেই রোদন পরায়ণা গোপীগণের মধ্যে সহাস্য বদন কমল, পীতাম্বর পরিহিত, প্রসূন মালালঙ্কৃত সাক্ষাৎ মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইলেন।

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ। ভাঃ ১০.৩২।২

প্রিয়তমকে পুনরাগত দর্শন করিয়া প্রীতি প্রফুল্ল নয়ন গোপীসকল সমুত্থিত হইলেন এবং ভগবানের চরণারবিন্দে আগমন করিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচন কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন—হে গোবিন্দ, তুমি যে পরম ধর্ম্মজ্ঞ অদ্য তাহা বুঝিতে পারিলাম, নতুবা এই গভীর রজনী প্রদেশে আমাদের আকর্ষণ করিয়া এতাদৃশ লাঞ্ছনা দিতেছ কেন? হে প্রভো, আমরা তোমার পদপঙ্কজ বক্ষঃদেশে ধারণ করিবার মানসেই এই নিশীথ সময়ে তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি—আর ছলনা করিও না।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন গোপীসকলকে লইয়া পুষ্পসৌরভময় বায়ু সমাকৃষ্ট, ভ্রমর গুঞ্জিত, শরৎচন্দ্র কিরণ বিদ্যোত, পরম কমনীয় সুখময় কোমল বালুকামণ্ডিত যমুনাপুলিনে প্রবেশ পূর্ব্বক অধিকতর সৌন্দর্য্য ধারণ করিলেন এবং গোপীগণ কুচকুঙ্কুম সংযুক্ত উত্তরীয় বসন নির্ম্মিত আসনে উপবেশন করিয়া গোপীমণ্ডল পরিবৃত ও তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া বলিলেন,—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ
যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ।
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥ ভাঃ ১০।৩২।২২

শ্রীভগবানের অপার প্রেম রসময়ী উপাসনায় চিত্ত সুনির্ম্মল, সুপ্রসন্ন, বিগলিতধার না হইলে এই সর্ব্বলীলা সম্পত্তির শিরোমণী মকরন্দস্রাবী প্রেম-মহামহোৎসব রাসলীলা শ্রবণ-বর্ণন বাসনা বিড়ম্বনা জনক বলিয়াই মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণ-মায়া দ্বারা মোহিত চিত্ততাবশত, নিজ নিজ স্ত্রীগণকে নিজ নিজ সমীপেই অবস্থিত জানিয়া ব্রজবাসী গোপগণও যখন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়া করেন নাই তখন এই শ্রীশ্রীরাসলীলা শ্রবণে বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণেরও ভগবৎপরতা হইবে ইহাত অবশ্যম্ভাবী। তাই ভাগবতশ্রেষ্ঠ শ্রীশুকদেব গোস্বামী ইহাই বলিয়াছেন—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥ ভাঃ ১০।৩৩।৪১

শ্রীহরিজীবন গোস্বামী।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—

আমরা যে উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলাম বর্ত্তমান প্রবন্ধ লেখক তাহার কিছুই বলেন নাই। ইনি কেবল ভাগবতের মতে বস্ত্রহরণ ও রাসলীলার ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। এসম্বন্ধে আমরা আগামী মাসে আমাদের বক্তব্য বলিব। যদি আমাদের প্রশ্নগুলির মিমাংসা যথাযথভাবে কেহ লিখিয়া দেন এবং আমাদের পরিদর্শক পণ্ডিতমণ্ডলী উহা ঠিক বলিয়া প্রকাশকরেন তবে তিনিই আমাদিগের নিকট হইতে পুরস্কৃত হইবেন। এবিষয় আগামী মাসের পত্রিকায় বিশেষ আলোচিত হইবে—

(সম্পাদক ভক্তি)

ব্রহ্মবিদ্যা

সত্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, অনন্ত অচিন্ত্য শক্ত্যাশ্রয় শ্রীভগবান ভূ-র্ভুবাদি অখিল লোকের স্রষ্টা, নিয়ন্তা, এবং পাতা, শুদ্ধ চিত্তে ইহা অনুভব করাই ব্রহ্মজ্ঞান। যে বিদ্যার সাধনা দ্বারা, এই দিব্যজ্ঞানের প্রধান অন্তরায় স্বরূপ চিত্তের অশুদ্ধতা নাশ হয়, অজ্ঞান সমুদ্র শুষ্ক হইয়া যায়, প্রাণে রসসিন্ধুর লহর বহিতে থাকে, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক ত্রিতাপ জ্বালার চির-

অবসান ঘটে তাহাই ব্রহ্মবিদ্যা। তদ্ভিন্ন সমস্তই অবিদ্যা। অবিদ্যার দ্বারা জীব তার প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা, শ্রীভগবানকে ভুলিয়া গিয়াছে। তার ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার জল, তার সকল জ্বালার শান্তি, সকল সুখের কেন্দ্র যে সেই এক-জন, স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় স্বজনে, একাধারে সেই যে তার সব, সে বই তার আর গতি নাই, অবিদ্যা তাকে এই সব ভুলিয়ে দিয়েছে। তাই তার এত দুঃখ। "অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তব" তাই সে নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, হয়েও, সচ্চিদানন্দময় শ্রীভগবানের অংশ হয়েও, আজ কিনা মায়ার কিঙ্কর। উদরান্নের জন্যে ব্যস্ত। এমনই মদ, এমনই ভ্রম। হায়, এ ভ্রম কি ভাঙ্গিবে না, এ ঘুমঘোর কি ছুটবে না? ভাঙ্গিবে, ঘুমের ঘোর ছুটে যাবে। সর্ব্বকল্যাণ-দায়িকা, ব্রহ্মবিদ্যাই, সবভ্রম ভেঙ্গে দেবে, অন্ধকার ঘরে চাঁদের আলো ফুটিয়ে তুলবে, অনাদি আবর্জ্জনাভর্গিত মলিনচিত্তে, স্বর্গ কুসুম পারিজাতের সুষমা ছড়ায়ে সব আনন্দময় নন্দনকানন করে তুলবে। তাই ব্রহ্মবিদ্যার আরাধনা কর।"

সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান শ্রীভগবানকে জানিতে হইলে, সুনির্ম্মল ব্রহ্মবিদ্যা ব্যতিরেকে দ্বিতীয় পন্থা নাই। সংসার মরুভূমি ক্লিষ্ট তাপদগ্ধ প্রাণকে, মলয় চন্দনের সুশীতল সুবাসে সুরভিত করিতে, আর দ্বিতীয় উপায় নাই। মায়া পিশাচীর মোহন ফাঁদ হইতে আত্মাকে রক্ষা করিতে হইলে, ব্রহ্মবিদ্যার অলৌকিক, অচিন্ত্য শক্তি ব্যতিরেকে দ্বিতীয় অস্ত্র নাই।

এই ব্রহ্মবিদ্যা দেশ, কাল, পাত্র, অনুসারে, ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন মহাপুরুষগণ কর্ত্তৃক বিভিন্ন রূপে ব্যাখ্যাত হইলেও, প্রধানতঃ ইহার দুইটী স্তর। জ্ঞান ও ভক্তি। শুদ্ধ জ্ঞানের বৈচিত্র্যময় অবস্থাই ভক্তি। জ্ঞান যখন নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান বিষয়ক, অর্থাৎ "সোঽহং" ইত্যাকার ভাব ধারণ করে, তখন তাহা জ্ঞান, এবং যখন ভক্ত-হৃদয় হইতে প্রকাশিত হইয়া, পূত সলিলা ভাগীরথীর ন্যায় সকল বাধা সকল বিপত্তি অতিক্রম করতঃ শ্রীভগবানের চরণারবিন্দে সংযুক্তা হয়, তখন তাহাকে ভক্তি বলে। জ্ঞান ও ভক্তিতে এই পার্থক্য, জ্ঞান বিশেষই ভক্তি, যেমন কৌরব বিশেষই পাণ্ডব নামে খ্যাত। বিশেষ করিয়া বলিতে গেলে প্রথমটি কেবল বোধ স্বরূপা, দ্বিতীয়টী বোধস্বরূপাও আস্বাদনরূপা। এই ভক্তি দ্বিবিধা। কেবলা এবং প্রধানীভূতা। প্রসিদ্ধ জ্ঞান কর্ম্মের সংযোগ রহিত হইলেই ভক্তি কেবলা নামে এবং উক্ত জ্ঞানাদি সংযুক্ত হইলেই ভক্তি প্রধানীভূতা নামে গণ্যা হয়। জড় জগতে জীব ত্রিগুণাত্মক মনের দ্বারা, মায়াতীত নির্ম্মল ব্রহ্মজ্ঞানকে লাভ করিতে পারে না, কেননা, "সত্বাৎ সংজায়তে

জ্ঞানং" সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞানের উদ্ভব হয়, কাজেই গুণাত্মক জড়ীয় জ্ঞানে, মুক্তি পাবার কোন আশাই নাই। এই নিমিত্ত ভক্তির সাহায্য আবশ্যক। ভগবদ্বহির্ম্মুখ জীব, জ্ঞানের চরম সীমায় উঠিলেও তাহাকে প্রকৃতির আবরণের মধ্যে থাকিতেই হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,"

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধ বুদ্ধয়ঃ

আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃত যুষ্মদঙ্‌ঘ্রয়ঃ" ॥ ভাঃ ১০।২।৩২

হে অরবিন্দাক্ষ। যাঁহারা ভবদীয় পদারবিন্দে, ভক্তি স্থাপনা না করিয়া, কেবল জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি প্রয়াসী হন, তাঁহারা বেদান্তাদি পাঠ করিয়া জ্ঞানের উচ্চশিখরে আরোহণ করিলেও, নিশ্চয়ই তথা হইতে পতিত হইবে না। এই জন্য সকলকেই ভক্তি দেবীর আরাধনা করিতে হয়। ভক্তি সচ্চিদানন্দময় ভগবানের সচ্চিদানন্দময়ী শক্তি। ইনি সাধককে বাসনানুযায়ী ফল প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হন ইহারই কৃপায় জীবের প্রকৃতির আবরণ খসিয়া যায়, জীব ব্রহ্মপদ লাভ করে। তাই স্বামীপাদ বলিয়াছেন, "ভক্তিরেব মোক্ষইতি সিদ্ধঃ।" ভক্তিই মুক্তি। যদি কোন তর্কনিষ্ঠ ব্যক্তি এরূপ আপত্তি তুলেন যে ভক্তিত প্রীতিস্বরূপা, তাহা ত মনের বৃত্তি মন মায়িক, অতএব ভক্তিও মায়িক। এ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। যেহেতু ভক্তি প্রীতিরূপা হইলেও তাহা মনের বৃত্তি নাহ। "নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদিসাধ্যতা।" ভক্তি নিত্যসিদ্ধ ভাব রূপা হৃদয়ে প্রকাশ হন মাত্র। সচ্চিদানন্দময় শ্রীভগবান যেমন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দশদিক আলো করিয়া সহসা নর নয়নের গোচরীভূত হন, সচ্চিদানন্দময়ী ভক্তি ও তদ্রূপ অনাদি কালের আবর্জ্জনা সরাইয়া হৃদয়ে আবির্ভূতা হন মাত্র।

"নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম, সাধ্য কভু নয়।
শ্রবনাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয় ॥" (চৈঃ চঃ)

ভক্তি যে সচ্চিদানন্দময়ী এবং ঘন স্বরূপা, শ্রুতি অতি স্পষ্ট ভাষায় তাহা কীর্ত্তন করিতেছেন। "ওঁ বিজ্ঞানানন্দঘনা সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তি যোগে তিষ্ঠতি।"

ভক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে বিশেষ জানিতে হইলে শ্রীজীব গোস্বামীর প্রীতি সন্দর্ভ পাঠ করা কর্ত্তব্য।

ষড়ৈশ্বর্য্যশালী মায়াধীশ শ্রীভগবান যার গুণে এত বশ্যতা স্বীকার করেন, সেই ভক্তিদেবীর স্বরূপ কি? উহা কি, প্রাকৃত সত্ত্বময়জ্ঞানানন্দস্বরূপিনী, অথবা উহা শ্রীভগবানের স্বরূপ জ্ঞানানন্দরূপিনী, অথবা জৈবে জ্ঞানানন্দ

স্বরূপিনী, কিম্বা, উহা শ্রীভগবানের পরাশক্তির সার স্বরূপা হ্লাদিনীশক্তি, এবং সম্বিৎশক্তির সমবেত সাররূপা। ভক্তি কখনও প্রাকৃত সত্ত্বময় জ্ঞানানন্দরূপিনী নহেন, কেননা, শ্রীভগবানকে বশীভূত করিবার শক্তি মায়ার নাই। মায়া তাঁর নিকটে লজ্জায় যাইতে পারে না।

"ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত কুহকং" তিমিব বিনাশী সূর্য্যের ন্যায় স্বস্বরূপ-শক্তিদ্বারা তিনি মায়াকে বশীভূত করিয়া সর্ব্বদাই নিজ মহিমাময় বিরাজমান। অতএব ভগবদ্বশীকারিণী আনন্দময়ী ভক্তি কখনও মায়িক নহে। দ্বিতীয় পক্ষও সঙ্গত হয় না। যেহেতু ভক্তের ভক্তিতে শ্রীভগবান পূর্ণ, তাঁহার জ্ঞানানন্দের হ্রাস বৃদ্ধির অসম্ভাবনা বশতঃ উহা সম্ভব হয় না। তৃতীয় ভক্তি কখনও জৈবী জ্ঞানানন্দরূপা হইতে পারে না। যেহেতু, অনুচৈতন্য জীবের আনন্দ ক্ষুদ্র ও ক্ষয়শীল। ভক্তি নিত্য ও বিপুলা। অতএব চতুর্থ পক্ষই স্বীকার্য্য।

অর্থাৎ শ্রীভগবানের হ্লাদিনী শক্তি ও সম্বিৎশক্তির সমবেত সার স্বরূপা পরাবস্থাই ভক্তি। কেননা হ্লাদিনীর কার্য্য আনন্দ দান ও সম্বিতের কার্য্য স্বপ্রকাশময়তা। ভক্তিতে এই উভয়বিধ ভাবই দৃষ্ট হয়। পরিশেষে শ্রীল বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন,

"তৎসারত্বঞ্চ, তন্নিত্যপরিকরাশ্রয়ক, তদানুকুল্যাভিলাষ বিশেষঃ।"

শ্রীভগবানের নিত্যমুক্ত পরিকরগণে অবস্থিত অনুকুল অভিলাষ বিশেষই ভক্তি। অতএব ভক্তিকে কেহ কখনও প্রাকৃত বলিয়া নিরূপন করিতে সক্ষম হইবে না। এই ভক্তিই উত্তম সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়। প্রেমাবস্থায় প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, যেহেতু তখন তাঁহার নিকট সর্ব্বত্রই ভগবদ্ভাব স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। তখন "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।" যেদিকে চক্ষু ফিরান সেই দিকেই তিনি শ্রীভগবানকে দেখিতে পান। তখন তাঁর অন্তর বাহির সব সমান হইয়া যায়, চিত্ত ভগবন্ময় হয়।

তখন তিনি অনলে, অনিলে, সাগরে সলিলে, কি স্থাবর, কি জঙ্গম, যেদিকে চান, আর তাদের স্থূলমূর্ত্তি দেখিতে পান না।"

"স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় তাঁর ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি।" (চৈঃ চঃ)

ইহাই প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান, বেদে ইহারই প্রশংসা করা হইয়াছে, "সোঽহং" নহে। ভক্তিই প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্যা,

"সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া" "তত্ত্বমসি" নহে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,

"যো মাম ব্যভিচারেণ ভক্তিভাবেন সেবতে।
স গুনান সমতীতৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥"

কলিপাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু, পণ্ডিতাগ্রগণ্য রায় রামানন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কহ রায় বিদ্যামধ্যে কোন বিদ্যা সার। পণ্ডিত প্রবর উত্তর করিয়াছিলেন—

"কৃষ্ণভক্তি বিনু জীবের বিদ্যা নাহি আর॥" (চৈঃ চঃ)

শ্রীঅমৃত নাথ মুখোপাধ্যায়।

ভালবাসা।

কত ভালবাস সখা। আমি বুঝিতে পারিনে।
ভুলে থাকিতে পার না—
(তাই বুঝি) ছুটে আস আমার পানে।
(আমার) এমোহ-চেতনায় আসিতে পারনা
(তুমি) আসিলেও আমি চিনিতে পারিনা
(তাই সখা) আস অলক্ষিতে অচেতনে।
(আমার) হৃদয় দুয়ার বন্ধ এমোহ চেতনে
ঘুমাইলে তাই সখা আশীর্ব্বাদ লয়ে
এসে তুমি দাঁড়াও নয়নে।
প্রভু কতবার তুমি যাচিয়া আসিলে
স্নেহ-আশীর্ব্বাদে সখা কত ভাল বাসিলে
(আমি) চিত্রপুত্তলির মত (তোমায়) দেখিলাম কত
(সখাহে) আমার ঘুম ভাঙ্গিল না (মুখে) কথা ফুটিল না
(কেবল) বারি বিন্দু নয়নে।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ

ভক্তি

(২০শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩২৯ সাল)

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥"

বৈরাগ্য

"সুরবরমন্দিরতরুতলবাসঃ শয্যা ভূতলমজিনং বাসঃ।
সর্ব্বপরিগ্রহভোগত্যাগঃ কস্য সুখং ন করোতি বিরাগঃ॥"

দেবতা-মন্দিরে কিম্বা তরুতলে বাস। ভূতলে শয়ন আর মৃগচর্ম্ম-বাস॥
সমুদয় পরিজন ভোগ পরিহার। এহেন বৈরাগ্যে সুখ না হয় কাহার॥

সংসার ভোগের স্থান, সুখ দুঃখ সমজ্ঞান,
যে জন করয়ে সেই প্রকৃত সংসারী।
মোক্ষ তার করতলে, সাধক তাহারে বলে,
সুখাকর ধর্ম্ম ধনে সেই অধিকারী॥
ভক্ষ্য বস্তু উপাদেয়, অথবা হইলে হেয়,
সাধকের বড় নাহি হয় ভেদজ্ঞান।
এটি ভাল ওটি মন্দ, এ বিচারে যে আনন্দ,
সে আনন্দ জানিবেক কেবল অজ্ঞান॥
বিপদ সম্পদ মান, অভিমান অপমান,
পৃথক্ না ভাবি সব এক করি লবে।
না ভাবি আপন পর, আত্মজ্ঞানে চরাচর,
নিখিল পদার্থে সদা সমদর্শী হবে॥
মৃগচর্ম্ম করি বাস, তরুতলে কর বাস,
বাসনা জ্বালায়ে দিয়া কর তাহে ক্ষার।

সেই ক্ষারে কাচ মন, হইবে শুভ্রবরণ,
ভব-মলিনতা হ'তে হইবে উদ্ধার ॥
রমণী, রতন, রথ. ত্যজিএই তিন পথ,
সাধুর গন্তব্য পথে চলহ সতত।
বৈরাগ্য সম্বল করি, ধর্ম্ম-যষ্টি করে ধরি,
হরি হরি বলি তাঁর হও অনুগত ॥
দারা পুত্র ধন জন, কেহ কার নয় মন,
স্বপন সমান সব কিছু নহে সার।
দেহ মাঝে চিৎরূপে, আছেন যিনি স্বরূপে,
ভাব তাঁরে দিবানিশি তিনি সারাৎসার ॥
বৈরাগ্য ইহার নাম, ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম,
সকলই পূর্ণ হয় ইহারে সেবিলে।
প্রাণে ভাব নাহি ধ'বে, (শুধু) বৈরাগীর বেশ ধরে,
কি লাভ হইবে শুধু সাজ দেখাইলে ॥
ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন, ভাবটি করে গ্রহণ,
ভাবের অভাবে সাজা সাজার নিদান।
সাজ সজ্জা প'ড়ে রয়, ভূত ভূতে লয় হয়,
ভাবের বিচার শেষে করে ভগবান ॥
অতএব,
সংসারে যখন যাহা আসিয়া জুটিবে।
ভাবে তায় রবে তুষ্ট কষ্ট না হইবে ॥

শ্রীভূপতিচরণ বসু।

মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ

আহারাদি শেষ করিয়া শয়ন করিতে রাত্রি প্রায় একটা বাজিল। আমি আর ক্ষীরোদ ঘরের মেজেতে এক বিছানায়ই শুইলাম; কেবল মহাপুরুষ পৃথক্ বিছানায় বৈঠখানার এক পাশে খাটের উপর শুইলেন।

রাত্রে ভাল ঘুম হইল না। কেন না, আজ বাল্যবন্ধু ক্ষীরোদকে পাইয়াছি, শুধু পাওয়া নয়, কিছুদিন পূর্ব্বে যাহার মৃত্যু নিশ্চয় করিয়াছিলাম, আজ তাহার সহিত একত্রে শুইয়া আছি। এই সব ভাবিয়া আমার প্রাণে যেন কেমন একটা আনন্দ আপনা হইতেই উথলিয়া উঠিতেছে। দুই জনেই পরস্পর নানা প্রকার কথা-বার্ত্তা হইতেছে, পাশের দেওয়ালের ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দুইটা বাজিল। ক্ষীরোদ বলিল, একটু ঘুমোও না ভাই! অসুখ ক'রবে যে। আমি সে কথা কাণেও নিলাম না, আমি তাহাকে বলিলাম, ভাই, তুমিতো মহাপুরুষের সহিত একাদিক্রমে অনেকদিন বাস ক'রেছ; নিশ্চয়ই অনেক নূতন নূতন তত্ত্বকথা শুনেছ—তাহারই বিষয় কিছু বল। সংসারের কথা, ছেলে মেয়ের কথা ওসবতো চিরদিনই আছে—তুমি মহাপুরুষের সঙ্গে যে সকল আলোচনা ক'রেছ, তাহার কিছু কিছু বল শুনি।

ক্ষীরোদ—ভাই, সে কি আর সব মনে আছে, তবে যাহা মনে আছে। তোমাকে বলিতে কোনও আপত্তি নাই, কিন্তু এ সময় নয়। কারণ, এখন যদি আমরা এইখানে এ সকল বিষয় লইয়া কথোপকথন করিতে থাকি, তাহা হইলে মহাপুরুষের মোটেই নিদ্রা হইবে না। আজ বিশ্রাম কর। অবসর মত তোমাকে সকল কথাই বলিব। তারপর আর এক কথাও বলি, একদিন মহাপুরুষের নিকট হইতে সংক্ষেপে বড়্‌রিপুর উৎপত্তি ও নিবৃত্তি বিষয়ক কয়েকটা বড়ই সুন্দর উপদেশ পাইয়াছিলাম, পাছে ভুলিয়া যাই বলিয়া আমি উহা লিখিয়া রাখিয়াছি, সেটা তোমাকে দিব—তুমি পড়িয়া দেখিও। ক্ষীরোদের এই সকল কথা শুনিয়া আমি আর বিশেষ জিদ ধরিলাম না; কেবল বলিলাম—ভাই, ঘুমতো এখন আসবে না, তবু তোমার কথা মত চুপ করিয়াই থাকি। কিন্তু কাল সকালেই আমাকে সেই লেখাটী দিও। ক্ষীরোদও তাহাই হইবে বলিয়া চুপ করিল।

কত কথা—কত চিন্তাই যে মনের মধ্যে আপনাপন আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিল, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। এই ভাবে কখন তন্দ্রাবিষ্ট হইয়াছি, জানি না; হঠাৎ কীর্ত্তনের সুর কাণে বাজিল; উঠিয়া বসিয়া শুনিলাম, মহাপুরুষ খুব উচ্চ কণ্ঠে ক্ষীরোদের বাড়ীর সম্মুখে যে পাঠশালা আছে, তাহার মধ্যে বসিয়া প্রভাতি সুরে গাহিতেছেন,—

"শ্রীগুরু বৈষ্ণব তুঁহারি চরণ স্মরণ না কৈনু আমি।
বিষয় বিষম বিষ ভাল মানি খাইনু হইয়া কামি।

সেই বিষে মোরে জাড়িয়া মারিল বড়ই বিপাক হৈল।
না জানি জনমে জনমে এমন কতেক আত্মঘাতী পাপ কৈল ॥
সেই অপরাধে এভব সংসারে বাঁধিল এ মায়াজালে।
তোমা না ভজিয়া আপনা খাইয়া আপনি ডুবিনু হেলে ॥
বল আর কত কাল এ দুঃখ ভুঞ্জিব ভোগ-দেহ নাহি যায়।
সহিতে নারিয়া কাতর হইয়া নিবেদিনু তুয়া পায় ॥
তোমার চরণ শরণ কেবল বিচারিয়া এই দায়।
উদ্ধার করিয়া লহ দীনবন্ধু আপন চরণ-নায় ॥
তোমার সেবন অমৃত ভোজন করাইয়া মোরে রাখ।
এ রাধামোহন খতে বিকাইল দাস গণনাতে লেখ ॥"

মহাপুরুষের কণ্ঠটা অতি মধুর, তাহাতে প্রভাত সময় চতুর্দ্দিক্ নিস্তব্ধ। সব চেয়ে মিষ্ট লাগিতেছিল—প্রত্যেক গানের মধ্যে অতি সুন্দর আখর গুলি। যাহা হউক, কিছুক্ষণ গান করিয়া মহাপুরুষ চুপ করিলে ক্ষীরোদ হারমনিয়মটী আনিয়া আমাকে দিল। আমি আর অপেক্ষা না করিয়া মহাপুরুষকে প্রণাম করিয়া গাহিতে লাগিলাম,—

"ভজহুঁ রে মন নন্দনন্দন অভয় চরণারবিন্দ রে।
দুর্লভ মানব জনম সতসঙ্গে তরহ এ ভব-সিন্ধু রে ॥
শীত আতপ বাত বরিখয়ে দিন যামিনী জাগি রে।
বিফলে সেবিনু কৃপণ দুরজন চপল সুখলব লাগি রে ॥
এ রূপ যৌবন জীবন ধনজন ইথে কি আছে পরতিত রে।
(এ যে) কমল-দল-জল জীবন টলমল সেবহুঁ হরিপদ নিতি রে।
শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ বন্দন পাদসেবন দাস্য রে ॥
পূজন সখীজন আত্মনিবেদন গোবিন্দদাস অভিলাষী রে ॥"

দেখিতে দেখিতে দুই চারিজন করিয়া শ্রোতা আসিয়া পাঠশালাটী প্রায় ভরিয়া গেল, এবার আর কাহাকেও বলিতে হইল না। মহাপুরুষ ক্ষীরোদকে দিয়া পূর্ব্ব হইতেই খোলকরতাল আনাইয়া রাখিয়াছিলেন, আমার গানটী শেষ হওয়া মাত্রই গুরুগম্ভীর স্বরে ধিক্তান্ ধিক্তান্ রবে খোল বাজিয়া উঠিল, ঝুন ঝুন্ করিয়া করতালি বাজিল আর সঙ্গে সঙ্গে সম্মিলিত কণ্ঠে "নিতাই গৌর হরিবোল" ধ্বনি উঠিল। কিছুকাল বাজনা হইয়া গেলে, মহাপুরুষ কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন,—

"নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ
নিতাই গৌরাঙ্গ গদাধর।
নিতাই গৌরাঙ্গ গদাধর জয় জয়
নিতাই গৌরাঙ্গ গদাধর॥
জয় শচীনন্দন জগজীবতারণ
কলি-কলুষ নাশন অবতার।
জয় হাড়াই নন্দন বসু জাহ্নবা জীবন
কর প্রেম-পরশ-রতন পরচার॥
জয় শ্রীসীতানাথ শ্রীঅচ্যুত-তাত
গৌরাঙ্গ আন করি হুহুঙ্কার।
জয় মাধবাচার্য্য নন্দন রত্নাবতী জীবন
দাস্যভাব দিয়া কর অঙ্গীকার॥
শ্রীবাস আদি ভক্তগণ করে নাম সঙ্কীর্ত্তন
পূরব রাগ গায় স্বরূপ দামোদর।
স্থাবর জঙ্গম আদি হরি বলে নিরবধি
কি লীলা করিলে প্রভু চমৎকার॥
বালক বৃদ্ধ পুরুষ নারী ভজ নিতাই গৌর-হরি
পারে যাবার চরণ তরী কর সার
দীন কৃষ্ণদাসে ভণে রেখ নিতাই শ্রীচরণে
ভজনবিহীন জনে কর পার॥"

অনেকক্ষণ এই কীর্ত্তন চলিল, শেষে যখন "গৌর হরি বোল" দিয়া শেষ হইল, তখন বেলা সাড়ে নয়টা। আমি মহাপুরুষের নিকট আমার আফিসে যাইবার প্রস্তাব করায় তিনি বলিলেন, নিশ্চয়ই যাইবে, কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিয়মিত ভাবে করিয়া যাও। প্রভু যে ভাবে যাহাকে দিয়া যেটুকু করাইতেছেন, সাধ্যমত সকলেরই কর্ত্তব্য, তাহা পালন করা। আচ্ছা, তুমি আফিসে যাইবার যোগাড় কর, আমিও গঙ্গাস্নানের জন্য যাই। এই বলিয়া মহাপুরুষ ক্ষীরোদের কাকার সহিত গঙ্গাস্নান করিতে চলিয়া গেলেন।

আমি ক্ষীরোদকে লইয়া মহাপুরুষের বিষয় দু'একটি কথা আলোচনা করিয়া সেই লেখা খাতাটী চাহিলাম, ক্ষীরোদও তৎক্ষণাৎ বাড়ীর মধ্য হইতে উহা আনিয়া আমাকে দিল। আমি আর তখন কিছু না দেখিয়া আহারাদি

করিয়া আমার কর্ম্মস্থলাভিমুখে যাত্রা করিলাম। কেবল ক্ষীরোদকে যাইবার সময় বলিয়া গেলাম, আজ আর আসিতে পারিব না, কাল আফিসের ফেরৎ আসিব।

আফিসে আসিয়া কাজ-কর্ম্ম করিলাম বটে, কিন্তু মন সেই ক্ষীরোদের বাড়ীতে মহাপুরুষের নিকটই রহিল, নিতান্ত আবশ্যকীয় ২।৪টী কাজ শেষ করিয়া বাড়ী চলিয়া গেলাম। যথাসময় অন্যান্য কার্য্য করিয়া ক্ষীরোদের খাতাখানি লইয়া বসিলাম। যেটুকু পড়ি, তাহাই যেন অমৃতময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আমার স্ত্রী আমার কাছেই বসিয়াছিলেন, তাঁহাকেও পড়িয়া শুনাইতেছিলাম। তিনি বলিলেন, খাতাখানি তোমার দেখা হইলে একবার আমাকে দিও, আমি একবার ভাল করিয়া পড়িয়া দেখিব।

সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ! আমি সে খাতাখানিতে যাহা পড়িয়াছিলাম, তাহা আপনাদিগকে উপহার দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। কিন্তু আপনাদিগের নিকট একটু সময় ভিক্ষা করিতেছি। এবার আর লেখাটী প্রকাশ করিতে পারিব না, আগমী বারে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য, এই ছয়টী রিপু কি কারণে বৃদ্ধি হয় ও কোন্ কোন্ প্রক্রিয়ায় প্রশমিত হয়, তাহা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

ক্রমশঃ

শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

পুরস্কার প্রবন্ধের বক্তব্য

বিগত অগ্রহায়ণ মাসের ভক্তিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বস্ত্রহরণ ও শ্রীরাস-লীলা উভয়ের সামঞ্জস্য রাখিয়া উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ-লেখককে পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হয়। তাহার পর আমরা কয়েকটী প্রবন্ধ পাইয়াছিলাম। কিন্তু কোনটাই আমাদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী লেখা হয় নাই। তাহাতে মনে হয়, প্রবন্ধ-লেখকগণ আমাদিগের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন নাই। উভয় লীলার সামঞ্জস্য সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য যাহা, তাহা নিম্নে দিলাম, প্রবন্ধ-লেখকগণ এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া প্রবন্ধ পাঠাইবেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে যে, ব্রজগোপীগণ অতি অল্প বয়সে কাত্যায়নী ব্রত করিয়া, উক্তব্রত সমাপনান্তে বিবস্ত্রা হইয়া যমুনায় স্নান করিতে নামিয়াছিলেন। সেই সময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া তাঁহাদিগের বস্ত্র হরণ করেন এবং বলিয়া দেন যে, শীঘ্রই তোমরা আমাকে তোমাদের প্রার্থনা অনুযায়ী লাভ করিবে। তারপর শ্রীরাসলীলা হয়। আমরা জানিতে চাই, বস্ত্রহরণের কত পরে রাসলীলা হয় এবং রাসের সময় গোপীদিগের বয়স কত ছিল এবং গোপীরা বিবাহিতা কি না। বস্ত্রহরণের সময় গোপীগণকে কুমারী বলা হইয়াছে অথচ সেই সময় "আগামী শরৎকালে" রাস হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইল। কিন্তু রাসের সময় কৃষ্ণ গোপীগণকে বলিতেছেন,—

"মাতরঃ পিতরঃ পুত্রা ভ্রাতরঃ পতয়শ্চ বঃ।
বিচিন্বন্তি হ্যপশ্যন্তো মা কৃঢ্বং বন্ধুসাধ্বসম্॥ ভাঃ ১০।২৯।২০

অর্থাৎ তোমাদের পিতা, মাতা, পুত্র, ভ্রাতা, পতি, ইহারা তোমাদিগকে না দেখিয়া অন্বেষণ করিবে। যদি বস্ত্রহরণের এক বৎসর পরেও রাস হয়, তথাপি এক বৎসরের মধ্যে কুমারী বালিকা কি প্রকারে পুত্রের মাতা হইল?

তারপর গোপীগণের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির যেরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাই বা কি প্রকারে হয়? মোট কথা, বস্ত্রহরণ এবং রাস, উভয় লীলার সামঞ্জস্য রাখিয়া ভাগবতের মতে আলোচনা করিতে গেলে মধ্যে মধ্যে অনেক গোল আসিয়া যায়। ভাগবতের বর্ণন পাঠ করিলে সহজেই উহা বুঝা যাইবে। লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া ঐ সকল বিষয়ে ভাগবতের বর্ণনা পাঠ করিয়া উভয়ের সামঞ্জস্য বিষয়ে যত প্রকার সন্দেহ আসিতে পারে, তাহার মীমাংসা করিয়া প্রবন্ধ পাঠাইবেন। কেবল মাত্র বস্ত্রহরণ-লীলা বা রাসলীলা বর্ণন করিলেই হইবে না। বস্ত্রহরণ-লীলা হইতে আরম্ভ করিয়া রাসলীলা পর্য্যন্ত যে সকল বর্ণনা ভাগবতে পাওয়া যায়, তাহা বিশেষ ভাবে আলোচিত হওয়া আবশ্যক। লেখকগণ এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া প্রবন্ধ লেখেন, ইহাই বাঞ্ছনীয়। বিষয়টী যেরূপ গুরুতর, তাহাতে একটু বেশী সময় না দিলে চলিবে না। তাই আমরা আগামী ১লা আশ্বিন পর্য্যন্ত সময় নির্দ্দেশ করিয়া দিলাম প্রবন্ধ লেখকগণ ১লা আশ্বিনের মধ্যেই যাহাতে আমরা প্রবন্ধ পাই, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন। বলা বাহুল্য, প্রবন্ধ অমনোনীত হইলে ফেরৎ দেওয়া হইবে না। যদি কেহ ফেরৎ পাইতে ইচ্ছা করেন, ষ্টাম্প পাঠাইবেন। মনোনীত প্রবন্ধ ভক্তিতে

মুদ্রিত হইবে। অন্যান্য বিষয় জানিতে হইলে ভক্তি-সম্পাদকের নিকট রিপ্লাই কার্ড বা টিকিট দিয়া পত্র লিখিয়া জানিবেন।

বিনীত

ভক্তি কার্য্যাধ্যক্ষ।

আলোচনা

(৺দাশরথি রায়)

'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'কার দীনেশ বাবু কবি দাশুরায় সম্বন্ধে বড়ই অন্যায় করিয়াছেন। এমন কি, তিনি ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করিয়া তাঁহাকে সাহিত্য-ক্ষেত্র হইতে গলহস্ত দিয়া বিদায় দিবার কটাক্ষ করিয়াছেন। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও যাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "যিনি বাঙ্গালা ভাষায় সম্যক্‌রূপ ব্যুৎপন্ন হইতে বাসনা করেন, তিনি যত্নপূর্ব্বক আদ্যোপান্ত দাশুরায়ের পাঁচালী পাঠ করুন।" সেই কবিবর দাশরথির বিরাট রচনার পরিচয় আমরা ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দিতে বসি নাই। তাঁহার ভক্তিমূলক গান ও পাঁচালী যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া ধন্য হইব মনে করিয়াছি।

শ্রীকৃষ্ণলীলা অবলম্বনে রচিত পালাগুলির মধ্যে শ্রীরাধার কলঙ্ক-ভঞ্জন পালাটী আমরা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করি। জটিলা কুটিলার চেষ্টায় বৃন্দাবনে অনেকে রাধাকে কলঙ্কিনী বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহাতে রাধার বড় মনে দুঃখ। একদিন শ্যামসুন্দরকে সঙ্গোপনে পাইয়া ব্রজসুন্দরী বলিতেছেন,—

"ভজিয়ে তোমার পদ, ব্রহ্মা পান ব্রহ্ম-পদ,
বিপদের বিপদ পদদ্বয়।
ঐ পদ ভেবে গোবিন্দ, সদানন্দ সদানন্দ
নিরানন্দ সদা করি জয়॥
ধরেন শক্তি অসম্ভব, করেন মৃত্যু পরাভব,
ঐ পদ ভব-বৈভব শুনি হে ভগবান।
ভজিয়ে পদারবিন্দ, দেবরাজ্য পান ইন্দ্র,
ইন্দু পান শিব-শিরে স্থান॥

শুন চিন্তামণি, বলি　　　ঐ পদ চিহ্নিল বলি
বন্দী তাঁর চিরকাল দ্বারে।
ম'জে নাথ তব পায়,　　　কি সম্পদ ধ্রুব পায়
স্থান দিয়েছ গোলোক উপরে॥
প্রহ্লাদ ঐ পদ-বলে,　　　অনল পর্ব্বত জলে,
হস্তি-তলে নাহি মৃত্যু জানি।
ওহে নাথ নন্দকুমার,　　　সেই পদ ভেবে আমার,
গোকুলে নাম রাধা-কলঙ্কিনী॥"

অর্থাৎ তোমাকে ভজনা করিয়া আমার অদৃষ্টে যে বিপরীত হইল।—এইরূপ অনেক স্তুতি করিয়া রাধারাণী তাঁহার মনোদুঃখ নিবেদন করিলেন। তাহার পর কিরূপে ছিদ্র-কলসীতে জল আনাইয়া কৃষ্ণচন্দ্র শত্রুপক্ষের দর্প চূর্ণ ও শ্রীরাধার কলঙ্ক ভঞ্জন করিয়াছিলেন, তাহা আপনারা সকলে জানেন। নারদ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে আসিতেছেন। তাঁহার মুখ দিয়া কবি কি বলিতেছেন শুনুন,—

মন, কর ভাই, মনোযোগ, মনের কথা বলি।
সংসারের সুখ সজ্জা মিথ্যা রে সকলি।
(যেমন)　স্বপনের রাজ্য পাট, মিথ্যা জেন ভাই।
বালকের ধুলার ঘর, এ ঘর জেনো তাই।
ব্যবসাদারের সত্য কথা, মিথ্যা তাকে ধরো।
সতীনে সতীনে পীরিত, মিথ্যা জ্ঞান ক'রো।
বাজীকরের ভেল্কি যেমন মিথ্যা জানা আছে।
দৈবজ্ঞের গণনা যেমন স্ত্রীলোকের কাছে॥
দস্তখৎ যেমন মিথ্যা খত পাটা।
দুর্ব্বলের দাঁতখামুটি মিথ্যা জেনো সেটা॥
(যেমন)　শতরঞ্চের হাতী ঘোড়া মন্ত্রী লয়ে খেলি।
দারা সুত ধন জন—তাই জেনো সকলি।
পুনশ্চ—
"হৃদিবৃন্দাবনে বাস যদি কর কমলাপতি।
ওহে ভক্তপ্রিয়, আমার ভক্তি হবে রাধা সতী॥

মুক্তি কামনা আমারি, হবে বৃন্দে গোপনারী।
(এই) দেহ হবে নন্দের পুরী, স্নেহ হবে মা যশোমতী॥
ধর ধর জনার্দ্দন, (আমার) পাপ ভার—গোবর্দ্ধন,
কামাদি ছয় কংস-চরে, ধ্বংস কর সম্প্রতি।
বাজায়ে কৃপা-বাঁশরী, মন-ধেনুকে বশ করি,
তিষ্ঠ হৃদি-গোষ্ঠে, পুরাও ইষ্টে, এই মিনতি॥
(আমার) প্রেমরূপ যমুনাকূলে আশা-বংশীবট-মূলে,
সদয় ভাবে স্বদাস ভেবে সতত কর বসতি।
যদি বল রাখাল-প্রেমে, (আমি) বন্দী আছি ব্রজধামে,
জ্ঞানহীন রাখাল তোমার দাস হবে এই দাশরথি॥"

কেমন ভক্তির শান্ত ও স্নিগ্ধ উজ্জ্বল, বর্ণনা যেমন মনোহর ভাব, তেমনিই ভাষা, কাব্য-চরিত্রের তুলনা আছে কি? নিতান্ত পাষণ্ডও কি এই ভক্তি-গাথা শ্রবণে বিগলিত হইবে না?

বস্ত্রহরণের ব্যাপার শুনিয়া কুটিলা রাধাকে যমুনা-জলে ডুবিয়া মরিতে বলিলে শ্রীরাধা কি বলিতেছেন শুনুন,—

"আবার বল্‌লে ডুবে মর, ডোবা অতি সুদুষ্কর,
না ডুবলে কি জানা যায়, হরি কি গুণযুক্ত?
কৃষ্ণের প্রেমার্ণবে, যেনা ডোবে, সেই ত ডোবে,
যে ডোবে, সে ডুবে হয় মুক্ত॥
(যদি) পাতালে মানিক থাকে, না ডুবলে কি পায় তাকে?
ও ননদি! পাতাল কত দূরে—
আমি একবার ডুবে দেখ্‌ব, কারো কথা না গায়ে মাখ্‌ব,
যাও যাও কলঙ্কিনী নাম রটাও গে' ব্রজপুরে॥"

এ সব গান কবির কৃষ্ণ-প্রীতির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত নহে কি? শ্রীরাধিকার আর একটি উক্তি শ্রবণ করুন,—

"ননদিনী গো ব'লো নগরে সবারে।
ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী কৃষ্ণ-কলঙ্ক-সাগরে।
কাজ কি বাসে, কাজ কি বাসে, কাজ কেবল সেই পীতবাসে,
সে থাকে যার হৃদয়-বাসে, সে কি বাসে বাস করে॥

কাজ কি গো কুল, কাজ কি গোকুল, গোকুলবাসী হোক প্রতিকূল,
আমিত সঁপেছি গো কুল, অকূলকাণ্ডারীর করে।"

পল্লীগ্রামে ভিক্ষুকের মুখেও শুনি,—

"মন রে! বিপদে ত্রাণ আর হলিনে,
বলিতে হরি তোয় আর বলিনে,
তুই এ জনমে হরিপদ-নলিনে স্থান নিলিনে" ইত্যাদি

একবার মাতা যশোদার বাৎসল্য প্রেমের মাধুর্য্য উপভোগ করুন। মাতা কৃষ্ণকে সাবধান করিতেছেন,—

"দূর বনে যেও না যাদু, দুঃখিনীর প্রাণ।
ভুলে আর ক'রো না কালিন্দীর জলপান॥
হইলে পিপাসা, যেও অন্য নদীর কূলে
লাগিলে রবির তাপ, বৈস তরুমূলে।
সঙ্গী ছাড়া হয়ে যে যেও না কোনখানে।
দুরন্ত কংসের দূত ফেরে বনে বনে॥"

দাশুরায় প্রকৃতই একজন অসাধারণ কবি ছিলেন। তিনি একাধারে যেমন সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক, তেমনি মনুষ্য চরিত্র অঙ্কনে পরিপক্ক চিত্রকরও ছিলেন। তাঁহার পাঁচালী অমৃত রসের প্রবাহস্বরূপ। প্রাচীন যুগের ন্যায় বর্ত্তমানেও দাশরথি রায়ের পাঁচালী শিক্ষিত সমাজে আদৃত হউক, ইহাই আমাদের কামনা। আমরা এই পাঁচালীরূপ বিশাল প্রবাহের দুই এক বিন্দু বারিমাত্র স্পর্শ করিয়া এবারের মত বিদায় লইলাম!

(মহাত্মা নানক)

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন সময়ে বহু মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আজ আমরা মহাত্মা নানকের ধর্ম্মজীবন আলোচনা করিয়া ধন্য হইব মনে করিয়াছি। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধভাগে পঞ্চনদে এক বিরাট ভাবের প্রচার কল্পে এই মহাত্মা আবির্ভূত হইলেন। তিনি ভারতের সনাতন ধর্ম্মমত সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী কাটাইয়া উদার ভাবেই দেশবাসীর সমক্ষে ধরিয়াছিলেন।

১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে লাহোরে নিকটবর্ত্তী কনকাচ নগরে নানকের জন্ম হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের নিরীশ্বরবাদ প্রচারের ফলে পরবর্ত্তী যুগে ভারতীয়-ধর্ম্মে অনেক আবিলতা-স্রোত প্রবাহিত হইতে দেখা গিয়াছিল। পরে অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত হইলে ভারতীয় ধর্ম্ম এক বিরাট, সক্রিয় ও পবিত্র মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। আচার্য্য শঙ্কর ভারতীয়-ধর্ম্মের যে মূর্ত্তি দিয়া গেলেন, পরবর্ত্তী কালে রামানুজ ও রামানন্দ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচার দ্বারা তাহাতে ভক্তিবাদ মিশ্রিত করেন।

এই সমস্ত মহাপুরুষগণের বিরাট সাধনা সিদ্ধ করিয়া শ্রীচৈতন্য প্রভু আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি মানব মাত্রকেই ঈশ্বর-প্রেম-ধর্ম্মে এক করিয়া যান।

এই বিমল ধর্ম্মমতের প্রভাব বিভিন্ন দেশে পরিলক্ষিত হইয়াছিল। তুকারাম, নামদেব, দাদু কেশব প্রভৃতি অনেক মহাত্মার কার্য্যাবলী আমরা গৌরবের সহিত লক্ষ্য করি।

কবির ও গোরক্ষনাথের প্রচারিত ধর্ম্মমত নানককে আকৃষ্ট করিয়াছিল। তিনি পরিব্রাজক-বেশে হিন্দু মুসলমানের বহু তীর্থস্থান পরিদর্শন করিয়া লোক চরিত্র অধ্যয়ন করেন। দীর্ঘকাল পরে স্বদেশে ফিরিয়া গভীর জ্ঞানপ্রসূত তাঁহার ধর্ম্মমত শিষ্যবর্গের নিকট প্রচার করিলেন। তাঁহার প্রেম ও কর্ম্মময় জীবন এবং ভাব ও বিশ্বাস উজ্জ্বল উদার ধর্ম্মমত হিন্দু ও মুসলমানকে সমভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। বেদান্ত ও সুফিমতের অনুরূপ ধর্ম্মমতই তিনি প্রচার করেন। সাধু ব্যবহার, সৎকার্য্য সম্পাদন ও চিত্তশুদ্ধিই মনুষ্য মাত্রের আদর্শ হওয়া উচিত এবং ইহাই তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম-মতের ভিত্তি ছিল। ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে সত্তর বৎসর বয়সে এই মহাত্মার দেহত্যাগ হয়। তাঁহার পরে বহু তেজস্বী শিখগুরুর আবির্ভাবে এই নবীন ধর্ম্ম বিশিষ্ট রূপে প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহাদের কয়েকটী উক্তির বঙ্গানুবাদ আমরা এই স্থলে দিলাম।

১। নানক কহেন শ্রীভগবান্ পরম দয়াল।

২। তিনি প্রেমরূপে সর্ব্বত্র বিরাজিত।

৩। হৃদয় হইতে অশ্লীলতা দূর করিয়া সকলকে বন্ধুরূপে দেখ।

৪। তিনি দীনবন্ধু, ভক্তের প্রিয় ও দয়াময়।

৫। আত্মা পরব্রহ্মেরই রূপ।

৬। নদীসমূহ যেমন সাগরে মিশিবার জন্য ধাবিত হয়, মানবপ্রাণও সেইরূপ ভগবানে মিশিয়া যায়।

৭। যে সৎ ভাবে জীবন যাপন করে, সে আমার শিষ্য হইলেও তাহাকে আমি গুরু বলিয়া মনে করি।

৮। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, আমরা না জানাইলেও সমস্তই জ্ঞাত আছেন। সেখানে (তাঁহার নিকট) সত্য ও ন্যায় বিদ্যমান, প্রভু ও ভৃত্য সেখানে সমান।

শ্রীভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা।

কবীন্দ্র শ্রীগোবিন্দদাস

বাণীর ভাণ্ডারে আজকাল কবি গোবিন্দদাসের ছড়াছড়ি। ছোটবড় নবীন প্রবীণ গণনা করিলে প্রায় কুড়িখানেক হইবে। দালালের জোর থাকিলে অনেক ভেল্‌ও আসলকে ছাপাইয়া বাজারে বেশ চলিয়া যায়। তাই দেখিয়াই ত চক্ষু মুছিতে মুছিতে ভক্ত তুলসীদাস বলিয়াছেন, "গোরস গলি গলি ফিরে, সুরা বৈঠল বিকায়।" আসলের মার্কার জোরে নকলও বেমালুম্ চলিয়া যাইতেছে, বাজার মিলিয়াছে ভাল। অঞ্চলে গিরা থাকিলেই হইল, তাহার মধ্যে সোণা আছে কি না, কেহ তাহার বড় একটা খোঁজ করিবে না। তাই আমাদেরও হইয়াছে—"সোণা ফেলিয়া আঁচলে ফাঁকা গিরা।" আমরা "জয়দেব," "চণ্ডীদাস," "গোবিন্দদাস প্রভৃতি পদকর্ত্তার পদাবলীর মৌলিকত্ব, চমৎকারিত্ব ও দুর্ল্লভত্বের বর্ণনায় জাতীয় মহত্ত্বের গরিমায় আকাশ পাতাল ফাটাইয়া দিতেছি, কিন্তু সেই অলোকসামান্য—মহাপুরুষগণের অভ্যুদয়ের প্রকৃত পরিচয় ক্রমে যে বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া যাইতেছে, তৎপ্রতি দৃষ্টি নাই, ইহা জীবন্ত জাতীয়তার লক্ষণ নহে। অবশ্য মহাপুরুষগণের নাম ধামের পরিচয় আবির্ভাব সময়ে বড় একটা প্রচারিত হয় না। কিন্তু যখন তাঁহাদের গুণমহিমাজ্যোতি দিগ্‌দিগন্তে সম্প্রসারিত হইতে থাকে, তখন অতীতের রাজ্য হইতে সেই অলৌকিক প্রতিভাকে ঢাক ঢোল তুরী ভেরী বাজাইয়া মহাসমারোহে দিব্য রত্ন-দোলায় আরোহণ করাইয়া আনিয়া বিচিত্র রত্নমন্দিরে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা আরম্ভ করেন। দেখিতে দেখিতে এত উপাসক, এত ভক্ত মিলিত হন যে, তখন সেই নরদেবতার পূজার্চ্চনা লইয়া দ্বন্দ্ব কোলাহল উপস্থিত হয়। ইহার অনেক চিত্র আমরা পাশ্চাত্য ইতিহাসে দেখিতে পাই।

জীবন্তে যে নগরবাসীর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া মহাকবি "হোমর" উপেক্ষিত জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, এখন সেই নগরের অধিবাসীরা "হোমর" যে তাঁহাদের নিজনগরবাসী, এই দাবী তুলিয়া মহাবিবাদ করিতেছেন।

মহাকবি সেক্সপিয়র যে কথিত চেয়ারে বসিয়া কল্পনারাজ্যে বিচরণ করিতেন, আলাদিনের প্রদীপের ন্যায় সেই অলৌকিক গুণসম্পন্ন চেয়ারখানির মূল্য ক্রমে বাড়িতে বাড়িতে দশ বিশ হাজার টাকায় বিক্রীত হইয়া বিভিন্ন রাজ্যের "মিউজিয়মের" শোভা ও গরিমা বৃদ্ধি করিতেছে। আমাদের দেশে কিন্তু তত্তুল্য অমর কবিগণের কোনও খোঁজ খবর নাই। তাঁহাদের "নাম ধাম" ক্রমে লোপ হইয়া আসিল। আর দুই চারি দিন পরে উধোর মুণ্ড বুধোর ঘাড়ে লাগাইয়া নামজাদা প্রত্নতত্ত্ব-বিশারদগণ অত্যদ্ভুত গবেষণাবলে এক একটা কিম্ভুত কিমাকার গঠন করিয়া চূড়ান্ত বাহাদুরী লইবেন এবং হয়তো পরবৎসরেই রায় সাহেব হইয়া যাইবেন।

পিতৃপুরুষের পুণ্যাশীর্ব্বাদেই হউক বা অন্য কোন কারণে হউক, আজ কাল দেশের হাওয়া যেন একটুকু ফিরিয়াছে। সে দুরন্ত পশ্চিমে বাঁওয়াল ঘুরিয়া দেহমন প্রফুল্লকারী দাক্ষিণ মলয় পবন ঝির ঝির করিয়া বহিতে আরম্ভ হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে মৃতপ্রায় জীবনে নবজীবন সঞ্চারিত হইতেছে। কিরূপ বিচিত্র ভাবে ভগবৎকৃপায় এই শুষ্কতরু মুঞ্জরিত হইতেছে তাহার একটি সত্য উপাখ্যান পাঠকবর্গকে শুনাইতেছি।

সে আজ প্রায় সতের বৎসরের কথা। তখন দেশবরেণ্য কবিসম্রাট্ পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনেক সময়ে তাঁহার পল্লী-নিকেতন সিলাইদহে বাস করিতেন। চাকুরী উপলক্ষে তখন আমারও তাঁহার আশ্রয়ে থাকিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল, এবং অপরাহ্ণে পদ্মাবক্ষে ধীর সমীরে তাঁহার মুখের খোসগল্প শ্রবণে স্বর্গরাজ্যে বিচরণের আনন্দ উপভোগ করিতাম। জমিদারীর শুভপুণ্যাহ উপলক্ষে আমরা সস্তায় পাইয়া এক সময়ে ঠাকুর বাবুদের প্রজা শিবুকীর্ত্তনীয়ার লীলাকীর্ত্তন লাগাইয়া দিই। শিবু উচ্চদরের গায়ক না হইলেও তাহার ঈশ্বরদত্ত সঙ্গীত-রসে একটু বেশ অধিকার ছিল। আর সে লীলা-কীর্ত্তনে নিজের প্রাণটা মিশাইয়া দিয়া গান গাইত। অনেকে তাহার অত্যন্ত মুদ্রা দোষের নিন্দা করিতেন, কিন্তু তাহার হাবভাব নৃত্যভঙ্গী সে ইচ্ছা করিয়া করিত না, যখন যে লীলার যে অভিনয় করিত, সেই সেই

ভাবে অনুভাবিত হইয়াই করিত, সুতরাং রসগ্রাহী শ্রোতা তাহাকে অপছন্দ করিতেন না। শিবুর কিন্তু আর একটী নিয়ম ছিল—সে প্রাচীন মহাজনের পদ ভিন্ন গাইত না।

বাল্য জীবনে যিনি ভানুসিংহ পদাবলী রচনা করিয়া মধুর ব্রজরসের অপূর্ব্ব মাধুর্য্য নিজে আস্বাদন করিয়াছেন এবং ভক্তবৃন্দকেও আস্বাদন করাইয়া পরিতৃপ্ত করিয়াছেন, সেই দেশবিশ্রুত ভারত গৌরব কবিচূড়ামণি সন্নিকটে "কুটীবাড়ী"তে আছেন আর এখানে কাছারী বাড়ীতে প্রাচীন মহাজনের মধুর পদাবলী কীর্ত্তিত হইতেছে, এক্ষেত্রে তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিবার প্রলোভন আমি ছাড়াইতে পারিলাম না। আমি নিজে যাইয়া কিছু ভূমিকা করিয়া শিবুর পরিচয় দিয়া কীর্ত্তন শুনিবার জন্য আহ্বান করিলাম। একটুকু হাসিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "আচ্ছা যাইতেছি, উহাদের আরম্ভের চীৎকার-গুলি হইয়া গেলে সংবাদ দিও।" পাঠক বুঝিয়াছেন ত ? এই চেঁচানিটা হইল "গৌরচন্দ্র।" প্রকৃত পক্ষে ইহাই হইল রসকীর্ত্তনের প্রাণ। ভাবনিধি শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর যে মধুর ভাবে অনুভাবিত হইয়া লীলা-রস আস্বাদন করিতেন, সেই ভাবটী ফুটাইয়া তুলিয়া শ্রোতৃবৃন্দের ইতর-রাগ-দুষ্ট হৃদয়কে নিরমল গৌররসে কলাই করিয়া, তাহাতে নিগূঢ় ব্রজরসের পরিবেষণের যোগ্য করিয়া লইবার জন্যই মহাজনগণ মাথার দিব্য দিয়া এই চিন্তামণি গৌর-চন্দ্রের অবতারণা করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রাণহীন ব্যবসাদার কীর্ত্তনীয়ারা গৌরচন্দ্রের মর্য্যাদা বুঝিল না, তাহারা ভাবের বৈভব ছাড়িয়া কেবল গান জমাইবার জন্য গৌণকে মুখ্য করিয়া তুলিয়াছে; খোলকরতালের বাহাদুরী ও উচ্চ চিতেনের বেজায় আওয়াজে কর্ণ ঝালাপালা করিয়া তুলে। তাহাতে পদকর্ত্তার রচনা-পারিপাট্য বা ভাবমাধুর্য্য কোথায় চাপা পড়িয়া যায়। কাজেই তাহা শ্রোতৃবৃন্দের রুচিকর হইতে পারে না। অনেকেই সেই জন্য "গৌরচন্দ্র"কে ভয় করেন বা স্বর্গের সিঁড়ি মনে করিয়া ঔষধগেলা করেন। কিন্তু আমরা রায় বাহাদুর রসময় বাবুর এবং কীর্ত্তনাচার্য্য ৺প্রতাপ মজুমদারের মুখে "গৌরচন্দ্র" শুনিয়াছি—তাহা যেমন শ্রুতিমধুর, তেমনই উচ্চ ভাবব্যঞ্জক। যাহা হউক, শিবুঠাকুরের কীর্ত্তনে শরীর সুস্থ থাকিলে প্রত্যহই পরমানন্দ হইত, আর শ্রোতাও মিলিয়াছিল ভাল, দেশবিশ্রুত বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশবাবু, চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপিনবিহারী পাল, দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি। সে দিন রাত্রি একটার সময় কীর্ত্তনের বিশ্রাম হইল—তবু সকলের পিপাসা

মিটিল না ; সকলেই মনে করিয়াছিলেন, রাত্রি এগারটার বেশী হয় নাই।

তাই বলিতেছিলাম, আজকাল দেশের হাওয়া একটুকু ফিরিয়াছে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের যাঁহারা বিধাতা পুরুষ, এত দিনে তাঁহাদের সুদৃষ্টি পড়িয়াছে—বৈষ্ণব সাহিত্যে ও দর্শনাদিতে। বঙ্গভাষায় যাঁহারা লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুলেখক, যাঁহারা বঙ্গসাহিত্যে বাস্তবিকই নবযুগের অবতারণা করিতেছেন, রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেনপ্রমুখ সেই ভাষাবিদ্‌গণ সময়োচিত রুচিকর গল্পগ্রন্থে সেই অতি মহান্ ও সুদুর্ব্বোধ্য অথচ পরম মধুর ব্রজলীলার অর্থাৎ ভগবানের নরলীলার চমৎকারিত্ব ও মাধুর্য্যের আভাস ছড়াইতেছেন। সভাসমিতিতে তৃষিত যুবকগণ সেই অতিমধুর (Ice cream) সরবৎ পরম সমাদরে গ্রহণ করিতেছেন।

যাহা হউক, আমরা যে বিষয় বলিতে আরম্ভ করিয়া কথায় কথায় এত দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, সেই কবীন্দ্র গোবিন্দদাসের বিষয় এক্ষণে যৎসামান্য কিঞ্চিৎ আলোচনা করি।

গোবিন্দ দাস কবিরাজের চরিত্র শ্রীভক্তমাল গ্রন্থে বিস্তারিত বিবৃত আছে। গোবিন্দ, রামচন্দ্র কাবরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। রামচন্দ্র প্রথমেই যখন শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, তখন গোবিন্দ মাতৃসেবক ছিলেন, পরিণত বয়সে গোবিন্দ গ্রহনী রোগে মৃত্যু শয্যায় শায়িত হইয়া শ্রীআচার্য্য প্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত হয়েন। তখনই শ্রীগুরুকৃপায় তাঁহার অপূর্ব্ব মনোহরসাহী কীর্ত্তনের ফোয়ারা খুলিয়া যায়। তাহার প্রথম গান হইল। "ভজহু রে মন নন্দনন্দন অভয় চরণারবিন্দ রে"। এই গীতে সাধকের নবধা ভক্তি-সাধন বিষয় সরলভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং পূর্ব্বে যে ঐহিক সুখের জন্য মায়ের সেবা করিয়া জীবন পাত করিয়াছেন, তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে। স্বভাব বর্ণনে গোবিন্দদাস ঠিক বিদ্যাপতির পরবর্ত্তী আসন পাইবার যোগ্য আর লীলাকীর্ত্তনে গোবিন্দদাসের ভাব-মাধুর্য্য ও পদলালিত্য অতুলনীয়। পূর্ব্বে বর্দ্ধমান জেলার শ্রীখণ্ডে ইহাঁর বাস ছিল, পরে মুরশিদাবাদ জেলায় বুধুরী গ্রামে পশ্চিম পাড়ায় বাস করিতেন। বুধুরীর নির্জ্জন আশ্রয় কুঞ্জ হইতে শ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীগৌরাঙ্গ-মাধুরী-ব্যঞ্জক হৃৎকর্ণরসায়ন গীতাবলী প্রকটিত হইয়াছে। যে বুধুরী এক সময়ে শ্রীআচার্য্য প্রভুর প্রিয় পরিকর নরোত্তম রামচন্দ্র প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের প্রেমোচ্চারিত নানাবিধ লীলাকীর্ত্তনে অহর্নিশি

মুখরিত থাকিত তাহাই এক্ষণে ম্যালেরিয়ার আকর ভূমি হইয়া উৎসন্নপ্রায় হইয়াছে দেশবাসীরা চারিদিকে উঠিয়া গিয়াছেন ও যাইতেছেন। গোবিন্দের সেবিত শ্রীনিতাই-গৌরের মধ্যে সম্ভবতঃ শ্রীনিত্যানন্দ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সমাজে স্থান না পাইয়া রামাইত সম্প্রদায়ের আখড়ায় আশ্রয় লইয়াছেন গোবিন্দ কবিরাজের শেষ বংশধর শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন কবিরাজ ম্যালেরিয়া প্রাপ্ত ও প্লীহাভারাক্রান্ত হইয়া শ্রীগোবিন্দের সেবিত শ্রীগোপালবিগ্রহ ও পুঁথি পাজি লইয়া অদূরে ভগবানগোলার ধারে আসিয়াছেন। আর কিছু দিন পরে গোবিন্দের বাসস্থানাদিও চিহ্ন বিলুপ্ত হইবে এখনও সাহিত্যানুরাগী সহৃদয় জনগণের দৃষ্টিপতিত হইলে একটী বড় মহাজনের স্মৃতিরক্ষা হইয়া কথঞ্চিৎ ঋণ পরিশোধ হইতে পারে। বুধুরী মুর্শিদাবাদ লাইনের ভগবানগোলার সন্নিকট, ষ্টেশন হইতে ১ এক মাইল দূরে অবস্থিত।

শ্রীবামাচরণ বসু।

শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রদাস—প্রসঙ্গ

[প্রথম সাক্ষাৎ। ১৩০৭ সাল ২৭ জ্যৈষ্ঠ শনিবার (ইংরাজি ১৯০০ সাল ১১ই জুন)] আর তিন দিন প'রে আমাদের পানিহাটীতে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর "দণ্ড মহোৎসব"। এ দেশের কাঙ্গাল ভক্তগণের আগমন হ'য়েছে, স্থানে স্থানে তাঁরা বাসা ক'রেছেন। সকাল সন্ধ্যায় কেহ খঞ্জনী, কেহ গোপীযন্ত্র, কেহ আনন্দ লহরী, কেহ বা শুধু করতালি বাজিয়ে গৌর-কীর্ত্তন কচ্ছেন। বঙ্গদেশীয় ভক্তগণের মুখে ঐ দেশীয় ভাষায় "যে দেশে গৌরাঙ্গ আছে সেই দেশে মুই যাবোরে" প্রভৃতি গানগুলি আমাদের বড়ই মিষ্টি লাগচে। আমরা আমাদের পল্লীর সেই ভাবী আনন্দের দিন স্মরণ ক'রে বিভোর হ'য়ে আছি, কেবল মনে হ'চ্ছে আর দুটো দিন কেটে গেলেই হয়।

আমি যথনকার কথা বলছি তখন গ্রামের মধ্যে ১৩টী বৈষ্ণব-আখড়া ছিল, এবং অনেকগুলি পতিত বাড়ী ছিল, অধিকন্তু গ্রামবাসীগণেরও সাধু সন্ন্যাসীর উপর শ্রদ্ধা ভক্তি যথেষ্ট ছিল, এজন্য দণ্ডমহোৎসবের ৮।১০ দিন পূর্ব্ব হইতেই সাধু বৈষ্ণবগণের আগমন হইত। অনেকেই বহুদূর হইতে পদব্রজে

আগমন করিতেন। মহোৎসবের প্রথম আনন্দ ঐ সব বৈষ্ণবগণের আগমন দ্বারা আমাদের প্রাণে জাগিয়া উঠিত।

আমি তখন পানিহাটী হইতে ৩ মাইল পূর্ব্বদিকে "তেঘরা শ্রমজীবী বিদ্যালয়ে" কাজ করিতাম। বেলা ১১ টার সময়ে বিদ্যালয়ে যাইবার জন্য বাহির হইয়াছি। নিত্য যে পথ দিয়ে যাই আজ তা না গিয়ে পাটবাড়ী বা শ্রীরাঘবভবনের পথ দিয়ে চলিলাম। উদ্দেশ্য পাট বাড়ীতে মহোৎসবের কি আয়োজন হইতেছে তা দেখে যাব। রাস্তার উপরেই গেটের সম্মুখ হ'তে শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউর মন্দিরের দিকে চাহিতেই দেখি দেবালয়ের বাহিরের রকে উড়িষ্যা দেশবাসীর মত একজন বাবাজী ব'সে ব'সে কীর্ত্তন করচেন (নিতাই গৌর রাধেশ্যাম হরে কৃষ্ণ হরে রাম।) উভয়ের চোখো চোখি হবা মাত্র বাবাজী আমাকে মাথা নুইয়ে নমস্কার করলেন। আমি সেদিকে বিশেষ লক্ষ না করে হন্ হন্ করে চল্‌তে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় দেবালয় হইতে কিছু দূর চলে যাবার পরই আমার মনটা যেন কি রকম ক'রে উঠলো। বাবাজী আমাকে দণ্ডবৎ করলেন আমি তাঁকে ভাল করে দেখলুমও না আর প্রতিনমস্কারও করিলামনা। ভাবতে ভাবতে দাঁড়াইয়া পড়লুম, তারপরে যেন কেমন একটা আবর্ষণে মন্ত্রমুগ্ধের মত আমি পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন ক'রে গেটের কাছে এসে দাঁড়াইলাম, এবারেও আমি এসে বাবাজীর সুমুখে দাঁড়াতে বাবাজী নমস্কার করিলেন, আমিও প্রণাম করিলাম। ইচ্ছে হাচ্ছিলো কিছুক্ষণ দাঁড়াই কিন্তু কার্য্যস্থলে যাবার বেলা হয়ে যাচ্ছে ভেবে পুনরায় চলে গেলাম।

কার্য্যক্ষেত্রে গিয়ে সব ভুলে গেলাম। যথা সময়ে বাড়ীতে এসে বিশ্রাম ক'রে রাত্র প্রায় ৮ টার সময়ে গঙ্গার তীরে রাজা রামচাঁদের ঘাটে বেড়াইতে গেলাম। জ্যৈষ্ঠমাস খুব গরম কাল—গঙ্গার তীর, দক্ষিণে বাতাস, সর্ব্বোপরি দশমীর চন্দ্র জোৎস্না ঢেলে দিয়েছে। গঙ্গার ধারে আসতে প্রাণ যেন শীতল হলো প্রকৃতির শোভায় মন বিমোহিত হলো। গাছ পালা জল আকাশ সব যেন ছবির মত—সব যেন সপ্নরাজ্যের মত বোধ হ'তে লাগলো।

ঘাটে ৪।৫ টী সমবয়স্ক যুবক ব'সে ছিলো এরা সব উচ্চ শিক্ষিত অর্থাৎ সহজে কাকেও বিশ্বাস করেন না। আমি যাইতে একজন বল্লে—"অমল! একজন বাবাজী এসেছে, চেহারা তাঁর তেমন ভাল নয়, কিন্তু ভাই সে যা কথা বার্ত্তা বললে তা পাশ্চাত্য দর্শন বিজ্ঞানের সব ছাঁকা ছাঁকা কথা। লোকটী খুব পণ্ডিত আর বিনয়ী। আশ্চর্য্যের বিষয় এত সব বড় বড কথা বললে কিন্তু

ভুলেও একটা ইংরাজি শব্দ বেরুলো না। বাইরের লোকে তাঁকে চিনতে না পারে এমন একটা গোপন ভাবে তিনি থাকেন। কি সরল, কি দীনভাব আমরা দেখে অবাক হয়েছি, "ধুকড়ির ভেতর খাসা চাল"।

এদের কথা শুনে আমার সকাল বেলার সেই বাবাজীর কথা মনে হলো, তাই সর্ব্বাগ্রে বাবাজির চেহারাটা কেমন তাই জিজ্ঞাসা করিলাম। এদের বর্ণনাতে অবিকল মিলে যাওয়াতে সকালের সেই বাবাজীকেই যে এরা দেখেছে, তাই বুঝে নিয়ে সকালের ঘটনাটী বলিলাম। শুনে সকলেই আশ্চর্য্য হ'লো। বাবাজীকে তখন দেখিবার জন্য আমার খুব আগ্রহ হ'লো এজন্য কোথায় তিনি আছেন জিজ্ঞাসা করাতে বন্ধু যুবকগণ বটতলায় (দশুমহোৎসব তলার) পোস্তার দিকে আছেন বল্লেন আমি তাড়াতাড়ি সেই স্থানে গিয়ে দেখি বৃক্ষ রাজের মূলেতে মস্তক রেখে বাবাজী শুয়ে আছেন। আমি যাবামাত্রেই বলিলেন,—"কে ভাই তুমি?"

কত লোকের মুখ হতে তো ঐ কথা কতবার শুনেছি কিন্তু "কে ভাই তুমি" এই কটি শব্দ এমন মিষ্টি ভাবে--এমন সরলতা মাখিয়ে বলিলেন যে, শুনিবামাত্রই আমার প্রাণটা যেন ঠাণ্ডা হ'য়ে গেলো। আমি কাছে ব'সে ব'সে পরিচয় দিতে লাগিলাম। তার পরে সকালের সাক্ষাতের কথা বলাতে বলিলেন,—ওঃ! তুমিই তখন যাচ্ছিলে আবার ফিরে এলে না?" বলে একটু হাস্য করলেন। তার পরে আমার সংসারে কে কে আছেন, জীবিকার অবলম্বন কি ইত্যাদি কথা গুলি যেন কত পরমাত্মীয়ের ন্যায় জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। আমিও প্রাণ খুলে সব কথা বল্‌তে লাগিলাম। শেষে বললেন,—ধর্ম্ম কর্ম্ম কিছু করা হয় কি?" উত্তরে যা বলবার তাই বলিলাম। (কত ছেলে মানুষি কথাও দাদাকে সেই সময়ে ব'লেছিলাম সে সব মনে হ'লে এখন লজ্জা হয়।)

বাবাজী মহাশয় প্রথম প্রথম আমার সঙ্গে "আপনি আপনি" পরে "তুমি তুমি" ক'রে শেষে একেবারে "তুই" ব'লে সম্বোধন ক'রে আমাকে যেন প্রকৃতই আপনার ক'রে নিলেন। আমার সঙ্গে দাদা ভাই সম্বন্ধ হ'য়ে গেলো। দাদা বৃক্ষ-তলে রাত্র যাপন করবেন এজন্য কোন গৃহ মধ্যে থাকতে চাইলেন না। বেশী রাত্রে হওয়ায় আমি বাড়ী চলে গেলাম।

দাদার পরিচয় নেবার আগ্রহ তখন হয়নি। তবে এই মাত্র জানিলাম দাদার নাম শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র দাস, বাঙ্গালী, কটক হ'তে এদিকে এসেছেন।

(২৮ জ্যৈষ্ঠ রবিবার) কার্য্যান্তে দাদার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য

বৃক্ষতলে আসিলাম। প্রথম সাক্ষাৎ মুহূর্ত্তমাত্র, তারপর সাক্ষাৎ বৃক্ষতলে রাত্রে, তাই দাদার চেহারাটা ভাল করে দেখা হয় নাই। তাই আজ বৈকালে গিয়ে দাদার চেহারাটা বেশ পরিষ্কার ভাবে দেখিলাম রং কাল, লম্বা, রোগা, সম্মুখের দাত একটু উচু, কথা বলবার সময়ে দন্ত দেখা যায়, মুণ্ডিত মস্তক, গলদেশে তুলসীর কণ্ঠি বয়ক্রম আন্দাজ ৩২ বৎসর, পরিধানে মলিন কৌপিন ও বহির্ব্বাস, গাত্রে একখানি খুব লম্বা ও চওড়া মলিন চাদর। বাংলাতে কথা না বল্লে উড়িয়াবাসী সাধারণ লোক বলেই মনে হয়। মোট কথা দাদার চেহারাটা তেমন ভাল নয়, কিন্তু চোক মুখ এমন উজ্জ্বল, এমন পবিত্র, যেন একটা নির্ম্মল ঠাণ্ডা জ্যোতি মুখ থেকে ফুটে বেরুচ্চে। মুখেতে সদাই আনন্দ মাখান র'য়েছে। হাসি ভিন্ন কথা নেই। যা কথা বলেন তা যেন হৃদয়ের অন্তস্থল হ'তে ভালবাসা মাখিয়ে।

দাদার কাছে গিয়ে দেখি একজন বাঙ্গালী সাধু বসে আছেন, সাধুটীর পরিধানে একখানি পুরাতন ছিন্ন লাল রঙের চেলির কাপড়, গলায় পৈতা। দাদা আমাকে দেখে চিরপরিচিতের মত কাছে বসতে ব'লে সাধুকে দেখিয়ে বল্লেন "এঁর নাম রায় মশায়, পথেতে আলাপ হ'য়েছিল উপস্থিত দুজনে এক সঙ্গে আছি।" আমি উভয়কে দণ্ডবৎ ক'রে জিজ্ঞাসা করলুম—"আজকে কি সেবা করলেন?"

দাদা—"ভাই। যখন ক্ষিধে পেলে তখন দেখি ঠাকুর বাড়ীর * প্রসাদ বিতরণ শেষ হয়ে গেছে।"

"তার পরে রায় মহাশয়ও বলেন—ক্ষিধে পেয়েছে" শুনে কি করবো ভাবচি, এমন সময়ে ঠাকুরবাড়ীর ঘাটের দক্ষিণ কোণের পোস্তার নিচেতে দেখি বিস্তর প্রসাদের পাতা পড়ে র'য়েছে তাতে এত অবশিষ্ট মহাপ্রসাদ পড়ে র'য়েছে যে একটা কুকুরে খেয়ে ফুরুতে পারচে না, এই দেখে ওখানথেকে প্রসাদ কুড়িয়ে এনে দুজনে খুব খেলুম খুব পেট ভরে গেছে।"

---

† (স্বর্গীয় বিশ্বম্ভর সেনের পানিহাটীস্থ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মন্দির, বৃক্ষতলের পূর্ব্ব গায়ে, এই ভক্ত পরিবারগণ চিরকালই বৈষ্ণব সেবা পরায়ণ। চিরকালই অকাতরে অতিথি অভ্যাগতকে প্রসাদ বিতরণ করিয়া আসিতেছেন। গৌর-তীর্থ শ্রীপাট পানিহাটীতে প্রায় ২০০ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ বিগ্রহ স্থাপন করে গ্রামকে উজ্জ্বলতর ক'রে ছিলেন। ভক্তবর বেনীমাধব সেন ও তাঁহার পুত্রগণ পূর্ব্ব পুরুষগণের কীর্ত্তি অক্ষুন্ন রেখে ছিলেন।

এই কথাবার্ত্তার সময়ে একটি বাবু কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন—তিনি শুনে আশ্চার্য্যভাবে বললেন :—কুকুরের এটো খেলেন! ওতে যে "হাইড্রফেপিয়া" (জলাতঙ্ক রোগ) হয়—" দাদা শুনে হাঁসতে লাগলেন।

তারপর দাদা আমার দিকে চেয়ে বল্লেন "আজ সকালে ভাই একটা বড় অন্যায় কাজ ক'রে ফেলেছি।"

আমি :—"কি হয়েছিলো ?"

দাদা :—গ্রামের উত্তর দিকে একটী ডাক্তারখানা, তার সম্মুখে একটী বাঁধান বেলগাছ আছে না ?

আমি :—হাঁ হাঁ রাধিকানাথ চাটুষোর বাড়ী ও ডাক্তারখানা। তা কি হয়েছে ?

দাদা :—ঐ ডাক্তারখানার উত্তর দিকে একটা জঙ্গল দেখে আমি আর ইনি (রামমশায়) প্রাতে শৌচে গিয়েছিলুম। উঠে আসচি, এমন সময়ে একটী বাবু (ডাক্তারবাবু) এসে বল্লেন "কে তোরা ? এর ভিতরে কি ক'রতে গিয়েছিলি ?"

"আমি বল্লুন "বাবা শৌচে গিয়েছিলুম।"

তাই শুনে বাবুটী অগ্নিশর্ম্মাহ'য়ে বলেলেন :—ব্যাটারা বাগানের মধ্যে শৌচে যাবার যায়গা পেয়েচো—চল নিজের হাতে ময়লা সাফ্ কর্ব্বি তবে ছেড়ে দেবো।"

কাজেই বাবুর কথামত সেইসব পরিত্যাক্ত মল হাত দিয়ে পরিষ্কার করে এলুম। বাবুটী গালাগালি করতে করতে চলে গেলেন।

ভাই। পরের বাগানে না জেনেশুনে মলত্যাগ ক'রেছি, বড়ই অন্যায় কাজ করেছি, না ভাই!

আমি দাদার কথাশুনে অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলুম—আর ভাবতে লাগলুম হায়! এমন লোককে মানুষ চিনতে পারে না কেন ? বোঝেনা কেন ? তার পরে রাধিকা ডাক্তারের ওপর ভারি রাগ হ'তে লাগলো।—

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর দণ্ড মহোৎসব।

[১৩০৭ সাল ২৯শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার শুক্লা ত্রয়োদশী (ইং ১৯০০।১৩ই জুন)]

আজ সেই দিন—যে দিন পাণিহাটীতে দয়ার অবতার শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ

প্রভুর নিকট বাঙ্গালার বুদ্ধদেব শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী সর্ব্বস্বত্যাগ করে কৃপাভিক্ষাক'রতে আগমন করেছিলেন আজ সেই প্রেমময়ের প্রেমলীলা রঘুনাথদাসের 'দণ্ড উৎসব'। সব স্মৃতিই উজ্জ্বলভাবে আছে, সেই পুন্য-তোয়া মা ভাগীরথী, সেই পাণিহাটী, সেই প্রস্থায় শীতল ৬০০ বৎসরের বটবৃক্ষরূপ সেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর বসিবার পিণ্ডা বা বেদী ৺পুরী হইতে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব আগমন করিয়া যে গঙ্গাবর্ত্তে শ্রীচরণার্পন করিয়াছিলেন সেই প্রাচীন ইষ্টক নির্ম্মিত ভগ্নঘাট, শ্রীল রাঘবপণ্ডিতের ভবন, সেই রাঘব প্রদত্ত নারিকেল ভোজনকারী ভুবন মোহন শ্রীশ্রীমদন মোহন বিগ্রহ, রাঘবপণ্ডিতের সমাধী ও মালতীকুঞ্জ প্রভৃতি অতীতের সব স্মৃতি এখনও পাণিহাটীতে বিশেষভাবে বর্ত্তমান রহিয়া লীলার সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। ভক্তমুখে শুনিয়াছি—"সে পাষাণগলান লীলাও পাণিহাটীতে অদ্যাপি হয়। কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।"

মহাপ্রভুর শ্রীমুখের বাণী,—

শচীর রন্ধনে, শ্রীবাস অঙ্গনে,
রাঘবভবনে, আর নিতাই নর্ত্তনে,
নিত্যময় আবির্ভাব শুন ভক্তগণে। (শ্রীচরিতামৃত)

মহাপ্রভু যে পাণিহাটীর রাঘবভবনে প্রেমডোরে চির আবদ্ধ আছেন, তা এই দণ্ড মহোৎসবদিনে ভাগ্যবান অভাগাবান সকলকেই জানিয়ে দেয়।

বেলা ৯টা বাজিতে না বাজিতেই চারিদিক হ'তে অসংখ্য ভক্তের সমাগম হতে লাগলো, ক্রমে ক্রমে সংকীর্ত্তন সম্প্রদায়ে বৃক্ষতল পূর্ণ হয়ে গেল। আর কিছু শুনা যায় না কেবল খোল করতাল ও রামসিঙার ধুধু শব্দ, ও মধুর শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গনাম। ভক্তগণ প্রেমোন্মাদে নৃত্য করিতে করিতে ধুলায় গড়াগড়ি দিচ্ছেন। চারিদিকেই প্রেমের খেলা কে কাহাকে দেখে। চিড়াদধি ও নানাবিধ ফলদিয়ে বেদীর উপরে অনবরত মালসাভোগ দেওয়া হচ্ছে। সেই প্রসাদ জাত্যাভিমান ভুলে বৃদ্ধ যুবা বালক সকলেই কাড়া-কাড়ি করে ভোজন করছে, প্রেম বন্যায় যেন সব ভেসে যাচ্ছে।

ঠিক মধ্যাহ্ন সময়ে যে সময়ে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভু রঘুনাথ প্রদত্ত চিড়াদধি বেদীতে রেখে পুরীধাম হ'তে মহাপ্রভুকে এনে তাঁর মুখেতুলে খাইয়ে দিয়েছিলেন—সেই সময়টায় স্বতই সকলকে ভক্তিতে আকৃষ্ট করে দেয়—তা যতই পাপিষ্ঠ হই না কেন।

তারপরে অপরাহ্ণ না হইতে হইতেই সেই জনসমুদ্র কোথায় মিলিয়ে গেল। বৃক্ষতল ও পথঘাট নিত্য যেমন নির্জ্জন থাকে আবার তেমনি হ'য়ে গেলো, আশ্চর্য্য ব্যাপার, কোন নিমন্ত্রণ নাই, বিজ্ঞাপন নাই, সংবাদপত্রে হৈ চৈ নাই, কবে যে মহোৎসব তা গ্রামবাসীদেরও অনেকে জানেন না, অথচ ঠিকদিনে কি বিরাট ব্যাপার! সহস্র সহস্র ভক্তসমাগম। সাধুসন্ন্যাসী, ধনী নির্ধন, ব্রাহ্মণ শূদ্র যেন কি এক মহামন্ত্রে কিছুক্ষণ মুগ্ধহ'য়ে নৃত্যগীত হাস্য-ক্রন্দন করিতে করিতে অকস্মাৎ কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গেলো।

উৎসবের প্রায় সারাদিনই আমি দাদার কাছে কাছে থেকে ঘুরিতে লাগিলাম। উদ্দেশ্য আজ দাদা কি করেন তা দেখবো। কিন্তু দাদা আজ কি রকম হ'য়ে গেলেন। চোখদুটি লাল, আর ঠিক মাতালের মত অস্থির ভাব। এক একবার কীর্ত্তনসম্প্রদায়ের মধ্যে যাচ্ছেন আবার খানিক থেকেই চলে আস্‌চেন ও বৃক্ষগাত্রে হেলান দিয়ে সামলে নিচ্ছেন। পুনরায় তন্দ্রাবিষ্টের মত চক্ষুচেয়ে আবার কীর্ত্তনমধ্যে যাচ্ছেন ও ফিরে আসচেন, এই প্রকার করিতে লাগিলেন। আমি দাদাকে বলিলাম - "ওদের সঙ্গে কীর্ত্তন করনা দাদা!"

দাদা বল্লেন—"না ভাই।" আমি বলিলাম "কেন"? দাদা বল্লেন "তা হলে এখনি একটা হৈ রৈ হ'য়ে পড়বে।" এই বলে চুপ ক'রে রইলেন।

আমার কিন্তু মজা দেখিবার ইচ্ছে যোল আনা। কি কাণ্ড হয় তা একবার হয়ে যাক না দেখি। তাই দাদাকে আরও কয়েকবার বল্লুম, দাদা কোন কথা না বলে মহা গম্ভীরের মত দাঁড়িয়ে রইলেন। খানিক বাদে অবসের মত এক স্থানে ব'সে পড়লেন।

কীর্ত্তনাদি হ'য়ে যাবার পর খুব বৃষ্টি হলো বৃক্ষ তলে জল ও কাদাতে পূর্ণ হলো। দাদা বললেন—বৃক্ষতলে ত্রিরাত্র বাস করবো মনে ক'রে ছিলাম কিন্তু হলো না। আজ একটা শোবার জায়গা দিতে পারিস? আমি বল্লুম খুব পারবো। আমাদের বাড়ীর কাছে গঙ্গার ধারে পণ্ডিত রঘুনাথ মিশ্রের যে "দি রিট রিট" বলে বাগান বাড়ী আছে সেই স্থানটী খুব নির্জ্জন বলে সেই খানেই রাত্রে দাদার শয়নের ব্যবস্থা করলুম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট।

নিবেদন

সহৃদয় গ্রাহক মহোদয়গণ। করুণাসিন্ধু পরম দয়াল শ্রীভগবানের কৃপায় আমরা ভক্তি দেবীর আর একটী বর্ষ পূর্ণ করিবার অবসর পাইলাম। আগামী শ্রাবণ মাসে ভক্তি ২০ শ বর্ষ পূর্ণ হইবে। ভাদ্র হইতেই ২১শ বর্ষ আরম্ভ। দিন থাকিতে আমরা এ আনন্দ সংবাদ গ্রাহকগণকে দিয়া রাখিলাম। এতৎসহ আরও একটী সংবাদ না জানাইয়া পারিলাম না। বরাবর আমরা ভক্তি ভিঃ পি করিয়াই গ্রাহকগণের নিকট হইতে বার্ষিক মূল্য গ্রহণ করিয়া থাকি। কিন্তু বর্ত্তমানে ডাক ঘরের নূতন নিয়মানুসারে ভিঃ পি করিলে অনর্থক গ্রাহকগণের।• চার আনা বেশী লাগে উহাতে আমাদের কিন্তু কোনই লাভ নাই। কিন্তু গ্রাহকগণ যদি নিজ নিজ দেয় বার্ষিক চাঁদা মণিঅর্ডার করিয়া পাঠান, তাহা হইলে তাঁহাদিগের দুই আনা খরচেই হইতে পারে। তাই আমাদিগের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ গ্রাহকগণ আগামী ২১ শ বর্ষের চাঁদা ১৷৷• দেড় টাকা ভাদ্র মাসের মধ্যেই আমাদিগকে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

তারপর আর একটী বিশেষ নিবেদন, যদি কেহ আগামী বর্ষের জন্য ভক্তির গ্রাহক থাকিতে ইচ্ছা না করেন তিনি দয়া করিয়া একখানি পোষ্টকার্ড দ্বারা তাহা আমাদিগকে জানাইবেন, কারণ একটা ভিঃ পি ফেরৎ আসিলে অনর্থক আমাদিগের ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। ১০ই ভাদ্র পর্য্যন্ত আমরা গ্রাহকগণের টাকা কিম্বা পত্রাদির অপেক্ষা করিব তাহার পরই আমরা একে একে সকলকে ভাদ্র মাসের ভক্তি ভিঃ পি করিব। তখন ভিঃ পি ফেরৎ দিয়া আমাদিগকে অকারণ ক্ষতিগ্রস্ত না করেন ইহাই আমাদিগের একান্ত নিবেদন।

আগামী বর্ষের জন্য আমরা কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক পাইয়াছি। বলা বাহুল্য তাঁহারা দয়া করিয়া প্রতিমাসেই তাঁহাদের গভীর গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধাদি ভক্তিতে দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। তারপর **ভাদ্র মাস হইতে ভক্তির কলেবর কিছু বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছা আছে** এক্ষণে গ্রাহকগণের সহানুভূতি পাইলেই আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারিব।

বিনীত

"ভক্তি" কার্য্যাধ্যক্ষ

ভক্তি

(২০শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩২৯ সাল)

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্ ॥"

প্রার্থনা

সদা সুখার্থৈন করোমি কর্ম্ম
ন তৈঃ সুখং চিত্ত শমং লভেঽহং।
ত্বয্যেব চিত্তং মন ইন্দ্রিয়াণি
প্রণোদয় স্বাত্মরতির্যথাস্যাৎ ॥

দয়াময়। সুখের প্রত্যাশা করিয়া সর্ব্বদাই নানাবিধ কর্ম্ম করি, কিন্তু আশা পূর্ণ হয় না, প্রাণ জুড়ায় না, মন-মাতান সুখ পাই না। বিশেষতঃ দুঃখের ও ভাবনার কারণ এই যে, আমার কৃত-কর্ম্মের ফল বিপরীত হয়! সুখের আশায় কর্ম্ম করি কিন্তু ফল হয় দুঃখ, মন স্থির করিবার জন্য অনুষ্ঠিত কর্ম্মে নানাবিধ ভাবনা। চঞ্চলতা, শান্তির পরিবর্ত্তে ঘোর অশান্তিই ভোগ করি। তাই তোমার নিকট প্রার্থনা যাহাতে আমার চিত্ত, মন ও ইন্দ্রিয় সকল তোমার ভাবে বিভোর হইয়া তোমারই কর্ম্ম করিয়া শান্তি লাভ করিতে পারে তাহা কর।

তোমার কৃপায় সাধু-ভক্তের সঙ্গগুণে বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে, অকপটে তোমার নাম গুণাদি শ্রবণ কীর্ত্তন করি না বলিয়াই তত্ত্বজ্ঞান সংহারিণী, অসৎ ভাবের একমাত্র জননী, সন্তাপদায়িনী মায়া আমাকে আক্রমণ করিয়াছে এবং ঐ মায়ার দাস হইয়া উহারই আদিষ্ট বিষয় সকল ভাবনা ও ব্যবহার করিয়া সেই দুষ্কর্ম্মের ফলেই রোগ, শোক, দুঃখ, পরিতাপাদি ভোগ করিতেছি। প্রভো! এ যাতনা, এ মোহ, এ দুর্ভাবনা একমাত্র তোমার কৃপাভিন্ন যাইবার নয় তাই আজ তোমার নিকট প্রার্থনা তুমি দয়া করিয়া আমার এই সকল দূর করিয়া

মায়ার দাসত্ব হইতে উদ্ধার কর আমি তোমার হইয়া তোমাতে আত্মসমর্পণ করিয়া চির অশান্তি, চির দুঃখ পরিতাপ দূর করিয়া আনন্দ লাভে ধন্য হই, দয়াময় দয়াকর।

ঝুলন।

(শ্রীগৌরাঙ্গ)

দেখত ঝুলত গৌরচন্দ্র
অপরূপ দ্বিজমণিয়া।
বিধির অবধি রূপনিরুপম
কষিত কাঞ্চন জিনিয়া॥
ঝুলায়ত কত ভকতবৃন্দ
গৌরচন্দ্র বেড়িয়া।
আনন্দে সঘন জয় জয় রব
উথলে নগর নদীয়া॥
নয়ন কমল মুখনিরমল
শারদচন্দ্র জিনিয়া।
নগরের লোক ধায় একমুখ
হরিহরি ধ্বনি শুনিয়া॥
ধন্য কলিযুগ গোরা অবতার
সুরধুনী ধনি ধনিয়া।
গোরাচাঁদ বিনে আন নাহি মনে
বাসুঘোষে কহে জানিয়া

(শ্রীরাধা-কৃষ্ণ)

ঝুলত শ্যাম গোরি বাম
আনন্দ-রঙ্গে মাতিয়া।

ঈষত হসিত রভস-কেলি ঝুলায়তসব সখিনি মেলি
গায়ত কত ভাতিয়া ॥
হেম মণিযুত বর হিঁড়োর রচিত কুসুম গন্ধে ভোর
পড়ল ভ্রমর পাঁতিয়া।
নবীন লতায় জড়িত ডাল বৃন্দাবিপিন শোভিত ভাল
চাঁদ-উজোর রাতিয়া ॥
নবঘনতনু দোলায় শ্যাম রাইসঙ্গে ঝুলত বাম
তড়িত জড়িত-কাঁতিয়া।
তারামণি চন্দ্রহার ঝুলিতে দোলিত গলেমোহার
হিলন দুহুঁক গাতিয়া ॥
ধিধি কট ধিয়া তা থিয়া বোল বাজে মৃদঙ্গ মোহনরোল
তিনিনা তিনিয়া তা তিয়া।
ভেদপরণ গ্রামপূর বোরশবদ জীতল সুর
বরণ নাচিক যাতিয়া ॥
মণি আভরণ কিঙ্কিণি বঙ্ক ঝুলনেবাজয়ে নূপুর ঝঙ্ক
ঝন ঝন ঝঙ্কাতিয়া।
রাধামোহন চরণে আশ কেবল ভরসা উদ্ধবদাস
রচিত পূরত ছাতিয়া ॥

বিশ্বরূপের সঙ্গীত।

শ্রীযুক্ত রামদাস বাবাজী মহাশয়ের কৃপায় আমরা কয়েক বৎসর হইল একটী বন্ধু পাইয়াছি ইনি নিজের পরিচয় (পূর্ব্ববৃত্তান্ত) দিতে অনিচ্ছুক, আমরা যদিও কিছু কিছু অবগত আছি কিন্তু তাঁহার অনিচ্ছায় আমরা তাহা এক্ষণে প্রকাশ করিব না। ভবিষ্যতে কখনও সুযোগ হইলে ইঁহার বিষয় বিশেষ ভাবেই বলিবার ইচ্ছা রহিল।

বর্ত্তমানে তিনি "বিশ্বরূপ" নামে পরিচিত, কেহ কেহ তাঁহাকে "নগেন গোঁসাই" বলিয়াও ডাকেন। যাহাহউক আমরা "বিশ্বরূপ দাদা" বলিয়াই

ডাকি, আর তিনিও আমাদিগকে সেইভাবেই ভালবাসেন। আমরা তাঁহার অন্যকোন বিষয়ের পরিচয় এখন দিবনা কেবল তাঁহার রচিত সঙ্গীতের কথাই বলিব।

ইনি শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীগৌরলীলার অনেক সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। শুধু বাঙ্গালায় নয়, মধুর ব্রজবুলিতেও ইঁহার সঙ্গীত আছে। আমরা ক্রমে ক্রমে পাঠকগণকে তাহা উপহার দিবার চেষ্টা করিব। বর্ত্তমানে শ্রীমতী রাধিকার মহিমা ও শ্রীঝুলন-লীলা সম্বন্ধীয় দুইখানি সঙ্গীত নিম্নে প্রকাশ করিলাম। এবার হইতে প্রতি মাসেই তাঁহার দুই একখানি করিয়া সঙ্গীত "বিশ্বরূপের সঙ্গীত" নাম দিয়া প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

(১)

জয় রাধিকা বৃষভানু বালিকা জয় কীর্ত্তিদা নন্দিনী।
জয় রাসেশ্বরী রসমাধুরী বংশগৌরব বর্দ্ধিনী॥
জয় বৃন্দাবন কুঞ্জভবন চারিণী নবরঙ্গিনী
জয় ধীর ললিত শ্যাম চরিত গুরু ধৈর্য্যহারিনী॥
জয় শুদ্ধ তপ্তহেমাঙ্গি সু-চারুচন্দ্র বদনি
জয় শ্যাম সরস অঙ্গপরশ লালসে উন্মাদিনী॥
জয় কুন্তলঘন কুঞ্চিত কিবা লম্বিত বেণী দোলনী
জয় মন্দহসনা কমলনয়না কোকিলাকল-কণ্ঠিনী॥
জয় নীলাম্বর বেষ্টিত কটি মণিমণ্ডিত সাজনী
জয় মন্থরগতি চলন চাতুরি-পদেযাবক শোভনী॥
বিশ্বরূপ রচিত মধুর অমৃতরস তরঙ্গিণী
শ্রীরাধাচরিত মহিমাগুণ হৃদিকর্ণ রসায়নী॥

(২)

আজুরে শ্রীবৃন্দাবনে ঝুলন আনন্দলীলা
ঝুলে শ্যামসুন্দর বামে সুন্দরী বৃষভানুবালা॥
সুখদ কালিন্দীকুল, ঝঙ্কৃত অলিকুল
কেলিকদম্বমূল দু'হুরূপে করে আলা॥
নাগরী নবসাজে, সাজায়ত নটরাজে
(ঐ) চরণে নুপুর বাজে গলে দোলে বনমালা॥

রাই রতনমণি, আভরণ বিভূষিণী
বঁধু মুখ চায় ধনি কেলি কৌতুক লীলা ॥
রতন হিন্দোলা ধরি, চঁন্দ্রমুখ হেরি হেরি
ঝুলায়ত সহচরি রঙ্গিণী ব্রজবালা ॥
রসময়ী রসভূপ, ঝুলত অপরূপ
নিরখত বিশ্বরূপ আনন্দে হ'য়ে বিহ্বলা ॥

শ্রী—-——

সন্তোষ

যাবজ্জননং তাবন্মরণং তাবজ্জননীজঠরে শয়নং।
ইতি সংসারে স্ফুটতর দোষঃ কথমিহমানব তব সন্তোষঃ॥
মোহমুদ্গার।

যাবৎ জনমহয় তাবৎ মরণ। জননীর জঠরেতে আবার শয়ন ॥
এসংসার এইরূপ দুঃখের আগার। তবে কেন হে মানব। সন্তোষ তোমার ॥

এই জনম মরণ ধর্ম্মসংক্রান্ত সংসারে দেহাত্মবুদ্ধিবশতঃ আমি কুলীন, আমি বিদ্বান, আমি ধনবান, আমি সুন্দর, আমি অজর অমর বা আমি মহৎ, আর সকলই নীচ ও ক্ষুদ্র; এই জ্ঞানে কোনমানবেরই কাহাকেও তুচ্ছ তাচ্ছল্য জ্ঞান করা উচিত নহে। কারণ অণু পরমাণু হইতে অতি প্রধানতম পদার্থ পর্য্যন্ত প্রত্যেক জীব ও প্রত্যেক পদার্থেই জগতের উপকার সাধিত হইতেছে। আমি একাকী আমার কোন উপকারই সাধন করিতে পারি নাই। অধিক কি জীবনধারণ পর্য্যন্তও একাকীর সাহায্যে কখন সম্পাদিত হয়না। কাহার দ্বারা ও কোন্ কোন্ পদার্থের সাহায্যে আমি জীবিত থাকিতে সক্ষম হইতেছি—আমার দেহ বর্দ্ধিত হইতেছে এবং আমি বিদ্বান, ধনবান, জ্ঞানবান, ও রূপবান বলিয়া এত অহঙ্কার করিতেছি, তাহা অনুভব করিবার শক্তি সত্ত্বেও অভিমান-রূপ সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া কৃতঘ্নের ন্যায় অযথা সন্তোষ লাভ করিতেছি; ইহা বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার। এই অহঙ্কার সম্ভূত অজ্ঞান বিবর্দ্ধক অনিত্য চেষ্টায়ই অশান্তি ও অধঃপতনের মূল।

পঞ্চবটী বনে রঘুবীর শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে উপদেশ প্রদান করিতে করিতে বলিয়াছিলেন—'মুমুক্ষু ব্যক্তিরা জীব হইতে পরমাত্মাকে কখনই ভিন্নজ্ঞান করিবে না এবং অভিমান, দম্ভ, হিংসা প্রভৃতি মানসিক বৃত্তি পরিত্যাগ করিবে। পরকৃত-নিন্দাসহন, কায়মনোবাক্যে ভক্তি সহকারে সদ্গুরু সেবন ও সর্বপ্রাণীর প্রতি সরল ব্যবহার করিবে এবং বাহ্য ও আন্তরিক শৌচ অবলম্বন করিবে। পরের অনিষ্ট চিন্তা, পরনিন্দা ও পরকে হস্তাদি দ্বারা প্রহার করিবে না এবং নিরহঙ্কার হইয়া দেহের জন্ম জরা মরণ আলোচনা করিয়া, স্নেহ শূন্য হইয়া স্ত্রীপুত্রধনাদির আসক্তি পরিত্যাগ করিবে এবং ইষ্টানিষ্ট সমাগমে চিত্তকে সমভাবে রাখিয়া আমাতে অনন্যগত চিত্ত অর্পণ করিবে'।

এই প্রকাণ্ড বহ্মাণ্ডে সকলেই যে পরস্পর সাহায্য সাপেক্ষ, তাহা এই ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ড দেহের পরিচালক, পরিপোষক ও পরিতোষক ইন্দ্রিয় সমূহের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। সহজে বুঝাই বার নিমিত্ত এস্থলে একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা হইল। দেহের মধ্যস্থ উদর, বিনা চেষ্টাতে ইনি পরিপূর্ণ হইয়া বসিয়া থাকেন এই ঈর্ষার বশবর্ত্তী হইয়া ইন্দ্রিয়গণ একদিন পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে, আজ হইতে আমরা আহার আয়োজনের জন্য কোন চেষ্টাই করিব না। দেখাযাউক, উদরের উদর কেমন করিয়া পরিপূর্ণ হয়। এই সিদ্ধান্তে ইন্দ্রিয়গণ প্রথমত নবোৎসাহে উৎসাহিত হইয়া ভোজন পানাদির চেষ্টা ব্যতীত অন্যসকল কার্য্যই অতিউদ্যমের সহিত সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হইল। ক্রমশঃ যখন আহারের সময় অতিক্রান্ত হইল, তখন উদর উহাদের পরামর্শ বুঝিতে পারিয়া সহিষ্ণুতা সহকারে জঠরানলের জ্বালা সহ্য করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়গণের উৎসাহও হ্রাস পাইতে লাগিল। দিবাবসান সময়ে ইন্দ্রিয় সকল একেবারে ভগ্নোৎসাহ ও অবসন্ন হইয়া পড়িল। উৎসাহ ভগ্ন, শক্তি হ্রাস, ও অবসন্নতা অনুভব করিয়া, ইন্দ্রিয়গণ পরস্পরের মুখাবলোকন করতঃ 'একি হইল, একি হইল' বলিয়া সকলেই বিষণ্ণ বদনে অবস্থান করিতে লাগিল। উদর তখন ইন্দ্রিয়গণের কার্য্য-শৈথিল্য ও বিমর্ষভাব দেখিয়া অতি আর্ত্ত অথচ বিনীত বাক্যে উহাদিগকে বলিতে লাগিল—'ওহে ইন্দ্রিয়গণ! তোমরা অদ্য ভোজন পানাদির আহরণ না করিয়া, এই দিবাবসান সময়ে এরূপ অবসন্ন হইয়া পড়িলে কেন? তোমরা কি জান না যে অন্ন জল আমি পরিপাক করিয়া না দিলে তোমরা কার্য্যাক্ষম হইতে পারনা? আমি বিনা চেষ্টাতে তোমাদের সংগৃহীত ভক্ষ্য বস্তু

সকল ভোজন করি-এই ঈর্ষার বশবর্ত্তী হইয়া তোমরা যে আজ ভোজনের আয়োজনে বিরত হইয়াছ ইহা তোমাদের সম্পূর্ণ ভ্রম। কারণ তত্ত্ববিচার করিয়া দেখিলে—আমি প্রকৃত পক্ষে কোন দ্রব্যই ভোজন করি না; পরন্তু পরিপাক করিয়া শোণিত ও বীর্য্যাদি দ্বারা তোমাদের সকলেরই শক্তি বর্দ্ধনরূপ ক্রিয়াসাধন করিয়া থাকি। অতএব ইহা নিশ্চয় জানিও যে, এই জগতের সকল পদার্থই পরস্পর সাহায্য সাপেক্ষ। সুতরাং কাহারও প্রতি ঈর্ষা দ্বেষ না করিয়া সকলকেই পরস্পর সাহায্যকারী জ্ঞানে পরস্পর সকলেই সকলের প্রতি সন্তোষ থাকা কর্ত্তব্য। এইরূপ সন্তোষই সকল সুখের মূল এবং বল বীর্য্যের নিদান স্বরূপ। আর স্বার্থ লাভ নিবন্ধন যে সন্তোষ, সে সন্তোষ কেবল ক্ষণস্থায়ী ও সকল দুঃখের আকর স্বরূপ।

তাই এই স্বার্থ ঘটিত দ্বেষপূর্ণ সন্তোষকে মর্ত্ত্যজীবের পক্ষে, শাস্ত্রপ্রণেতা মহর্ষিগণ শাস্ত্র মধ্যে অতি জুগুপ্সিত, ঘৃণার্হ ও মোক্ষলাভের একটি প্রধানতম বিঘ্ন বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পরন্তু লাভালাভ ও সুখদুঃখ প্রভৃতি সকল অবস্থাতেই যাঁহারা সন্তোষ লাভ করিয়া উচ্চ নীচ, ছোট বড়, ধনী দরিদ্র প্রভৃতি করিয়া স্থাবর জঙ্গমাদি সকল পদার্থকেই সমান চক্ষে দেখেন, তাঁহাদের সন্তোষই যে মোক্ষের একটি হেতু, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মোক্ষদ্বারে দ্বারপালশ্চত্বারঃ পরিকীর্ত্তিতা।
শমো বিচারঃ সন্তোষশ্চতুর্থ সাধুসঙ্গমঃ॥

মোক্ষদ্বারে চারিটি দ্বারপাল আছেন যথা—শম ব্রহ্মবিচার, সন্তোষ ও সাধুসঙ্গ। মোক্ষদ্বারে প্রবেশ করিতে হইলে ঐ চারিটি দ্বারপালের সেবা করিতে হয় অথবা নিকৃষ্ট পক্ষে ঐ চারিজনের একজনেরও সেবা করিতে হয়, যেহেতু একজন বশ হইলেও ক্রমে চারিজন বশ হইতে পারে।

হিংসা দ্বেষ বর্জ্জিত সন্তুষ্ট ও সমদর্শী ব্যক্তির মোক্ষলাভ অতি সহজেই হইয়া থাকে তাই মনু বলিয়াছেন।—

"সর্ব্বভূতেষু চাত্মনং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।"
সমং পশ্যন্নাত্মযাজী স্বারাজ্য মধিগচ্ছতি॥" মনু। ১২।৯১।

পরমাত্মা সর্ব্বভূতেই আছেন এবং পরমাত্মাতে সকল ভূতের অবস্থিতি এইরূপ সমদৃষ্টি দ্বারা আত্মযাজী ব্যক্তি স্বারাজ্য অর্থাৎ মোক্ষলাভ করেন।

অতএব জনম মরণ ধর্ম্মাক্রান্ত মানবগণের একান্ত কর্ত্তব্য হইতেছে যে, বিষময় বিষয় সংক্রান্ত আশু সুখে সন্তোষ ও সুখান্তে দুঃখোদয়ে অসন্তোষ জ্ঞান

স্না করিয়া, সকল অবস্থাতেই সমভাবে অবস্থান পূর্ব্বক মহার্ণবে তরণী চালনের উপায় দিক্‌দর্শন যন্ত্রের ন্যায় উত্তরকালের সহায় উত্তরানন্দনেক্ষণকারী শ্রীহরির প্রতি প্রীতির সহিত লক্ষ্য রাখা। এই লক্ষ্য যখন স্থির হইয়া যায়, তখন দিক্‌দর্শন যন্ত্রকে যেমন যেদিক ইচ্ছা ঘুরাইয়া দিলেও সে কেবল উত্তর দিকেই গিয়া স্থির হয়; তেমনি ভগবদ্গত মন সংসারে ঘুরিতে থাকিলেও উত্তরকালের অবলম্বনীয় একমাত্র আশ্রয় ভগবচ্চরণারবিন্দ হইতে কখনই বিচলিত হয় না। এইরূপ অবিচলিত অবস্থাই পরমানন্দপ্রদ, যেহেতু এই অবস্থায় জ্ঞানও থাকিতে পারেনা আর অজ্ঞানও থাকিতে পারে না; সুতরাং কোন প্রকার সঙ্কল্পও তখন হৃদয়ে স্থান পায় না। আর সঙ্কল্প সমূহ ক্ষয় পাইলেই জীব ব্রহ্মভাব অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। একথা মহর্ষি বাল্মীকি তাঁহার শিষ্য জানকীগর্ভসম্ভূত কুশকে উপদেশ করিয়াছিলেন। যথা

"নিসঙ্কল্পো যথা প্রাপ্ত ব্যবহার পরোভব।
ক্ষয়ে সঙ্কল্পজালস্য জীবো ব্রহ্মত্বমাপ্নুয়াৎ॥"

সঙ্কল্প পরিত্যাগ পূর্ব্বক যথালব্ধ বস্তু ব্যবহার করিবে। সঙ্কল্প ক্ষয় হইলে জীব ব্রহ্ম ভাব প্রাপ্ত হয়।

ফল কথা মোক্ষ বস্তু মানুষেরই করতলগত। পৌরুষ সহকারে সকল প্রকার আশা ক্ষয় দ্বারা মনের ক্ষয় করিতে পারিলেই মোক্ষ লাভ হয়। তদ্ভিন্ন মোক্ষ বস্তু আকাশ পৃষ্ঠে, পাতালে বা ভূতলেও পাওয়া যায় না।

ন মোক্ষো নভসঃ পৃষ্ঠে ন পাতালে ন ভূতলে।
সর্ব্বাশাসংক্ষয়ে চেতঃ ক্ষয়ো মোক্ষ ইতীষ্যতে॥"

স্থূল তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে, মর্ত্তধামে আসিয়া কেবল মোক্ষধামে প্রবেশ করিবার নিমিত্তই সন্তোষের সেবা করা কর্ত্তব্য। তদ্ব্যতীত ইহ সংসারে অন্য কোন ব্যাপারেই সন্তোষ লাভ বিধেয় নহে। মোক্ষধামে প্রবেশ করিতে না পারিলে জীবের জনম-মরণরূপ সংসার কিছুতেই মোচন হয় না। পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিয়া ত্রিতাপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। অতএব "কথমিহ মানব তব সন্তোষ।" শ্লোকাংশের এই নীতি পূর্ণ মহাবাক্য সদা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া ও প্রতিপালনার্থ প্রাণ পণ করিয়া মর্ত্ত জীবের জীবন যাপন করা যে একমাত্র কর্ত্তব্য তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

শ্রীভূপতিচরণ বসু।

আলোচনা

(উদয়নাচার্য্য)

উদয়নাচার্য্য একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার জন্ম-স্থান ও জন্ম-তারিখ লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। অনেকের মতে তিনি খৃষ্টীয় দশম শতাব্দের মধ্যভাগে মিথিলায় জন্মগ্রহণ করেন। ইহাই একপ্রকার প্রায় সর্ব্ববাদি সম্মত মত। মিথিলাবাসিগণ তাঁহাকে ভগবানের অবতার মনে করেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রভাব হইতে হিন্দু-ধর্ম্মের সংরক্ষণের জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্যই এ কার্য্যের শ্রেষ্ঠ উদ্যোগী ছিলেন; কিন্তু ভগবান্ শঙ্করের দেহত্যাগের পর পুনরায় বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতে মাথা তুলিতেছিল। এই সময় অতি শুভক্ষণেই উদয়নাচার্য্যের আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি 'আত্মতত্ত্ব বিবেক' নামক অপূর্ব্ব দার্শনিক গ্রন্থে বৌদ্ধ-মতবাদের অসারতা প্রতিপন্ন এবং ক্ষণিকবাদ ও শূন্যবাদ খণ্ডন পূর্ব্বক জীবাত্মার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার "ন্যায়কুসুমাঞ্জলি" অতি অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ। ইহাতে চার্ব্বাক, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্ম্মের নিরীশ্বর মত খণ্ডিত হইয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছে। তাঁহার এই তীব্র ও কঠোর সমালোচনার পর নিরীশ্বরবাদ আর ভারতে মাথা তুলিতে পারে নাই।

শুনাযায়, বৌদ্ধমত দলিত হইলে পর তিনি নীলাচল-ধামে শ্রীজগন্নাথ দেব দর্শন করিতে গমন করেন, কিন্তু বহু স্তব করিয়াও মন্দিরে দেবতার অধিষ্ঠান চিহ্ন না পাইয়া "পুন র্বৌদ্ধে সমায়াতে মদধীনা তবস্থিতিঃ" এই কথা বলিয়া যখন মন্দির হইতে বাহির হইয়া আসিতেছিলেন সেই সময় শ্রীভগবানের দর্শন পান। তিনি "বোধসিদ্ধি" নামক অপর একখানি দার্শনিক গ্রন্থ ও কয়েক খানি প্রাচীন বিখ্যাত দার্শনিক গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করিয়া জগতে অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন।

(নিবেদিতা)

ভগিনী নিবেদিতা সম্বন্ধে অনেকে আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু 'শ্রীমতী সরলা বালা দাসীর' ন্যায় নিবেদিতা-প্রসঙ্গ এমন বিস্তারিত ও পরিস্ফুট

ভাবে আলোচনা করিতে কাহাকেও দেখি নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমি তাঁহার নিকট ঋণী।

নিবেদিতা আজ নাই, কিন্তু ভারতবর্ষে তাঁহার স্মৃতি চিরদিন অক্ষুন্ন থাকিবে। স্বামী বিবেকানন্দ বিলাত হইতে যে দুর্লভ রত্নটী আনিয়া আমাদিগকে উপহার দিয়াছিলেন সেই রত্ন দ্বারা আমরা অনেক বিষয়ে উপকৃত হইয়াছি ; সুতরাং আজ সেই ভক্তিমতীর মধুর আখ্যায়িকা ভক্তিতে আলোচিত হওয়ায় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বলিয়াই মনে করি।

স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৫ খৃঃঅব্দে ইংলণ্ডে গিয়া প্রথম বেদান্তধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন এবং মনস্বিনী নিবেদিতার চিত্ত সেই সময় হইতেই এই অতি সুন্দর ও চিত্তাকর্ষী ভারতীয় দর্শনের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি দেখিলেন এক অসাধারণ প্রতিভাশালী, সত্যানুরাগী, শাস্ত্রজ্ঞ বিরাট পুরুষ উচ্চকণ্ঠে জগদ্‌বাসীকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন,—

" আজিকার দিনের পৃথিবী কি চায়?—বিংশতি জন এমন রমণী এবং পুরুষ যাহারা সাহস করিয়া একেবারে পথে দাঁড়াইয়া বলিতে পারে, ঈশ্বর ভিন্ন আর আমাদের কিছুই সম্বল নাই। কে যাইবে? * * * এইরূপ (ঈশ্বরকে ধরিয়া সর্ব্বস্ব ত্যাগ) করিতে ভয়ই বা কেন? ইহা যদি সত্য হয় (অর্থাৎ ঈশ্বর যদি থাকেন) তবে অপর সমস্ত ত্যাগে কি আসে যায়? আর যদি ঈশ্বর না থাকেন তবে জীবন ধারণেই বা কি আসে যায়?"

স্বামীজীর এই বজ্র নির্ঘোষের ন্যায় আহ্বান-ধ্বনি ব্যর্থ হয় নাই। নিবেদিতার মহাপ্রাণ ইহাতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। তাঁহার প্রাণের পরতে পরতে এক অভিনব আহ্বান-বাণী ধ্বনিত হইয়াছিল। তিনি শুনিলেন বিবেকানন্দ আবার বলিতেছেন,—

"জাগো জাগো মহাপ্রাণগণ, পৃথিবী দুঃখ-ক্লেশে দগ্ধ হইতেছে, তোমরা কি ঘুমাইতে পার?"

মহাপুরুষের এই আহ্বান-ধ্বনি সার্থক হইয়াছিল। তিনি এমন একটী শিষ্যা লাভ করিলেন যে, যথার্থই সমস্তই ত্যাগ করিয়া ভগবদ্বলে বলীয়ান্ হইয়া অনন্ত প্রেমের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ হইতে পারিয়াছিলেন।

শ্রীভগবানে নিবেদিত-জীবন "নিবেদিতা" গুরুর উপযুক্ত শিষ্যই ছিলেন। কলিকাতা মহানগরী বসুপাড়া লেনের একটী ছোট বাড়ীতে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া গুরুদেবের 'ব্রহ্মচারিণী-মঠ' স্থাপনের বাসনা ফলবতী করিতে

ইচ্ছুক হইলেন। এই কার্য্যেই তাঁহার মহৎ জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হয়। তিনি এতদ্দেশীয়া নারীগণের শিক্ষার অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া ঐকান্তিক পরিশ্রম সহ একাগ্রচিত্তে যে সাধনার পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহাতে যে তিনি সিদ্ধ হইয়া গিয়াছেন তাহা আজ মুক্তকণ্ঠে বলিব। এই শিক্ষার ধারা কিরূপ হইবে তাহা তিনি আরব্ধ কার্য্যে নিয়োজিত হইবার পূর্ব্বে স্বীয় The web of Indian Life এবং The Master as I saw him নামক গ্রন্থদ্বয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন। তাহা এইরূপ,—

"ভারতবর্ষের শিক্ষার ভিত্তি ত্যাগ ও প্রেম। আত্ম-ত্যাগই প্রেমের জীবন, এবং প্রেমই ত্যাগের উৎপত্তি ও ব্যাপ্তি। ত্যাগ অর্থে নিঃস্বতা নহে, অক্ষয় ধনে ধনী হইবার পথই ত্যাগ, ত্যাগ অর্থে পরাজয় নহে, বরং জগৎ সমাজে বিজয়ী হইবার একমাত্র উপায়ই আত্মত্যাগ, কিন্তু সে ত্যাগ একেবারে স্বার্থ বোধমাত্র বিহীন হওয়া চাই, যাঁহার ভাগ্যে অজ্ঞাতসারেও অভিমানের বা কামনার ছায়া স্পর্শ করে তাঁহার অমূল্য দানও ধূলিমুষ্টির ন্যায় তুচ্ছ হইয়া যায়।" নিবেদিতার মতে ইহাই ভারতবর্ষের সনাতন শিক্ষা। এই জাতীয় শিক্ষা বংশ-পরম্পরা হইতে ভারতবাসীতে অন্তর্নিহিতভাবে আছে, তাহাকে জাগ্রত করিয়া তোলাই বর্ত্তমান শিক্ষার উদ্দেশ্য। আরও দেখুন এ সম্বন্ধে তিনি স্বীয় মত কেমন গভীর দৃষ্টিতে দেখিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন— "রমণী, জাতীয় জননী, একটী দীপ হইতে আর একটী দীপ জ্বালিবার মত মায়ের জীবনের আলো হইতেই সন্তানের জীবনদীপ প্রজ্বলিত হয়।"

ধর্ম্ম সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক করিতে তিনি আদৌ ভালবাসিতেন না। তাঁহার হৃদয়ের প্রবল আধ্যাত্মিক পিপাসা গুরুদেবের নির্দ্ধারিত পথে অগ্রসর হইয়া যেন ধীরে ধীরে তৃপ্ত হইয়াছিল। সেই পাশ্চাত্য রমণী ধর্ম্ম-পিপাসা মিটাইতে ভারতের পবিত্র মৃত্তিকায় বসিয়া যে আজীবন তপস্যা করিয়া গিয়াছেন তাহা ঠাকুর রবীন্দ্র নাথ জগজ্জননী সতীর তপস্যার সহিত তুলনা করিয়া তাঁহার গভীর প্রশংসাই করিয়াছেন।

তিনি আমাদের দেবী কালিকার চরণে আত্ম-বিক্রয় করিয়াছিলেন। সেই মহাভাবময়ী দেবীমূর্ত্তি দর্শন করিলেই যেন ভাবাতিশয্যে সমাধিমগ্ন হইয়া পড়িতেন। আর তাঁহার সেই গুরু-ভক্তি তাহাও অসাধারণ ছিল। তিনি স্বীয় নাম স্বাক্ষরের সময়—"Nivedita of Rsmkrishna Vivekananda" এই ভাবেই স্বাক্ষর করিতেন। একবার তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চিত্র-তলে

একখানি পৃথিবীর মানচিত্র ঝুলাইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, "রামকৃষ্ণদেব জগদ্-গুরু ছিলেন, জগতের মানচিত্র তাঁহার পদতলে থাকিবে।"—নিবেদিতার এই কথা, তাঁহার মনের কথা। তিনি যাহা বুঝিতেন জগৎ-সমক্ষে তাহা মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন 'না মরিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না।' অর্থাৎ আপনাকে একেবারে লয় করিয়া নাদিলে আধ্যাত্মিক জগতে কেহ পুনর্জ্জন্ম লাভ করিতে পারে না। নিবেদিতার আত্মত্যাগ যাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তাঁহারাই আজ এ কথার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন।

ভারতবর্ষ ও দেশবাসীর প্রতি তাঁহার কিরূপ গভীর ভালবাসা ছিল তৎসম্বন্ধে একটী গল্প পাওয়া যায়। কথিত আছে, "নিবেদিতার নিকট যে গোয়ালা দুধ দিত সে একদিন তাঁহার নিকট ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু উপদেশ চাহিয়াছিল। নিবেদিতা তাহার কথা শুনিয়া নিতান্ত সঙ্কুচিত হইলেন এবং আপনাকে অপরাধী মনে করিয়া বার বার তাহাকে নমস্কার করিলেন। বলিলেন 'তুমি আমার নিকট কি উপদেশ চাও? তোমরা কিনা জান? তুমি শ্রীকৃষ্ণের জাতি। তোমাকে আমি নমস্কার করি।"

যে লোকোত্তর চরিত্রবতী প্রখরবুদ্ধিশালিনী তপস্বিনী, মহাপুরুষ বিবেকানন্দ স্বামীর জ্ঞা -চরিত্র ও স্বদেশ-প্রীতির মাহাত্ম্যে আকৃষ্ট হইয়া এ দেশে আসিয়াছিলেন এবং ভারতের জ্ঞান-ধর্ম্মের শাশ্বতমূর্ত্তি যাঁহার আরাধ্য হইয়াছিল এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাঁহার কথা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আমরা বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম।

শ্রীভোলানাথ ঘোষবর্ম্মা।

শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রদাস-প্রসঙ্গ

[২]

বাড়ী থেকে বিছানা আন্‌লুম। অনেক রাত পর্য্যন্ত দাদার সঙ্গে কত কথাই হ'লো, শেষে দাদাকে বল্লুম "দাদা! আজ যে বাগানে শয়ন ক'রবে এটী একটী প্রমোদ-কানন, এখানে মদ ও বেশ্যা নিয়ে বাবুরা আমোদ করে," দাদা হেসে বল্লেন—"তা হ'লেইবা!" আমি বাড়ী চলে আসছি

এমন সময়ে দাদা বল্লেন "দেখ! তোর এই কম্বল টম্বল নিয়ে যদি সট্‌কান দি তা'হলে কি করবি ?" আমি বল্লুম "ভালই হবে।"

বলতে ভুলে গেছি—"রায়মশায়" নামক সেই সাধুকে আর দেখতে পাই নাই, তিনি দাদার সঙ্গ ছেড়ে কোথায় চলে গেছেন। রায়-মশায়' সম্বন্ধে একটা কথা মনে হ'চ্ছে :—তাঁর হাতে ১টা কঞ্চির ছড়ির চেরা আধখান ছিল, সেইটে সম্বন্ধে তিনি যেন ব'লেছিলেন—"একজন সাধুর সঙ্গে আমার খুব প্রীতি হ'য়েছিল—পরস্পরে ছাড়াছাড়ির সময়ে তাঁর হাতের কঞ্চির ছড়িটীকে চিরে দু'ভাগ করে একভাগ আমাকে দিয়েছিলেন, এক ভাগ নিজে রেখেছিলেন। যদি কখন পুনরায় তাঁর সঙ্গে দেখা হয় তবেই এইকঞ্চি আবার যুক্ত হবে। কিন্তু জানি না আর তাঁর দেখা পাব কি না ?"

[৩০ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার ১৩০৭ সাল] সকালে বাগানবাটীতে গিয়ে দেখি দাদা বাইরের রকে ব'সে আছেন। আমি গিয়ে কাছে বসতে আমার গায়ে হাতবুলোতে বুলোতে কতকথা বলতে লাগলেন। প্রত্যেক কথাগুলিই যেন অমিয়-মাখা। যেন কত পরমাত্মীয়, যেন কতদিনের পরিচয়। অনেক কথাবার্ত্তার পর বল্লেন :—"রাঘব-ভবনের" পূজারী ব্রাহ্মণের সঙ্গে খুব আলাপ হ'য়েছে বেশ লোক। [ঐ সময়ে যিনি পূজারী ছিলেন তাঁর নাম গিরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, হুগলীজেলার জাহানাবাদের নিকটে বেঙ্গাইগ্রামে বাড়ী, পাণিহাটীতে বাসক'রে যাজনিক ক্রিয়া ও রাঘবভবনে শ্রীমদনমোহনের সেবা কর'তেন।] পূজারী আমাকে বল্লেন :—শ্রীমদনমোহনের বস্ত্রাদি সব ছিন্ন, কর্ত্তাবাবুদের বল্লেও তাঁরা কিনে দেন না—গ্রাহ্যও করেন না, আর সত্যই আমিও দেখলুম ভাই, বিগ্রহের সব কাপড়ই ছিন্ন ও মলিন। তাই ওঁকে ব'লেছি কিছু টাকা দেবো আপনি কাপড় কিনে ঠাকুরকে পরাবেন। "আচ্ছা! এ ঠাকুর এখন কাদের হা'তে ?

আমি :—শুনেছি পূর্ব্ব হ'তে রাঘবপণ্ডিতের তিরোভাবের পর তদীয় শিষ্যশাখা মকরধ্বজ কর ক্রমে সেবা চলে আসছিলো, তাঁরাই বৈষ্ণবগণের হাতে সেবা ভার দিয়েছিলেন—প্রায় ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে শেষ সেবায়েত গৌর-চরণ বাবাজী ছিলেন। (১) তাঁর দেহত্যাগের পূর্ব্বে পাণিহাটীর জমীদার

(১) পূজনীয় শ্রীরামদাস বাবাজী দাদা মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি রাঘব পণ্ডিত মহাশয়ের বংশধরগণ আছেন। বর্ত্তমানে তাঁরা পূর্ব্ববঙ্গে বাস করেন। শ্রীরামদাদার নিকট উক্ত বংশধরগণ নিজ নিজ পরিচয় দিয়াছেন। (লেখক)

চৌধুরী বাবুরা নানা কৌশলে ঐ দেবালয় হস্তগত করে নেন। এবিষয়ে সে সময়ে অনেকে অনেক আপত্তা ক'রেছিলেন কিন্তু পরাক্রান্ত জমীদারের জয় সর্ব্বত্রই। উক্ত বাবাজীর দেহত্যাগের পর জমীদারেরা ঠাকুরবাড়ী তাঁদের নিজস্ব সম্পত্তির মত ক'রে ফেলেছেন। বর্ত্তমানে দেবসম্পত্তিও যাহা ছিল তাহাও বাবুরা হস্তগত ক'রেছেন।

যদি কোনও ভক্ত দেবালয়ের বা দণ্ডমহোৎবের বৃক্ষতলার কোনরূপ সংস্কার ক'রতে চান, তবে উক্ত বাবুরা ভয়ানক আপত্য করেন। পাছে তাঁদের অধিকার নেই বলে কেউ দাবী উঠায়, এজন্য উহারা কাহাকেও কোনবিষয়ে হস্তক্ষেপ ক'রতে দেন না। ভক্তবর বেণীমাধব সেন বৃক্ষতলাটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও তাঁহার পুত্র বৈজ্ঞানিক উপায়ে বৃক্ষের সংস্কার করতে গিয়েছিলেন তাতে বাবুরা লোক পাঠিয়ে সব ভেঙ্গেচুরে দিয়েছিলেন। আমরা এবিষয়ে "অমৃতবাজার পত্রিকার" সম্পাদক শিশির বাবুর নিকটে গিয়ে বলেছিলুম তিনি প্রতিকার ক'রবেন ব'লেছিলেন।—কিন্তু প্রতিকার তো এখন পর্য্যন্তও কিছুই হ'লো না।

এ অবস্থায় তুমি দাদা ঠাকুরের কাপড় দেবে কিন্তু বাবুরা যদি জানতে পারে তবে খুব রাগ ক'রবে।

দাদা :—পুজারী ঠাকুরও আমাকে একথা বলেছে। তা আমি পুজারীকে গোপনেই টাকা দেবো তিনি যা হয় ক'রবেন।

আমি :—তুমি টাকা দেবে ব'লছো—তোমার কাছে এক কৌপীন ও চাদর, একটা লোটা কি কম্বল পর্য্যন্তও নেই, তুমি টাকা কোথায় পাবে?

দাদা :—কটকের একটী ছেলে কেবল বলে "দাদা আমাকে কখন কিছু আজ্ঞা করে না" তাই তাকে পত্র দিয়েছি, সে টাকা পাঠিয়ে দেবে।

এই কথাবার্ত্তার ৮।১০ দিন পরে কটক হ'তে ১০৲ টাকার মণিঅর্ডার আসে। দাদা তখন এখান হ'তে চলে গিয়েছেন, মণিঅর্ডারে গ্রাহকের নামের স্থানে দাদার নাম ছিল, এজন্য পিয়ন পুজারীকে টাকা দিতে পারলে না, কাজেই মণিঅর্ডার প্রেরকের নিকট ফিরে যায়।

তারপরে বল্লেন :—দেখ! পুরীতে আমার এক দাদা আছেন সকলে তাঁকে 'পুরীর বড় বাবাজী' বলে ডাকেন। তাঁর নাম শ্রীরাধারমণ চরণ-দাস বাবাজী। তোকে দেখিয়ে দেবো—দেখবি কেমন লোক।

এই সর্ব্বপ্রথম দাদার নিকট শ্রীরাধারমণ চরণ দাস দেবের নাম শ্রবণ

করলুম। তাঁর চরণতলে যে এ পাতকীর মস্তক বিক্রীত হবে, তিনি যে আমার পরমাত্মীয়, হ'য়ে আমার সমুদয় দুঃখের বোঝা হাসিমুখে বিপদের মাঝে বুকেতুলে নেবেন তা তখন আদপেই জানতে পারিনি।—তারপরে নবদ্বীপদাদা আমার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে কত আশার কথা, কত ভালবাসার কথা বল্লেন। পরে নিজের কৌপীন ছিন্নক'রে আমাকে দিয়ে বল্লেন—"এইটে রাখিস তোর ভাল হবে। আবার আমার সঙ্গে দেখা হবে, তোকে ভুলবো না।"

সে সময়ে আমার যেরূপ প্রকৃতি তাতে ঐ অযাচিত পরম কৃপার নিদর্শন অমূল্যধন্ত কৌপীনখানি আমারকাছে কেবল ছিন্ন বস্ত্র খণ্ড ভিন্ন আর কিছু নয় জেনেও প্রেমময় দাদার প্রদত্ত উপহারজ্ঞানে পরমযত্নে মস্তকে করে নিয়েছিনু। 'কিন্তু হায়! উক্ত মহামূল্য উপহার পরে হারিয়ে ফেলি। আজ যদি সে ছিন্ন বস্ত্রখানি আমার গৃহে থাকতো তবে তাহা দর্শন ও স্পর্শনের জন্য দাদার অনুগত ভক্তের আগমনে আমার গৃহে হুড়া হুড়ি পড়ে যেতো। এখন বুঝেছি নেপোলিয়ানের শৌচে যাবার "প্যান" বা পাত্রটী কেন তাঁর গুণগ্রাহী ভক্তেবা বহুমূল্য দিয়ে ক্রয় ক'রে পরমযত্নে রক্ষা ক'রছেন। আর তাই দেখবার জন্য যাত্রীর আগ্রহের সীমা নাই। নানা কথার পর দাদা চ'লেযাবার ইচ্ছা ক'রলেন।

আমি:—এখন তুমি কোথায় যাবে?

দাদা:—শ্রীধাম নবদ্বীপে যাব মনে ক'রেছি।

আমি:—তা'হলে তোমার যাবার ভাড়া এনেছি?

দাদা:—না ভাই, কিছুমাত্র দরকার নেই। আমি বরাবর হেঁটে যাবো মনে ক'রেছি।

এই ব'লেই দাদা হাসতে হাসতে চ'লে গেলেন। আমার মনটা তার পর হ'তে ক'দিনধ'রে যেন কেমন হ'য়ে গেলো। আবার কি দাদার সঙ্গে দেখা হবে না কেবল এই কথাই ভাবতে লাগলুম।

দাদা পাণিহাটী হ'তে প্রথমে "সুকচরে" বিহারীলাল পাইনের দেবালয়ে যান এবং তথায় প্রসাদ পেয়েছিলেন এ কথাও শেষে লোকমুখে শুনেছিলুম।

এই ধূলিধূসরিত ছিন্ন কৌপীন-পরা উড়িষ্যাবাসী সাধারণ মনুষ্যের মত লোকটীর ধর্ম্মবল কত বেশী, এবং কত উচ্চ-শিক্ষিত, কত ধনী, কত রাজকর্ম্মচারী যে ইঁহার সামান্তক্ষণ সঙ্গলাভের জন্য ইঁহার কৃপাশীর্ব্বাদের

জন্ম লালায়িত কত পাষণ্ড নাস্তিক, কত চরিত্রহীন, কত অধার্ম্মিককে ইনি যে কৃপা করিয়া তাঁহাদের ভক্তপদবীতে উন্নীত ক'রেছেন অলৌকিক ক্ষমতায় কতলোকের জীবনদান ক'রেছেন সে সব কাহিনী তখন কিছুমাত্র না জানলে বা নাম শুনলেও সামান্যক্ষণ দাদার সঙ্গে থেকে ও যৎসামান্য ব্যবহার দেখে দাদা যে একজন পরমধার্ম্মিক বা পরমভক্ত মহাপ্রেমিক তা বেশবুঝতে পারলুম।

(পুলিনদাদার সহিত পরিচয় ও ইহার মুখে শ্রীরাধারমণ চরণদাস বাবাজী মহাশয়ের কলিকাতায় আগমন-সংবাদ শ্রবণ।)

মহানগরী কলিকাতায় একটী বিশেষ ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে। ইঁহাদের বাহির হইতে চিনিবার কোনই উপায় নাই। সকলেই যেন ঘোর সংসারী, বিষয়কর্ম্ম লইয়া সদাই ব্যস্ত; কিন্তু ভিতরে ভিতরে ইঁহারা পরম ধার্ম্মিক। সাধন-ভজন প্রভৃতি সমুদায়ই অতীব গোপনে উঁহারা সম্পাদন করেন। সাধারণে ইঁহাদের বিষয় খুবই অল্প জানেন। শুনিয়াছি এই সম্প্রদায়মধ্যে প্রথম প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী শ্রীল শিশির কুমার ঘোষ প্রভৃতি মহাত্মগণ এবং প্রসিদ্ধ গণিত-শাস্ত্রবিদ্ গৌরীশঙ্কর দে, সিটিকলেজের উমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি উচ্চশিক্ষিতগণ প্রবেশ ক'রেছিলেন। এখনও বিস্তর শিক্ষিত লোক বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজের অনেক ভক্ত সাধন-ভজনের জন্য এই সম্প্রদায়ের মধ্যে আগমন করেন। এসম্বন্ধে আমি বেশি কিছু ব'লবো না। ভক্তিভরে এঁদের প্রণাম করি।

১৩০৭ সাল ২২এ আশ্বিন সোমবার কোজাগর লক্ষ্মীপূজা। ঐ দিন আমি এবং পাণিহাটী-বাসী কয়েকটি বন্ধু শ্রীভগবৎকৃপায় উক্ত সম্প্রদায়-মধ্যে প্রবেশ করতে পাই। আমাদের আসবার প্রায় ১মাস পরে অগ্রহায়ণ মাসে (১৩০৭ সালে) পুলীনদাদার এখানে আগমন হয় ও তিনি এইস্থানে দীক্ষানিয়ে সাধন করতে থাকেন। সাধনে পুলীনদাদা দিন দিন খুবই উন্নত হ'তে থাকেন, এজন্য তিনি আমাদের গুরুদেবের এবং তাঁর সকল শিষ্যের অতীব প্রিয় হন। এই সূত্রে পুলীনদাদা আমাদের ১ম গুরুভ্রাতা—তার পর তাঁর সরল অমায়িক ব্যবহারে আরও বিশেষ ধনীর সন্তান হইয়া অতীব দীন-ভাবে থাকেন এইসমস্ত কারণে তাঁর সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠভাব ক্রমশঃ বাড়তে থাকে।

একদিন পুলিন দাদার মুখে শুনি—তাঁদের বাড়ীতে ৩।৪খানি বড় বড়

অয়েল পেণ্টিং ছবি আছে। তন্মধ্যে ৺পুরীধামে রথযাত্রার সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু রথাগ্রে কীর্ত্তন-সম্প্রদায় লইয়া কীর্ত্তন ও নর্ত্তন করিতেছেন, এই ছবিখানি বড়ই সুন্দর। আরও শুনিলাম চিত্রকর পুলিন দাদার (১) মাতুলমহাশয়।

ক্রমশঃ

শ্রীঅমূল্যধন রায়ভট্ট

ভ্রম-সংশোধন

বিগত আষাঢ় মাসের ভক্তিতে "মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ" নামক প্রবন্ধের মধ্যে ২২৭ পৃষ্ঠায় "নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ গদাধর" এই পদটীর ভণিতায় "দীন কৃষ্ণদাস ভণে" ছাপা হইয়াছে। শুনিলাম, ঐ পদটী নাকি পুরীধামের বড়বাবাজী মহাশয় অর্থাৎ শ্রীরাধরমণ চরণদাস বাবাজী মহাশয়ের রচিত। যদি তাহাই সত্য হয়, তাহা হইলে আমাদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিতে ভুলছাপা হইবার জন্য আমরা বিশেষ দুঃখিত। পাঠকগণ ঐটী "দীনহীন দাসভণে" এইরূপ সংশোধন করিয়া পাঠ করিবেন।

বিনীত—সম্পাদক ভক্তি

---

(১) পুরানাম পুলীনবিহারী মল্লিক। কলুটোলার বিখ্যাত মল্লিকবংশে ইঁহার জন্ম। সন্ন্যাস বা ভেকাশ্রয়ের নাম শ্রীনিত্যানন্দ দাস। সাধারণে ভক্তিভরে ইঁহাকে সাধু নিত্যানন্দ দাস নামে অভিহিত করিতেন। শ্রীরাধারমণ চরণদাস দেব, তাঁহার তিনজন প্রধান শিষ্যের উপর তিনটী বিশেষ প্রয়োজনীয় গুরুতর ভার অর্পণ করেন। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সারাৎসার "নামে রুচি, জীবেদয়া বৈষ্ণব-সেবন।" শ্রীরামদাস বাবাজীমহাশয়ের প্রতি সাধারণের শ্রীনামে রুচির জন্য শ্রীনামপ্রচার আজ্ঞা, শ্রীমতী ললিতাসুন্দরী দাসীর উপর শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীবৈষ্ণব সেবার ভার এবং শ্রীনিত্যানন্দ দাসের প্রতি জনসেবার ভার অর্পণ করেন। শ্রীরাধারমণের এই তিন আজ্ঞা তিনশিষ্যের দ্বারা কিরূপ ভাবে প্রতিপালিত হইতেছে তাহা সূক্ষ্মদর্শী মানব মাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন। পুলিনদাদা যে আমাদের কে ছিলেন তাহা বলিবার নহে। তাঁহাকে দেখিয়া আমাদের প্রাণ আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিত। তিনি, বিশ্বের দাদা ছিলেন। ভক্ত অভক্ত সকলকেই তিনি বুকে লইতেন। দাদাকে হারাইয়া আমাদের যে কি ক্ষতি হইয়াছে তাহা বুঝাইবার নহে। ১৩২০ সালের ২রা ফাল্গুন শনিবার রাত্র ৮ঘটিকার সময়ে দাদা তাঁহার চির আরাধ্য শ্রীরাধারমণ চরণদাস দেবের নিকট গমন করেন। ১৩২০ সালের "প্রবাসী" পত্রে দাদার সচিত্র জীবনী প্রকাশ হইয়াছে। ইহার বিষয় প্রবন্ধান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। (লেখক)

প্রাপ্ত-গ্রন্থ-সমালোচনা

চিত্রে শ্রীকৃষ্ণ (ব্রজলীলা)—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সঙ্কলিত এবং ১৪২নং গ্র্যাণ্ডট্র্যাঙ্ক রোড, হাওড়া হইতে 'ভারতচিত্র-মন্দির' কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ৪৲ চার টাকা।

গ্রন্থের পরিচয় উহার নামেই অনেকটা পাওয়া যায়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের সূচনা হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রজলীলার সংক্ষেপ পরিচয় ৪১ খানি সুরঞ্জিত চিত্রে দেখান হইয়াছে। প্রত্যেকচিত্রের সহিত চিত্র-পরিচয় দেওয়ায় উহা বুঝিতে আরও সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। চিত্রপরিচয়ে লেখক বহু ভাষাবিদ্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়। তিনি নিজেই ভূমিকায় লিখিয়াছেন "* * * হিন্দুর ঘরে পুরাণমাত্রেই যদি এইরূপে চিত্র ও পরিচয়ের মধ্যদিয়া আত্মপরিচয় দিতে আরম্ভ করে তাহাতে ভাবুক ও ভক্তেরই শুধু লাভ নয়, যাঁহারা পুরাণের আত্মপরিচয় ভাল-বাসেন তাঁহাদের লাভও ইহাতে বড় কম নহে। যথাযথ পৌরাণিক পরি-কল্পনার সঙ্গে চিত্রের ভাবানুকরণ বর্ত্তমানগ্রন্থে সর্ব্বথা সংরক্ষিত হয় নাই। হইলে খুবভালই হইত, না হওয়ায় দোষ আছে।"

আমরাও ইহা স্বীকার করি, কিন্তু পুরাণ লইয়া বসিলে আমরা যে বড়ই গোলমালে পড়িয়া যাই, বাজারে যে সকল সংস্করণ পাওয়া যায় তাহার তো কোনটার সহিতই কোনটার মিল হয় না। এসব দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, চিত্র করিবার আগে পুরাণের একটী বিশুদ্ধ সংস্করণ হওয়া দরকার। যাহাহউক প্রকাশকের এই ব্রজলীলা চিত্রে অঙ্কন করিয়া তুলিবার উদ্যম অত্যন্ত প্রশংসনীয়। কারণ এ উদ্যম এই প্রথম, ইতিপূর্ব্বে এরূপ ভাবে কেহ করেন নাই, তাই চিত্রগুলিতে কিছু কিছু দোষ দৃষ্টহইলেও প্রশংসা করিবার অনেক আছে। আমরা শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলাস্বাদন-পিপাসু ভক্তগণকে এইগ্রন্থ দেখিতে অনুরোধ করি। এ গ্রন্থের ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই সকলই উৎকৃষ্ট হইয়াছে বিশেষতঃ মলাটের উপরে যে শ্রীকৃষ্ণের চিত্রখানি দেওয়া হইয়াছে উহা আমাদিগের যথার্থই বড় ভাল লাগিয়াছে। আশাকরি প্রকাশক মহাশয় এইভাবে ভগবানের অন্যান্য লীলাও প্রকাশে যত্নবান হইবেন। মলা

যদিও ৪৲ চার টাকা বেশীবলিয়া বোধহয় কিন্তু আজকাল যেরূপ ছাপাইখরচ ও কাগজাদি দুর্ম্মূল্য তাহাতে বাধ্যহইয়া মূল্য বেশী করিতে হয়। মোটের উপর ৪৲চারটাকা খরচ করিয়া আমরা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলাগ্রন্থ এক একখানি সকলকেই সংগ্রহ করিতে বলি।

বর্ষশেষে বিজ্ঞপ্তি

অনন্তলীলাবিলাস শ্রীভগবানের কৃপায় ও সহৃদয় গ্রাহকগণের সহানুভূতি ও সাহায্যে ভক্তির আজ ২০শ বর্ষ পূর্ণ হইল। ভাদ্রমাসে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীর দিন ভক্তির বর্ষারম্ভ হয়। কুড়িবৎসর পূর্ব্বে এইভক্তি যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন স্বপ্নেও ভাবিনাই যে, লোকের কাছে ভক্তি এতদূর আদর ও সম্মান পাইবে। কিন্তু আজ ভক্তির এই ২০শ বর্ষ পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন অগ্রজ মহাশয়কে মনে পড়িতেছে, তিনি বড়সাধে জীবহৃদয়ের মলিনতা দর্শন করিয়া ঘরে ঘরে অনায়াসে যাহাতে নরনারী ভক্তির আলোচনাদ্বারা এই মলিনতা দূরকরিয়া ধন্য হইতে পারে--তাহার জন্য এই পত্রিকার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আজ তিনি যদি মর্ত্ত্যলোকে থাকিতেন, তবে নাজানি এই বর্ষ-সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ে কত আনন্দই হইত। কিন্তু তিনি এখন নিত্যধামে বিরাজ করিতেছেন। যেখানেই থাকুন, তাঁহার আশ্রিত সেবকগণের যথাসাধ্য চেষ্টায়, তাঁহার আদরের ভক্তি যে আজ ২০শ বর্ষ পূর্ণকরিতে সমর্থ হইয়াছে ইহা দেখিয়া তিনি তাঁহার অমোঘ আশীর্ব্বাদ সেবকগণের উপর বর্ষণ করুন। সেই আশীর্ব্বাদের বলে বলীয়ান্ হইয়া সেবকগণ ভক্তি প্রচারে আরও দৃঢ়-ব্রত হইবে এবং তাহা হইলে তাঁহার ভক্তি প্রচারের উদ্দেশ্য কোনদিন পূর্ণ হইলেও হইতে পারে।

ভক্তিতত্ত্ব আলোচনা করাই এইপত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য, কিন্তু ভগবত্তত্ত্ব আলোচনা ত অহঙ্কারদ্বারা হইবার নয়, ইহা যে ভগবৎকৃপা সাপেক্ষ।

যাঁহার লীলাগুণ শ্রবণ কীর্ত্তনে মনে অপার আনন্দের উদয় হয়, ভক্তের হৃদয়তটিনী ভক্তিরসে প্লাবিত হয়, সেই লীলাময়ের লীলাগুণ নানা ভাবে আলোচনা করিয়া ভক্তি এতদিন চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু "শ্রেয়াংসি বহু-

বিঘ্নানি।" অর্থাৎ শুভকার্য্যে অনেক বিঘ্ন। এই কুড়িবৎসর যাবৎ যদিও আমরা গ্রাহকগণের নিকট হইতে আশাতীত সহানুভূতি পাইয়া আসিতেছি, তথাপি নিজের শারীরিক ও মানসিক নানাপ্রকার অসুস্থতায় মনেরমত করিয়া সকল সময় ভক্তি প্রকাশ করিতে পারি নাই, তবে করুণাসিন্ধু শ্রীগুরু-দেবের সেই "শুভকার্য্যে বহু বাধা বিঘ্ন ঘটিলেও যতটুকু কার্য্যে পরিণত করিতে পার তাহাই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর করিয়া দিবে" এই উপদেশ স্মরণ করিয়া চলিয়াছি, জানি না কোনসূত্র ধরিয়া কেমন করিয়া কোন শুভমুহূর্ত্তে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। তবে খুব আশা করা যায় শ্রীগুরুদেবের আশীর্ব্বাদের সঙ্গে সঙ্গে সহৃদয় গ্রাহকগণের সহানুভূতি যেভাবে পাইতেছি ভবিষ্যতে এইভাবে পাইলে ভক্তি-প্রচারের উদ্দেশ্য পূর্ণহইতে আর বিলম্ব হইবে না।

অবশেষে ভক্ত গ্রাহকগণের নিকট প্রার্থনা, তাঁহারা যেভাবে এই কুড়ি বৎসর ভক্তিকে স্নেহের চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন এবং ইহার উন্নতি কামনা করিয়া আমাদিগকে নানাভাবে সাহায্যকরিয়া আসিতেছেন আগামী বর্ষেও যেন তাঁহাদের সে কৃপালাভে আমরা বঞ্চিত না হই। বর্ষ-শেষে গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পাঠক ও সমালোচক প্রভৃতি সকলের নিকটই আমাগিগের এই প্রার্থনা।

আগামী ভাদ্রে ভক্তি ২১শ বর্ষে পদার্পণ করিবে। যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে আমরা আমাদের কর্ত্তব্য সম্পাদনে সমর্থ হইতে পারি সেইজন্য আসুন সকলে মিলিয়া সেই সর্ব্বকর্ম্মফলদাতা মঙ্গলময় শ্রীভগবানের নিকট করযোড়ে বলি——

"নমস্তে মঙ্গলাধার সর্ব্বমঙ্গলকারণ।
শান্তিস্বরূপ ভক্তীশ শক্তিং ভক্তিং প্রযচ্ছমে॥"

২০শ বর্ষ ১২শ সংখ্যা সমাপ্ত।